মুক্তচিন্তক সাময়িকী

সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ২০২২

# চেতনার অন্বেষণে

প্রকাশ সংখ্যা- ১৯






যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত

# চেতনার অন্বেষণে

| মুক্তচিন্তক মাসিক পত্রিকা
| সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ২০২২

স ম্পা দ ক
যু ক্তি বা দী রা

প্র কা শ সং খ্যা
উ নি শ

স হা য় তা
কি নো ক্ষ্যা পা

যো গা যো গ
yuktibadira@gmail.com
WhatsApp@9564556134
Telegram:@Yuktibadira
Website:rationalists
ক ল কা তা - ৫ ৬

বি নি ম য় মূ ল্য না ই

## সূচি

**প্র ব ন্ধ -- নি ব ন্ধ**

**ক বি তা**



**বি শে ষ সং যো জ ন**



## মুক্তচিন্তক সম্মাননা

মুক্তচিন্তা নিয়ে বিগত সংখ্যা অবধি যাঁরা পাঁচটি বা তার অধিক লেখা দিয়েছেন, তাঁদের সম্মানজ্ঞাপক একটি শংসাপত্র প্রদান করছি। **পাঁচটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রটি প্রদান করা হতে থাকবে আগামীতেও।**

যাঁদের দৃপ্ত লেখনীতে 'চেতনার অন্বেষণে'র পাঠক ঋদ্ধ হয়ে চলেছে, এমনই কয়েকজন মুক্তচিন্তককে সম্মাননা জ্ঞাপন করছি।

| | প্রকাশিত লেখা |
|---|---|
| জামাল আনসারী | 23টি |
| অভিষেক দে | 15টি |
| প্রদীপ চক্রবর্তী | 13টি |
| পার্থ প্রতিম পাল | 10টি |
| মহম্মদ মহসীন | 8টি |
| দেবস্মিতা | 6টি |
| রাজা দেবরায় | 6টি |
| বিতান সানা | 5টি |
| সন্তোষ শর্মা | 5টি |

সমস্ত মুক্তমনা, যুক্তিবাদীদের তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাই, আমরা গর্বিত চেতনার অন্বেষণে'কে সমৃদ্ধ করেছেন।

# সম্পাদকীয়

আজ ৩০ সেপ্টেম্বর ব্লাসফেমি ডে। মুক্তমনা শহীদ সৈনিক অভিজিৎ রায়ের লেখা দিয়েই দিনটিকে উদযাপিত করবো। এ'মাসেই এই অসাধারণ মানুষটির জন্মমাসও। অভিজিৎ রায় লিখেছেন-

"আজ ৩০ শে সেপ্টেম্বর। অনেকেই হয়তো জানেন না এই দিনটি 'Blasphemy Day' (ফেসবুক, উইকি) হিসেবে পালন করা হয়। বাংলা করলে বলা যায় 'মুরতাদ দিবস'। মুক্তমত প্রকাশের কারণে, বিশেষতঃ ধর্ম এবং ধর্মীয় কুসংস্কারের সমালোচনার কারনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নাগরিক এবং অধিবাসীদের হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে, মৃত্যুর হুমকি দেয়া হচ্ছে, চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে আহত করা হচ্ছে, গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়া হচ্ছে, ঠেলে দেয়া হচ্ছে মৃত্যুমুখে। মৌলবাদীদের পাশাপাশি এর সাথে যোগ হয়েছে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নও। তাদের স্মরণ করেই এই দিবসটি প্রতিবছর পালন করা হয় ২০০৯ সাল থেকে। ধর্ম পালন করা যদি মানুষের অধিকার হয়ে থাকে, ধর্মের সমালোচনা করাও যে অধিকার – সেটা জোরে সোরে জানানোই এই দিবসের উপজীব্য।

আমি ভাবছিলাম এই 'ব্লাসফেমি দিবস' নিয়ে একটা লেখা লিখব। ব্লাসফেমি দিবসে একটু ব্লাসফেমি করলে মন্দ কি! কিন্তু সকালে উঠেই একটা চমৎকার ইমেইল পেলাম যে আমার লেখার থিমটাই গেল বদলে। ভদ্রলোকের পাঠানো ইমেইলটি এসেছে সুদূর পটুয়াখালী থেকে। সাধারনতঃ আমি কারো ব্যক্তিগত ইমেইল প্রকাশ করি না, কিন্তু ইমেইলটার আবেদন এতই বেশি যে আমি ভদ্রলোকের অনুমতি নিয়ে পাঠকদের উদ্দেশ্যে আজকের দিনে শেয়ার করতে চাইছি। এবারের ব্লাসফেমি দিবসের সবচেয়ে বড় উপহার বোধ হয় এই হৃদয়স্পর্শী ইমেইলটি –

" ভাই,

মানুষমাত্রই বোধ হয় সুখি হতে চায়। কিন্তু ঠিক কোন রাস্তা ধরে হাঁটলে সুখের দেখা মিলবে সেটা অনেকেই জানেন না, ফলে আমাদের

অনেককেই শেষপর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত সুখের দেখা না পেয়েই একসময় মারা যেতে হয়।

বছর কয়েক আগে আমিও এরকমের সুখের জন্য উন্মুখ ছিলাম, এদিক ওদিক বিভিন্ন রাস্তা ধরে হাঁটছিলাম। দিশা খুঁজে পাচ্ছিলাম না সঠিক পথের। ঠিক এমনি সময় আমার চোখে পড়ল আপনার এই 'মুক্তমনা ব্লগ'। আজ বলতে দ্বিধা নেই, সত্যকে জানার যে অনাবিল আনন্দ তা আমি খুঁজে পেয়েছি এই মুক্তমনা থেকেই। আমি এজন্য আপনাকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাই, আর কামনা করি আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের।

আমার একটা ছোট মেয়ে আছে। আপনার এবং মুক্তমনার সম্মানে আমি তাকেও 'মুক্তমনা' বলেই ডাকি। তার বয়স সবে দুই বছর হয়েছে। আমি তাকে মুক্তমনা হিসেবেই গড়ে তুলিতে চাই। আমি সেই দিনের দিকে তাকিয়ে আছে, যেদিন সে বড় হবে, আর আমায় জিজ্ঞাসা করবে – 'বাবা এত লক্ষকোটি নাম থাকতে আমার নাম তুমি মুক্তমনা রাখলে কেন?' আমি সেদিন আপনার কথা বলব, আর আপনার ওয়েবসাইটটি দেখিয়ে বলব – 'এইজন্য'।

আপনার এবং বন্যা আপার সুখি জীবন কামনা করি।

নাসিম

পটুয়াখালী"

অনেকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে ছিলাম ইমেইলটি পেয়ে। কয়েকটা দিন সত্যিই 'ভীষণ রঙিন'। আজ বোধ হয় এমনই একটি দিন। না – আমার বই, কাজকর্ম, লেখালিখি, ওয়েবসাইট – কোন কিছুকেই আমি তেমন বড় কিছু মনে করি না। আমি নিজেই সন্তুষ্ট নই। মাঝে মধ্যে ভাবি সাইট ফাইট লেখালিখি বন্ধ করে দিলেই বা কি! কিন্তু ঠিক সে সময়গুলোতেই আমি পাই পাঠকদের কাছে থেকে এমন অনুপ্রেরণাময় ইমেইল। পাই পুনর্বার এগিয়ে চলার শক্তি।

না নাসিম সাহেব ঠিক বলেননি। আমার কিংবা আমার প্রতিষ্ঠিত মুক্তমনা ব্লগের অবদান তেমন নেই। আমাদের অবদানের চেয়েও বেশি হচ্ছে

নাসিমদের মত লোকের অনুসন্ধিৎসা, সত্যকে জানার ইচ্ছেটুকু। সেই ইচ্ছেটুকু বেঁচে থাকুক। আর পাশাপাশি আমি সত্যই চাইব, তিনি যেভাবে জীবনকে দেখেন, যেভাবে তিনি সত্য এবং সুখের সন্ধান করছেন, তার মেয়ে মুক্তমনাও একই রাস্তায় হাঁটবে। জ্ঞান, যুক্তি আর মানবিকতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে নেবে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য। সত্যিকারের মুক্তমনাদের মত প্রতিবাদ করবে যাবতীয় অন্যায় অবিচারের। মুক্তমনা মামোনির জন্য অনেক আদর। তার জীবন সাজুক যুক্তির আলোয়, জীবন গড়ুক মুক্তবুদ্ধির চেতনায়।

শুভ ব্লাসফেমি দিবস। শুভ জন্মদিন মুক্তমনা।

পৃথিবীর সকল মুরতাদদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক।

অভিজিৎ

মুরতাদ দিবস।

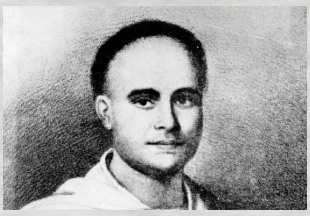
সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৩"

> "আমি নাস্তিক। কিন্তু আমার আশেপাশের বহু কাছের বন্ধুবান্ধবই মুসলিম। তাদের উপর আমার কোনো রাগ নেই, নেই কোনো ঘৃণা তাদের আনন্দের দিনে আমিও আনন্দিত হই। তাদের উপরে নিপীড়ন হলে আমিও বেদনার্ত হই। প্যালেস্টাইনে বা কাশ্মীরে মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর অত্যাচার হলে তাদের পাশে দাঁড়াতে কার্পন্য বোধ করি না। অতীতেও দাঁড়িয়েছি, ভবিষ্যতেও দাঁড়াবো। এটাই আমার মানবতার শিক্ষা।"
>
> - অভিজিৎ রায়

# রেনেসাঁসের অন্যতম প্রমিথিউস বিদ্যাসাগর

-শম্ভুনাথ চার্বাক

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের কাজ ছেড়ে দিলেন সম্পাদক রসময় দত্তের সাথে বনিবনা না হওয়ার জন্য। রসময় দত্ত আড়ালে বলতে লাগলেন, বিদ্যাসাগর যে চাকুরিটা ছেড়ে দিলে, খাবে কি?



এই কথা বিদ্যাসাগরের কানে পৌঁছুলে তিনি বললেন, রসময়বাবুকে বলো তিনি আলু পটল বেচে খাবেন। জীবিকার জন্য যেকোন স্বাধীন বৃত্তি তিনি নিতে পারতেন। স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতা ছিল তাঁর আত্মমর্যাদা বিচারের অন্যতম মানদণ্ড। সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করা বিদ্যাসাগরের আলু পটল বেচতেও কোনো অসুবিধা হতো না।

তখন তাঁর বাসায় আশ্রিতের সংখ্যা অনেক। অসহায় দরিদ্র আত্মীয়স্বজনের প্রায় কুড়িটি ছেলের খাওয়া পড়ার দায়িত্ব তাঁর কাঁধে; এছাড়াও অনেক দায়িত্ব তিনি মাথায় নিয়ে চলতেন। কিন্তু স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জোনের পথ কোথায়? আলু পটলের ব্যবসা করার মতোও তাঁর নিজস্ব কোনো মূলধন ছিল না। বিদ্যাসাগরের মূলধন ছিল বিদ্যা, বিদ্যাই তাঁর স্বোপার্জিত মূলধন এবং তিনি ছিলেন বিদ্যার ব্যাপারী।

কিন্তু বিত্তের সাথে বিদ্যার সাদৃশ্য কোথায়? বিশেষ করে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে? বিত্ত দান করলে কমে, কিন্তু বিদ্যা দান করলে বাড়ে। স্বাধীন বাণিজ্যবৃত্তির দৃষ্টান্ত তাঁর পূর্বে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ বাঙালি পণ্ডিতদের মধ্যেও এটা দেখা গিয়েছিল। অনেক ইয়ং বেঙ্গল সদস্যরা এই স্বাধীন ব্যবসার পথে দেখিয়ে গেছেন। এটা রেনেসাঁসের একটা অন্যতম লক্ষণ। বিদ্যাসাগরও নিজের বিদ্যাকে মূলধন করে তারই যুগোপযোগী বাণিজ্যের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, সেদিক থেকে তিনিই বাংলাদেশে ও ভারতে এই ব্যবসায়ের অন্যতম পথপ্রদর্শক।

এতদিন পর্যন্ত হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি ছিল পাতালের অন্ধকারে শৃঙ্খলিত প্রমিথিউসের মতো। মুদ্রণযন্ত্র তাকে মুক্তি দিল যেদিন এবং সেদিন জ্ঞানের আলোক চারিদিকে পরিব্যপ্ত হল এবং অজ্ঞানের অন্ধকার ধীরে ধীরে কাটতে লাগল। পুরোহিত যাজক ইমামমদের পুঁথিগত জ্ঞান হাতেলেখা পাণ্ডুলিপির কারাজীবন থেকে মুক্ত হয়ে সকল মামুষের আয়ত্তের মধ্যে এল ছাপার অক্ষরে। কুসংস্কার ও কূপম্পন্ডুকতার কারাগার থেকে মানুষের মুক্তির জন্য যে স্বপ্ন বিদ্যাসাগর দেখেছিলেন, তা হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির সাহায্যে সম্ভব নয়। মূদ্রিত বইয়ের ভূমিকা অন্য কিছুই পুরণ করতে পারেনা সেই সময়ে। মুদ্রনযন্ত্র তাই নবযুগের জ্ঞান

বিদ্যার প্রমিথিউস। গুরুগৃহের জীর্ণ-সংকীর্ণ দেয়াল ভেঙে জনসমাজের মুক্তাঙ্গনে জ্ঞানবিদ্যার আলোকবর্তিকা বহন করে নিয়ে আসার প্রচন্ড শক্তি যে মুদ্রণযন্ত্র ধারণ করে, সে এযুগের প্রমিথিউস বৈ কি? নবযুগের জ্ঞান তথাকথিত কল্পিত স্বর্গের অপহৃত প্রমিথিউসের অগ্নির মতো।
এই মুদ্রিত বই ছিল বিদ্যাসাগরের জীবনের মুক্তির প্রতীক। সংস্কৃত কলেজ ছাড়ার আগেই তিনি সংস্কৃত প্রেস ও ডিপোজিটারি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

**মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগরের সমান অংশীদারিত্বে এই প্রেস স্থাপিত হয়েছিল। এই দুই বন্ধু ছিলেন একই বৃন্তে দুটি ফুলের মত। শিক্ষা প্রসার ও সামাজিক কুসংস্কার নিবারণের জন্য ওনারা দুই বন্ধু লেখা শুরু করেছিলেন।**

এনাদের বন্ধু বাবু নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের থেকে ৬০০ টাকা ধার করে দুজনে এই পুরানো প্রেস ক্রয় করেন। বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ইংরেজ সিভিলিয়ন ছাত্রদের বাংলা শিক্ষার জন্য অন্নদামঙ্গল কাব্য কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ি থেকে এনে ছাপিয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে ৬০০ টাকা পেয়েছিলেন। সেই অর্থে নীলমাধব বাবুর ধার

পরিশোধ হয়। এই অন্নদামঙ্গল কাব্যই প্রথম বই যা ওনাদের প্রেস থেকে বেরোয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন্য আরো অনেক বই ছাপান। এর পর যে সমস্ত পুঁথি মুদ্রিত ছিলনা সেগুলি ছাপাতে শুরু করেন। সংস্কৃত কলেজে ও অন্যান্য লোকেদের কাছে সেগুলি বিক্রি করে লাভের মুখ দেখেন। বিদ্যার দুর্ভেদ্য গর্ভগৃহ থেকে পুথিবন্দি সাহিত্য দর্শন ইত্যাদির জ্ঞানভাণ্ডার মুদ্রিত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। বাণিজ্যক্ষেত্রে সে যুগে মুদ্রক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতার স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা হয়নি। মুদ্রিত বইয়ের জন্য প্রকাশকদের তখনও পৃথক দোকান খুলে বিক্রির প্রয়োজন দেখা দেয়নি। কিন্তু এদেশে ছাপা বইয়ের চাহিদা ক্রমশ বাড়ছিল পাঠকমহলে। তখন কলকাতার চীনা বাজারই ছিল সব থেকে বড় বইয়ের ব্যবসার কেন্দ্র। অন্যেরা ক্যানভাসারদের দিয়ে বই বিক্রি করতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কলেজস্ট্রীটে সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি নাম দিয়ে প্রথম বইয়ের দোকান করলেন এবং নিজের লেখা ও ছাপাখানায় মুদ্রিত প্রকাশিত বই ছাড়াও অন্য লেখকদের বইও বিক্রি করতে শুরু করলেন। বিদ্যাসাগরই সম্ভবত এই অঞ্চলের প্রথম গ্রন্থ ব্যবসায়ী এবং যা আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। মুদ্রণের টেকনিক্যাল ব্যাপারেও উনি কতটা আগ্রহী ছিলেন তা ওনার অক্ষর বিন্যাস দেখেই বোঝা যায়। এরপর গিরিশচন্দ্র নিজের নামে একটি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করে ব্যবসা শুরু করেন।

বাংলাদেশের জমিদার ও পণ্ডিতদের একটি বড় অংশ মুদ্রণের প্রসার কামনা করতেন না। পণ্ডিত পুরোহিতদের কুক্ষিগত শাস্ত্রবিদ্যা গ্রন্থাকারে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হুলে তাদের বংশগত শাস্ত্রবিদ্যার ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে, এই ছিল তাদের ভয়।

মুদ্রণের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বুঝেই বিদ্যাসাগর অন্য কোনো স্বাধীন বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হননি। কারণ আর্থিক আত্মনির্ভরতাই তাঁর একমাত্র কাম্য ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল, জীবনের স্বাধীন বৃত্তিকে জীবনের ব্রতের অবিচ্ছেদ্দ অঙ্গ করে তোলা। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার যার জীবনের ব্রত, স্বাধীন মুদ্রক প্রকাশক ও গ্রন্থাকারের বৃত্তিই তার শ্রেষ্ট উপযোগী বৃত্তি। বাংলা তথা ভারতে জ্ঞানকে কারাগারের অন্ধকার মুক্ত করে আলোতে নিয়ে আসার প্রমিথিউস বিদ্যাসাগর ছাড়া আর কে?

বিদ্যাসাগরের জন্ম মাসে ওঁকে আমার শতকোটি প্রণাম ও শ্রদ্ধাঞ্জলি।

**২৬ সেপ্টেম্বর অন্যতম শিক্ষক ও সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর জন্মদিনকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করুন।**

# অভিজিৎ রায় ও তাঁর লেখালেখি

-রতন কুমার সমাদ্দার

অনলাইনে অভিজিৎ রায়ের সর্বশেষ লেখাটি প্রকাশিত হয়েছিলো ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫, যেদিন তাকে হত্যা করা হয়েছিলো সেদিন। বিডিনিউজে প্রকাশিত লেখাটির শিরোনাম 'কেন কোনো কিছু না থাকার বদলে কিছু আছে? (Why there is something rather than nothing?)'। অতীতে বিজ্ঞানের কাছে এই প্রশ্নটির কোন উত্তর ছিলো না; এটি ছিলো ধর্ম ও দর্শনের এখতিয়ারে। ধর্মবেত্তারা এই সুযোগে তাদের নিজ নিজ ধর্মের উদ্ভট ব্যাখ্যাকেই কেবল মানুষের কাছে অখণ্ডনীয় (irrefutable) সত্যরূপে প্রচার করে ক্ষান্ত হননি, তারা এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলে বিজ্ঞানকে খাটো করতে চেয়েছেন।

অভিজিৎ রায় তাঁর সর্বশেষ নিবন্ধটিতে তুলে ধরেছেন কিভাবে আধুনিক বিজ্ঞান নিত্য নতুন গবেষণার মাধ্যমে এই প্রশ্নটিকেও আজ নিজের করে নিয়েছে এবং ধর্মবেত্তাদের মুখ থামিয়ে দিয়েছে। প্রবন্ধটি অভিজিৎ রায়ের সর্বশেষ বই 'শূন্য থেকে মহাবিশ্ব' বইয়ের নির্যাস হলেও আমার কাছে মনে হয়েছে, এই শিরোনামটি যেন তিনি আমাদের উদ্দেশ্যেই রেখে গিয়েছেন, যেন তিনি আমাদেরকে চোখে

আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন, ‘দেখো, কেন আজকের প্রজন্মের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চা একেবারেই না-থাকার বদলে কিছু হলেও আছে’।

হ্যাঁ, অভিজিৎ রায়ই সেই ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশী তরুণদের নিকট বিজ্ঞান সাহিত্যকে জনপ্রিয় করেছেন, তাদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতাকে জাগিয়ে তুলেছেন। বিজ্ঞানের নিত্য নতুন তথ্য ও




তত্ত্বকে বাংলা ভাষায় সহজ ও সাবলীল রূপে তুলে ধরে তাকে জনপ্রিয় করার দাবীদার একমাত্র তিনিই। তিনিই প্রথম ও একমাত্র ব্যক্তি যিনি সমকামিতার বৈজ্ঞানিক দিকগুলো তুলে ধরে বাংলা ভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ বই লিখেছেন যা হাজারো বাঙালির সমকাম বিষয়ে পূর্বেকার ধারণা আমূল পাল্টে দিয়েছে। তাঁর ‘ভালবাসা কারে কয়’ সম্ভবত বাংলা ভাষায় একমাত্র বই যেটি প্রেম ও যৌনতার বিবর্তনীয় মনোবৈজ্ঞানিক দিকটিকে অনেকটা গল্পের আলোকে তুলে ধরেছে। ২০১৫ সালে প্রকাশিত তাঁর আরেকটি বই ‘ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো– এক রবি বিদেশিনীর খোঁজে’ বইটিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের জীবনে বিভিন্ন সময়ে আসা নারীদের বিষয়টি যেভাবে বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন, তা একেবারেই অভিনব।

অভিজিৎ রায় ছিলেন একজন আপাদমস্তক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। বাংলাদেশের মানুষের কাছে অভিজিৎ রায়ের বড়

পরিচয় নাস্তিক হলেও তাঁর নাস্তিকতা ছিলো আসলে বিজ্ঞানমনস্কতার ফল। হ্যাঁ, নাস্তিকতা নিয়ে তিনি প্রচুর লিখেছেন। ব্লগে লেখা তার বহু প্রবন্ধ ছাড়াও তাঁর দুটি বই– রায়হান আবিরের সাথে যৌথভাবে লেখা ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ এবং তাঁর একার লেখা ‘বিশ্বাসের ভাইরাস’– প্রায় পুরোটাই নাস্তিকতার ওপরে লেখা হলেও প্রতিটা প্রবন্ধের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে বিজ্ঞান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি বিজ্ঞান দিয়েই ধর্মকে খণ্ডন (refute) করেছেন। আমার কাছে সবসময়ই মনে হয়েছে যে, অভিজিৎ রায় প্রচলিত

**ধর্মগুলোর বিরুদ্ধে যে লিখতেন তা নাস্তিকতা প্রচারের জন্য নয়, বরং ধর্মগুলো যে বিজ্ঞান চর্চার পথে অন্তরায় এবং বিশ্বাস ও কুসংস্কারের মাধ্যমে মানুষকে হত্যা ও শোষণ করে তার জন্যে।**

অভিজিৎ রায় মনে করতেন বাঙালি সমাজের অশিক্ষা-কুশিক্ষার পিছনে দায়ী প্রধানত ধর্ম। তিনি স্বপ্ন দেখতেন একটি যুক্তি-নির্ভর মুক্ত সমাজ, যা সত্যিকারার্থেই ধর্মকে এড়িয়ে গিয়ে গড়া সম্ভব নয়। আর তাই বিজ্ঞানের পাশাপাশি তাঁর লেখার অন্যতম বিষয় ছিলো ধর্ম ও ধর্মীয় সমাজের ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা।

এই আলোচনায় অভিজিৎ রায়ের পরিচয় তুলে ধরার তেমন কোন আবশ্যকতা রয়েছে বলে মনে করি না, বরং তার সৃষ্টি ও দর্শন বিষয়ে আলোকপাত করাই যথার্থ হবে বলে মনে করি। চিন্তায় তিনি ছিলেন যুগের চেয়ে অগ্রগামী। সেই ২০০১ সালে তিনি যখন বাংলাভাষীদের জন্য মুক্তবুদ্ধি চর্চার ক্ষেত্র তৈরি করার লক্ষ্যে ইয়াহু গ্রুপে মুক্তমনার যাত্রা শুরু করেন, বেশিরভাগ মানুষই তখন ইয়াহুতে যেতো মূলত বিনোদনমূলক চ্যাট করতে। ওয়েবসাইট হিসেবে মুক্তমনা যাত্রা শুরু করেছিলো ২০০২ সালে। মুক্তমনার এই দীর্ঘ পরিক্রমায় ওয়েবসাইটটি তথা ব্লগটি যে হাজারো বাঙালির চিন্তা-চেতনার জগতকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাঙালি তরুণদের ওপর মুক্তমনার প্রভাব সম্ভবত অন্য যে কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি।

অভিজিৎ রায় কেবল লেখকই ছিলেন না, ছিলেন একজন প্রেরণাদায়ী মানুষও। অন্য অনেককেই তিনি লেখক বানিয়েছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন লিখতে। তিনি জানতেন ও মানতেন যে, শিক্ষা নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে তা সমাজের তেমন কোন উপকারে আসে না, জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমেই কেবল মানুষের চিন্তা-চেতনাকে পরিবর্তন সম্ভব। মুক্তমনাতে আইডি নেই কিন্তু যৌক্তিক মন্তব্য করছেন, এমন কাউকে পেলেই তিনি তার নামে আইডি খুলে ইমেইল করতেন। কেবল মুক্তমনাতেই নয়, ফেসবুকের লেখা পড়েও তিনি অনেককে মুক্তমনায় লেখায়

উৎসাহিত করতেন। এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, লেখক খোঁজায় তাঁর উদ্দেশ্য কেবল মুক্তমনাতে লেখানোতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। তিনি জানতেন যে, কেউ মুক্তমনায় লিখতে চাইলে তাকে পড়তে হবে, জানতে হবে, লেখক হবার সাথে সাথে তাকে হতে হবে পাঠকও। লেখক ও পাঠক দুটো তৈরিতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

অভিজিৎ রায়ের মতো বাকস্বাধীনতায় বিশ্বাসী লোক বাংলা ব্লগে খুব কমই ছিলেন বা আছেন। বিরুদ্ধমতের প্রতি তিনি ছিলেন অসম্ভব রকমের উদার। আমরা দেখতে পাই, ব্লগারদের অনেকেই সমালোচনা সইতে পারেন না, বিরুদ্ধমতে রেগে যান। কিন্তু অভিজিৎ রায় এদিক দিয়ে ছিলেন খুব বেশিরকম সহনশীল। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা যুক্তিসহকারে তর্ক করতেন; ব্লগের কোন পোস্টে তাকে রেগে যেতে দেখেছি, এমনটা মনে পড়ে না। আমি অবাক হতাম তিনি তাঁর দৈনন্দিন রুটিন কাজের বাইরে গিয়ে এতোটা সময় কী করে বের করতেন। বাংলা ব্লগে তাঁর চেয়ে বেশি রেফারেন্সসহ লেখা কারো আছে বলে মনে হয় না; তাঁর মতো এতো বিচিত্র বিষয় নিয়েও কেউ সম্ভবত লেখেননি। তার মানে তাঁকে প্রচুর পড়তে হতো। আবার মুক্তমনাতে প্রকাশিত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ পোস্টও তিনি পড়তেন এবং মন্তব্য করতেন। সবার ওপর নিজের পোস্ট ও বই লেখা তো ছিলোই; লিখতেন পত্রিকাতেও। যোগাযোগ রাখতেন দেশ ও দেশের বাইরের বিভিন্ন মানবাধিকার

সংস্থার সাথে। একজন মানুষ সংসারে বাস করে কিভাবে এতোটা সময় বের করতেন ভাবতে আশ্চর্যই হতে হয়। আমার তো মনে হয়, বন্যা আহমেদের মতো একজন স্ত্রী পেয়েছিলেন বলেই তিনি আজকের অভিজিৎ রায় হয়ে উঠেছিলেন, নইলে সংসারের যাঁতাকলে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো।

অভিজিৎ রায় ছিলেন বাংলাদেশের ব্লগারদের দুর্দিনের কাণ্ডারি। ২০১৩ সালে যখন চারজন ব্লগারকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে প্রেরণ করা হলো, অভিজিৎ রায় বুঝতে পারলেন যে কেবল আভ্যন্তরীণ লবিংয়ের মাধ্যমে তাদেরকে মুক্ত করা সম্ভব হবে না, আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি করতে হবে বাংলাদেশের ওপর। তিনি আন্তর্জাতিক মিডিয়া এবং মানবাধিকার সংস্থাগুলোতে লিখতে শুরু করলেন। তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। সব ব্লগাররাই মুক্ত হয়েছিলেন এবং আজ মুক্তভাবে জীবনযাপন করছেন।

**২০১৫ তথা পরবর্তীতে বাংলাদেশী নাস্তিক ব্লগাররা এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। অভিজিৎ রায় বেঁচে থাকলে তিনি যে ব্লগারদের এমন দুর্দিনে কাণ্ডারি হিসেবে অবতীর্ণ হতেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।**

অভিজিৎ রায়ের লেখায় আরেকটি বিষয় যা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো তা হলো তাঁর কাব্যিক রসবোধ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি অনেকসময়ই কবিতাকে টেনে আনতেন। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, ওমর খৈয়াম থেকে শুরু করে বহু বিদেশী কবির উদ্ধৃতি পাওয়া যায় তার বিজ্ঞান প্রবন্ধগুলোতে। ফেসবুকে অভিজিৎ রায় আমার কোন পোস্টে প্রথম মন্তব্যও করেছিলেন সম্ভবত একরকম একটি লেখার সূত্র ধরে। আমি বিজ্ঞান বক্তা আসিফের লেখা বই 'কার্ল সাগান– এক মহাজাগতিক পথিক' নিয়ে লিখতে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ বা রবীন্দ্রনাথের কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম। অভিজিৎ রায় সেখানে লিখেছিলেন যে, তিনিও আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী বইয়ে ঐ বিষয়ে একই তুলনা দিয়েছেন। তাঁর দুটি বই– আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী ও ভালবাসা কারে কয়– রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা থেকে নেয়া। নিরস বিজ্ঞানকে যিনি এমন কাব্যরসময়তায় টেনে আনতে পারেন, তিনি তো মানুষের কাছে জনপ্রিয় হবেনই।

অভিজিৎ রায়ের কাব্য রসবোধ নিয়ে বলতে গিয়ে তাঁর লেখা 'ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো– একজন রবি-বিদেশিনীর খোঁজে' বইটির কথা বলতে হয়। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের একজন প্রেমিকা কেন একজন বিজ্ঞান লেখককে টানবে? কেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে নিয়ে তিনি পুরো একটা বই লিখতে গেলেন? আর্জেন্টিনা ভ্রমণে গিয়ে অভিজিৎ রায়

দেখলেন যে, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে আমরা যেভাবে চিনি, সেটা আসলে ওকাম্পোর খুবই খণ্ডিত একটি রূপ। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো আর্জেন্টিনা তথা ল্যাটিন আমেরিকার একজন প্রভাবশালী নারীবাদী লেখক যার সাথে ঐ সময়কার ইউরোপ-আমেরিকার প্রায় সমস্ত বিখ্যাত লেখকদের সাথেই ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিলো। এটাও তাঁকে নিয়ে বই লেখার কোন যৌক্তিক কারণ ছিলো না। আরও খুঁজতে গিয়ে অভিজিৎ রায় পেলেন যে, ওকাম্পো রবীন্দ্রনাথের জীবনে কেবল একজন নারীই ছিলেন না, তিনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ও জীবনে বেশ কিছু নতুন অধ্যায় যুক্ত করেছেন। ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সাথে পরিচয়ের পূর্বে নারী বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো সেকেলে। ঠাকুর পরিবারে কন্যাদের শিশুবিবাহ প্রচলিত ছিলো এবং রবীন্দ্রনাথ এতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর তিন কন্যাকেই অল্প বয়সে পাত্রস্থ করেছিলেন। এছাড়া নারীবাদকে তিনি বহুবার আক্রমণ করেছেন বিভিন্ন প্রবন্ধে ও গল্পে (প্রগতিসংহার)। এমনকি নারীবাদ বিষয়ক সাহিত্যকেও আক্রমণ করেছেন- এক্ষেত্রে নরওয়েজিয়ান লেখক হেনরিক ইবসেনের লেখা নাটক 'একটি পুতুলের ঘর'-এর সমালোচনা উল্লেখ্য। কিন্তু ওকাম্পোর সাথে পরিচয়ের পরে রবীন্দ্রনাথের সেই সেকেলে ধারণা অনেকটাই পাল্টে যায়।

নারী বিষয়ক চিন্তার পরিবর্তন ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের জীবনে আরও অনেক পরিবর্তন নিয়ে আসেন ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো।

তাঁর গৃহে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের কবিতার খাতার আঁকাআঁকি দেখে ওকাম্পোই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে বুঝান যে, তাঁর মধ্যে এক চিত্রশিল্পী সত্তা আছে। এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকা শুরু করেন এবং পরবর্তী কয়েক বছরে কয়েক হাজার ছবি আঁকেন। প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করে দেন ওকাম্পো, যা বিশ্ববাসীর কাছে রবীন্দ্রনাথের এক নতুন পরিচয় তুলে ধরে। এরপর একে একে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয় লন্ডনসহ ইউরোপের বহু শহরে।

ওকাম্পোর সাথে রোমান্টিক সম্পর্কটি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নিয়ে আসে এক নতুন রোমান্টিকতা যা সংকলিত হয় পূরবী কাব্যগ্রন্থে। পূরবী কাব্যগ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন বিজয়াকে। এই বিজয়া আর কেউ না, ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোই। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিজয়া নামেই ডাকতেন।

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা উপন্যাসে লাবণ্য চরিত্রের দৃঢ়তা আসলে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর চারিত্রিক দৃঢ়তাই। উপন্যাসটির শেষের দিকে যে কবিতাটি রয়েছে, তার দুটি লাইন 'তোমায় যা দিয়েছিনু তা তোমারই দান— গ্রহণ করেছো যতো ঋণী তত করেছো আমায়।' আসলে রবীন্দ্রনাথকে লেখা ওকাম্পোর চিঠির লাইনের প্রায় হুবহু অনুবাদ। অভিজিৎ রায় এই বইটিতে এসব তুলে ধরেছেন প্রমাণসহ। আর রবীন্দ্রনাথের জীবনে নারী নিয়ে তিনি যে

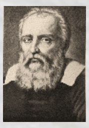
বিবর্তনীয় মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সে বিষয়ে প্রথমেই বলেছি।

এবারে অভিজিৎ রায়ের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে কিছু বলছি। তাঁর সাথে আমার একবারই দেখা হয়েছিলো। ২০১২ সালের বইমেলায়। ঐ সময় পর্যন্ত তিনি যেহেতু ফেসবুক বা ব্লগে কোন ছবি দেননি, তিনি দেখতে কেমন হবেন সেটা ছিলো একেবারেই অনুমাননির্ভর। প্রথম দেখায় একটু অবাকই হয়েছিলাম, কারণ সে অনুমানের সাথে কিছুই মেলেনি। দেখলাম আমার মতো তাঁরও বেশ খানিকটা বাঙালি-ভুড়ি আছে। আমি মুক্তমনার ব্লগার ছিলাম না; তবুও তিনি আমাকে দেখেই কাছে টেনে নিলেন। চটপটি খেতে খেতে নিজের ভুরি নিয়ে রসিকতাও করলেন। বিশ্বাস ও বিজ্ঞান বইটিতে অটোগ্রাফ দিলেন এবং প্রথম দেখার নিদর্শন হিসেবে আমাকে ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ বইটি উপহার দিলেন।

অভিজিৎ রায়ের হত্যা বাঙালিদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। আমরা যতোই বলি যে, একজন অভিজিতের মৃত্যুতে হাজারো অভিজিতের সৃষ্টি হবে, এটা কেবলই কথার কথা; পরবর্তী একশ বছরেও অভিজিৎ রায়ের মতো কেউ আসবেন, এমনটা আমি মনে করি না। হয়তো কেউ অভিজিৎ রায়ের লেখার চেয়ে উন্নত মান নিয়ে আসতে পারেন, কিংবা আরও বেশি কর্মঠ কেউ আসতে পারেন,

কিন্তু সামগ্রিকভাবে তাকে কেউ ছুঁতে পারবেন এমনটা ভাবা আমার পক্ষে কঠিন। ২০১৫ সালের এই দিনটির কথা মনে পড়ে। সেদিন তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে শুভ্র আর আমি ফোনে খুব কাঁদছিলাম। শুভ্র কী জন্য কেঁদেছিলো জানি না, তবে আমার সেই কান্না কোন ব্যক্তি অভিজিৎ রায়ের জন্য ছিলো না, আমার কান্না ছিলো অভিজিৎ রায়ের অনুপস্থিতিতে আমরা কতো বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হলাম, বা অভিজিৎ রায় যদি আরও ২০টি বছরও বাঁচতেন তাহলে আমাদেরকে তথা পৃথিবীর মানুষকে আরও কত কী দেয়ার ছিলো, তা ভেবে। হয়তো ভাবছেন, আমার কান্নাতে স্বার্থপরতা ছিলো। জানি না, হয় তো তাই-ই হবে।

(লেখাটি সিলেট টুডে ২৪-তে প্রকাশিত)

> "জগতে যখন মূর্খের সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন সত্য প্রকাশ দুরুহ হয়ে পড়ে"
>
> - গ্যালিলিও 

# ভারতের মিসিং উইমেন

-অনুজ বিশ্বাস

প্রাচীন ভারতে নদীমাতৃক-মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার হাত ধরে সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়। প্রাক বৈদিক যুগ থেকেই মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করলেও পরবর্তীতে পেশীশক্তির দ্বারা রচিত "বীর ভোগ্যা বসুন্ধরা" মতবাদ এর হাত ধরে ক্ষমতা হস্তান্তরের পালা শুরু হয়। এরপর এল মনুসংহিতা, মাতৃতন্ত্রের সর্বনাশ হয়ে গেল, মাতৃজাতি বারবনিতায় পরিণত হল। বর্তমান যুগে শিক্ষিত উন্নত দেশগুলোতে দেখা যায় নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে সামান্য বেশি। আধুনিক মানুষ তথা হোমো-স্যাপিয়েন্স এর মধ্যে টিকে থাকার ক্ষমতা বা Survival Ability সাধারনত মহিলাদের বেশি, তাই মহিলাদের গড় আয়ুও পুরুষের চেয়ে বেশি হয়। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় নারী ও পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান সমান হলেও পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একাধিক বিশ্বযুদ্ধ ও অন্যান্য রাজনৈতিক গোলযোগের কারণে বহু কোটি মানুষের মৃত্যু হয় যার অধিকাংশই ছিলেন পুরুষ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার পর সারা বিশ্বের সামগ্রিক জনসংখ্যা বিচার করলে দেখা যায় নারীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশি। ১৯৫০ সাল নাগাদ বিশ্বে নারী পুরুষের অনুপাত ছিল প্রায় ১ : ০.৯৪৫,

অর্থাৎ প্রতি ১০০০ জন মহিলা প্রতি পুরুষের সংখ্যা ৯৪৫ জন প্রায়।

এই অব্দি সবকিছু দিব্যি ঠিকঠাক ছিল। গন্ডগোল বাঁধলো গত শতকের আশির দশকে। একজন দেশদ্রোহী, দেশত্যাগী বাঙালী গবেষক লক্ষ্য করলেন এক আশ্চর্য জিনিস....ভারতের মেয়েরা কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। দেশের বহু রাজ্যে মেয়েদের সংখ্যা শোচনীয় ভাবে কমতে শুরু করেছে। সবচেয়ে উপদ্রুত রাজ্য গুলি হল বিহার, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, গুজরাত, মহারাষ্ট্র ও মধ্য প্রদেশ; তথাকথিত "আর্য্যাবর্ত"। সাবিত্রী সীতার দেশ থেকে মেয়েদের হরণ করছে কোনও এক অজানা রাক্ষসের দল। আরও গবেষণায় দেখা গেল এটা শুধু ভারতের ছবি নয়, চীন -মধ্যপ্রাচ্য -উত্তর আফ্রিকা- দক্ষিণ এশিয়া সর্বত্র এক চিত্র। দেখাগেল সারা পৃথিবীতে যা থাকা উচিৎ তার চেয়ে ১০কোটি মহিলা কম, যার মধ্যে শুধু ভারতেই সংখ্যাটা প্রায় ৪ কোটির কাছাকাছি। এরাই Missing Women..কোথায় গেলেন তাঁরা? হঠাৎ করে উবে গেল এতগুলো মানুষ? কিন্তু কিভাবে?

গবেষণায় বেরিয়ে এল এক ভয়াবহ, গা ঘিনঘিন করা জান্তব সত্য....আল্ট্রাসনোগ্রাফি বা আল্ট্রাসাউন্ড। আল্ট্রা সাউন্ড করে খুঁজে বার করা হচ্ছে কন্যাভ্রূণ এবং শুধু মেয়ে হওয়ার অপরাধে তাদের মাতৃগর্ভেই খুন করা হচ্ছে। সারাবিশ্বে

হুলুস্থুল পড়ে গেল। কারণটা নীচের পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট –

রাষ্ট্রপুঞ্জের World Population Prospectus ২০১৯ অনুসারে বর্তমান ভারতে প্রতি ১০০০ জন পুরুষে নারীর সংখ্যা মাত্র ৯৪৩ জন। ১৯০১ সালে ব্রিটিশ ভারতে ১০০০ জন পুরুষে নারীর সংখ্যা ছিল এযাবৎ কালের মধ্যে সর্বোচ্চ, ৯৭২ জন। এরপর সংখ্যাটা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ১৯১১ সালে ৯৬৪; ১৯২১ সালে ৯৫৫; ১৯৩১ সালে ৯৫০ হয়ে ১৯৮১ সালে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৯২৭ জন, যা ইতিহাসে সর্বনিম্ন। ১৯৬৫ সাল নাগাদ ভারতে বাণিজ্যিক ভাবে আল্ট্রাসাউন্ড এর ব্যবহার শুরু হয়। তারপর থেকেই লক্ষ্যণীয় ভাবে মেয়েদের সংখ্যার কমতে থাকে। ১৯৮৫-৯০ সালের মধ্যে অবস্থা চরমে ওঠে।

দেশব্যাপী ছড়াতে থাকা এই সামাজিক ক্যান্সার দেশের একশো কোটি মানুষের চোখ এড়িয়ে গেলেও সেই দেশত্যাগী বাঙালী গবেষকের চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না। যদিও বাঙালী গবেষক তখন দেশ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে হার্ভার্ডের ল্যামন্ট ইউনিভার্সিটিতে অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপনা করেছেন। সব দেখেশুনে তিনি আর থাকতে পারলেন না। কিন্তু তিনি তাঁর দেশের মানুষকে ভালো করেই চেনেন। তিনি জানেন, এই পোড়া দেশে কেউ তাঁর কথা গ্রাহ্য করবেনা। তাই যেখানে বললে কাজ হতে পারে

সেখানেই তিনি কলম ধরলেন। এই বাঙালী অর্থনীতিবিদ প্রথমে নিউ ইয়র্কের বুক রিভিউ তে এ'বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন, যা পরবর্তীকালে British Medical Journal (Vol. 304, Issue 6827 dtd 7th March, 1992, Pp 587-588) এ একটা বিস্ফোরক গবেষণাপত্র হিসাবে বেরোয় "Missing Women: Social Inequality Outweighs Women's Survival Advantage in Asia and North Africa" নামে।

**সারা বিশ্বে আলোড়ন পড়ে যায়। রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে চলতে থাকা এক সুপরিকল্পিত নারকীয় গনহত্যার নৃশংস কাহিনী বে-আব্রু হয়ে পড়ে।**

দেশে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। ভারত সরকার বাধ্য হয় ব্যবস্থা নিতে। ১৯৯৪ সালে জারি হয় Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act বা Prohibition of Sex Selection আইন। এর ফলে গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হয় এবং দেশের সমস্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টারে গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ বন্ধ করার নোটিশ টাঙানো বাধ্যতমূলক করা হয়।

যদিও এই আইন প্রণয়নের ফলে লাভের লাভ আজও বিশেষ হয়নি তবুও যেটুকু হয়েছে তাই বা কম কি? আজ ভারত তথা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে মানুষের লিঙ্গ অনুপাত আগের তুলনায় অনেক ভালো। জন্মের আগে লিঙ্গ নির্ধারণ অপরাধ ঘোষিত হয়েছে। কোটি কোটি মেয়ের প্রাণ বাঁচিয়েছেন এই যুগন্ধর বাঙালী, যাঁর নাম অমর্ত্য সেন। জন্ম জন্মান্তরের জন্য ভারতবর্ষ তাঁর কাছে চির ঋণী হয়ে থাকবে।




আমরা এই সর্বভারতীয় লজ্জার কথা জানি না, আর জানলেও তাকে কর্পোরেট আর গণতন্ত্রের কার্পেট দিয়ে ঢেকে রাখতে সদা সচেষ্ট থাকি। উত্তর ভারতীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে গেঁথে যাওয়া মনুবাদী সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় কলঙ্ক এই কন্যা ভ্রূণ হত্যা। এরা মৃণ্ময়ী রূপে আদ্যাশক্তির আরাধনা করে আর গর্ভের দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ দেয়না। এমনকি দেশের সরকারও ভ্রূণ হত্যাকে পরোক্ষ সমর্থন জানিয়ে নিজের মত ন্যারেটিভ তৈরি করে। ২০১৬ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শ্রীমতী মানেকা গান্ধী গর্ভস্থ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ বাধ্যতমূলক করার পক্ষে সওয়াল করেন। ২০১৬ সালের ফেব্রয়ারি মাসে All India Regional Editors' Conference এ তিনি বলেন ".... the women should

be compulsorily told that whether it is a boy or a girl child whom she is going to give birth"... প্রথম বিশ্বের দেশগুলোতে এমন প্রস্তাব লোভনীয় কিন্তু ভারতের জন্য কখনোই নয়। অন্তঃস্বত্তা মহিলা নাহয় জানলেন তাঁর গর্ভস্থ ভ্রূণ ছেলে না মেয়ে, কিন্তু যদি মেয়ে হয় তখন সেই মেয়েটিকে সমাজের হায়েনা দের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা করা হবে সেবিষয়ে মন্ত্রী মহোদয়া একটি কথাও খরচ করলেন না। তিনি সুকৌশলে এড়িয়ে গেলেন আমাদের আজন্ম লালিত মনুবাদী মানসিকতা। পুত্র সন্তানের লোভে আমরা মাতোয়ারা হতে গিয়ে আমাদের মনে এমন এক কদর্য আত্মশ্লাঘা তৈরী হয়েছে যে নিজের অজান্তেই আমরা সৃষ্টির পথ বন্ধ করতে উদ্যত হয়েছি। আর্য্যাবর্তের অবস্থা সবচেয়ে করুণ। এখানে মেয়েরা সামাজিক ব্যবসার পণ্য। উত্তর ভারতীয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের বৌদ্ধিক মানদণ্ডের কোন জায়গা নেই, অর্থই শেষ কথা বলে।

স্বাধীনতার পরে মনুবাদী চিন্তাধারা কে প্রসারিত করার দায়িত্ব নেয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ গুরু গোলবলকার তাঁর Bunch of Thoughts বইতে ভারতীয় নারীর আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তাধারা কে নস্যাৎ করে, সংস্কারের দোহাই দিয়ে তাদের পরিষ্কার ভাবে পুরুষের ভোগ্যপণ্য হিসাবে উপস্থাপন করে ব্রাহ্মণ্যবাদী দের জন্য সমাজের সর্বস্তরের নারীর গর্ভে সন্তান উৎপাদন এক

পবিত্র কর্তব্য বলে উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন উত্তর ভারতীয় উন্নত ব্রাহ্মণের ঔরসে দক্ষিণ ভারতীয়, তথাকথিত নিম্ন বর্ণের মহিলার গর্ভে যে সঙ্কর প্রজাতির সন্তান জন্ম নেবে তার মাধ্যমেই নিম্ন বর্ণের জিনগত উন্নতি সম্ভব। এর ফলে নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে কন্যাভীতি তৈরি হয়। উচ্চবর্ণের লম্পটদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজের মেয়েকে রক্ষা করতে পারার অপারগতা থেকেই সমাজের নিম্নবর্ণের মধ্যেও কন্যা ভ্রূণ হত্যা করার প্রবণতা তৈরি হয়। অন্যদিকে মনুসংহিতা অনুসারে উচ্চবর্ণের বিবাহে পণ দেওয়া আবশ্যিক। এখানেও কন্যাসন্তান ক্রমশ পিতার বোঝা হয়ে ওঠে। এপ্রসঙ্গে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ওয়াই.কে. সভারওয়াল মন্তব্য করেন, "Investing in a daughter, They say, is like 'watering your neighbour's lawn' "... আর্য্যাবর্তের মানুষ ভাবে “পুরুষ হল উৎপাদক, মহিলা হল উপভোক্তা”। এমন মধ্যযুগীয় মানসিকতা আজও আমাদের জাতীয় লজ্জা।

আজ উঠতে বসতে অমর্ত্য সেন কে গালিগালাজ করা, তাঁকে দেশদ্রোহী, শহুরে নকশাল বলাটা আমাদের নতুন রাজনৈতিক প্রোপাগন্ডা। উনি নোবেল পেয়েছেন বটে, কিন্তু 'ভারতের জন্য কী করেছেন?' এই প্রশ্নে একজন নতুন ভোটারও নিজের ফেসবুক ওয়াল ভরিয়ে ফেলে। সেদিন অমর্ত্য সেন ওই প্রবন্ধ না লিখলে আজকের অনেক অষ্টাদশী যুবতী হয়তো পৃথিবীর আলোই দেখতে পেত না। যে

মানুষের ঋণ সারা বিশ্ব জন্ম জন্মান্তরেও শোধ করতে পারবে না সেই মানুষের যোগ্যতা নিয়ে আজকের হোয়াটসঅ্যাপ ইউনিভার্সিটির অশিক্ষিত গ্র্যাজুয়েটেরা প্রশ্ন করে, অনেকাংশেই রাষ্ট্রীয় মদতে। এ কেবল ভারতবর্ষেই সম্ভব।।

তথ্যসূত্র:

১. অমর্ত্য সেনের মূল প্রবন্ধের ওয়েবলিঙ্ক: https://www.bmj.com/content/304/6827/587

২. MS Golwalkar, Bunch of Thoughts, Ch. Call to the Motherhood, Pp. 283-287., The Organizer, January 2, 1961, Pp. 5, 16.

৩. অন্যান্য সকল তথ্য ও পরিসংখ্যান ইন্টারনেটে সহজলভ্য।

অনুজ বিশ্বাস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ডাক বিভাগে কর্মরত।
ইমেল: anuj.biswas.dop@gmail.com, biswasanuj.007@gmail.com

> "মানবতার এই মহান যুগে একবার গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে তুমি ব্রাহ্মন নও, শুদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমানও নও, তুমি মানুষ - তুমি ধ্রুব সত্য।"
>
> -কাজী নজরুল ইসলাম

# স্রোতের বিরুদ্ধে চলা বিস্মৃত এক বিশ্বমানব

-রাহুল রায়

হিন্দুরা সমুদ্র অতিক্রম করতে পারবে না। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদের সৌজন্যে দীর্ঘদিন সমুদ্র ভ্রমণের ওপর সামাজিক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিল। এই নিষেধাজ্ঞার কারন বা ইতিহাস কী সেটা তৎকালীন সমাজপতিরাই বলতে পারেন। কিন্তু এর ফলে শুধু হিন্দুরা নয়, সমগ্র মানবজাতিরই বিশাল ক্ষতি হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের কথা বাদ দিলে সুদীর্ঘকাল ভারতের বিশাল অংশের মানুষ সামাজিক কারণে সমুদ্র পেরোতে পারেননি। ব্রিটিশ শাসনে এদেশে ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য জ্ঞানধারার বিস্তারের মধ্যে দিয়ে মানুষের প্রতি সমুদ্রের অন্যদিকের সভ্যতার প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। একদিকে যুগের পর যুগ থেকে চলে আসা সামাজিক শোষণ যেমন তাঁদের প্রচলিত নিয়ম নীতির প্রতি বিতৃষ্ণ ও নতুন কিছুর প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল তেমনি দেশের শাসকদের চোখ ধাঁধানো উন্নতি তাঁদের মন-মস্তিষ্ককে বিশাল ভাবে নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু এই উন্নতির ব্যাপারে প্রত্যক্ষ ভাবে জানতে, নিজেদের চোখে দেখতে জানতে সমুদ্র পেরোতে হতো। বাধা হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক নিষেধাজ্ঞা। কিন্তু তার ক্ষমতাই বা আর কত। অন্তহীন, উচ্ছল জলরাশির সমুদ্রের দিকে তখন নব্যশিক্ষিতের দল

আর সামাজিক ভ্রূকুটিকে মাথায় নিয়ে অসহায় ভাবে দেখার চেয়ে বর্হিবিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম হিসাবে উৎসাহ ভরা চোখে দেখতে শুরু করল। অবশেষে সামাজিক বন্ধন, দীর্ঘদিনের সব সংস্কারকে পাশ কাটিয়ে একদিন একজন সমুদ্রের ওপারের অংশের দিকে এগিয়ে চলল। পৃথিবীকে জানতে, বুঝতে, আত্মীয়তা করতে সে এগিয়ে চলেছিল, পেছনে পড়ে রয়েছিল একদল কুপমণ্ডুপ ও তাঁদের তৈরী চরম বিরক্তিকর কিছু নিয়ম নীতি।

ব্রিস্টল, ব্রিটেনের একটি সুন্দর নগর। সেই নগরে গত ১৮৫ বছর ধরে প্রতিবছর একজন ভারতীয় মনীষীর স্মৃতিতে তৈরী মন্দিরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। এখানে বলে রাখা ভালো যে এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের অনুষ্ঠানটি সেখানে বাসরত প্রবাসী ভারতীয়রা করেন না। নগর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানটি যথাযথ মর্যাদা সহকারে আয়োজন করা হয় এবং সেই শহরের মেয়র সহ গন্যমান্য ব্যক্তিরা সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। ব্রিস্টল শহরে সেই মনীষীর নামে একটি রাস্তাও আছে। ১৯৩০ সনে এই মনীষী যখন ব্রিটেন এসে পৌঁছান তখন তাঁকে দেখতে যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল আজ পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধী ছাড়া ব্রিটেনে কোনো ভারতীয়র জন্য তা হয়নি। এমনকি ১৯৯৩ সনে আমেরিকার চিকাগো শহরে ধর্মসভার পর স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়েও সম্ভবতঃ সেরকম উন্মাদনা সৃষ্টি হয়নি। উল্লেখযোগ্য সেই ব্যক্তিই প্রথম ভারতীয় যিনি সমুদ্র পার করে বিদেশ

গিয়েছিলেন। ১৮৩০ সনের ১৯ নভেম্বর, কলকাতা থেকে ‘ফবর্স’ জাহাজে চেপে তিনি ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলেন। বাংলার নবজাগরণের জনক হিসাবে পরিচিত সেই মনীষী ‘ভারতপথিক’ রাজা রামমোহন রায়।



বাংলায় একটা কথা প্রচলিত আছে, এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। রামমোহন রায় ব্রিটেনে কিন্তু গিয়েছিলেন বিজয়ী হয়েই। তাঁকে নিয়ে সেখানকার মানুষের উন্মাদনার শেষ ছিল না। সতীদাহ নিয়ে বিরোধীতা এদেশে নতুন নয়, তৃতীয় শিখ গুরু অমর দাস থেকে শুরু করে উনিশ শতকের গোঁড়ায় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এই তালিকা কিন্তু খুব একটা ছোটো নয়। কিন্তু সতী দাহ প্রথাকে আইন করে বন্ধ করার পেছনে রামমোহনের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি।

**মহিলাদের এই সামাজিক কুপ্রথা থেকে মুক্ত করার জন্য ব্রিটেনের কারখানা শ্রমিকদের মধ্যে রামমোহনের জনপ্রিয়তা ছিল আকাশচুম্বী। কারণটা অনুধাবন করা দুষ্কর নয়।**

এই শ্রমিকরা দীর্ঘদিন থেকে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। ভারতীয় মহিলাদের সামাজিক কুপ্রথার থেকে

এই মুক্তির সঙ্গে তাঁরা তাঁদের কাঙ্খিত মুক্তির মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন। ১৮২০-২২ এর দিকে তখন ব্রিটেনে দেশে প্রচলিত দাসপ্রথা ও ভারতের সতীদাহ প্রথা বাতিল করার ব্যাপারে জনমত গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। সতীদাহ প্রথার অবলুপ্তি সেদিন দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে মারাত্মক রকম উৎসাহ দিয়েছিল। রামমোহন রায়ের ছবি ও সইয়ের তখন বিশাল কদর সর্বত্র। দোকানে দোকানে সেই ছবি ও সই লাগিয়ে রাখা হতো। তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে সমাজের অভিজাতরা দূর থাকতে পারেননি। ডিউক অফ সাসেক্স রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর একটি ছবি লাইব্রেরীতে লাগিয়ে রেখেছিলেন। পত্রিকার স্বাধীনতা নিয়ে তাঁর আপোষহীন ভূমিকা দেশের বাইরেও তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে ১৮২৩ সনে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে ভারত থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর শাসকদের এই হস্তক্ষেপ রামমোহন রায় মেনে নিতে পারেননি। তীব্র প্রতিবাদ করে ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন রাজা ষষ্ঠ জর্জের কাছে তিনি একটি ঐতিহাসিক চিঠি লেখেন। পরবর্তীতে সরকার তাঁর আবেদনে সাড়া না দিলে প্রতিবাদে তিনি তাঁর ফার্সী পত্রিকা ‘মিরাত-উল-আখবার’ বন্ধ করে দেন। সমসাময়িক যুগে ইংল্যাণ্ড সরকারের বিরুদ্ধে এই ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সাহসী ও প্রেরণাদায়ক। ব্রিটেনের সংবাদপত্রগুলোতে সংবাদমাধ্যমের

স্বাধীনতার পক্ষে তাই সেই ভূমিকার কথা ফলাও করে ছাপা হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদ বনাম বিশ্বমানবতার তর্ক নতুন নয়। একদলের যুক্তি যেখানে আগে ঘর তো পরে পর, অন্যদলের যুক্তি সেখানে পাশের ঘরে আগুন লাগলে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে নিজের ঘরও বেশিসময় বাঁচানো যায় না। রামমোহন রায় দ্বিতীয় দলের লোক ছিলেন। কখনোই নিজেকে জাতি বা ধর্মীয় পরিচয়ের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চাননি। অস্ট্রিয় সেনারা পরাধীনতা বরণ করতে বাধ্য হলে ব্যথিত রামমোহন রায় সাংবাদিক বন্ধু বাকিংহামকে জানান যে 'I am afraid I must be under the necessity of denying myself the pleasure of your society this evening; more specially as my mind depressed by the late news from Europe. I consider the cause of Neapolitans as my own and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be ultimately successful'। আবার স্পেনের স্বেচ্ছাচার থেকে দক্ষিণ আমেরিকান দেশগুলোর মুক্তি তাঁকে উৎফুল্ল করে তুলেছিল। সেই আনন্দ ভাগ করে নিতে ইউরোপীয় বন্ধুদের নিয়ে একটি ভোজের আয়োজন করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডে নির্বাচনে শ্রমিক দলের জয়লাভ বা ফ্রান্সে উদারপন্থীরা ক্ষমতা দখল তাঁকে উৎসাহী করে

তুলতো। বিপ্লবের দেশ ফ্রান্স নিয়ে তাঁর অনুভূতি সবসময় ছিল বিশেষ। ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে ফ্রান্স যেতে উদ্যোগীও হয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা, উদারবাদের দেশ ফ্রান্সে যেতে পাসপোর্ট লাগে শুনে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি কোনোমতেই স্বাধীনতার সেই দেশে কারোর অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করবেন না। ব্যবস্থার পরিবর্তন চেয়ে চিঠি লিখলেন ফ্রান্সের বিদেশমন্ত্রীকে, 'All mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches'। চিঠি পৌঁছায় ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপের কাছে। রাজা সাদরের আমন্ত্রণ জানান আরেক রাজাকে। সেই ঘটনার সাত বছর আগে অর্থাৎ ১৮২৪ সন থেকেই রামমোহন রায় সেই দেশের এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য ছিলেন। ফ্রান্সবাসীরা রামমোহন রায়কে সাদরে গ্রহণ করেন। খুব কম সময়ের মধ্যেই ইউরোপের এই সুসভ্য দেশটির সঙ্গে রামমোহন রায়ের সুমধুর আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। ইউরোপে তাঁর জনপ্রিয়তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সেই সময়ে স্পেনের নতুন প্রণীত সংবিধানটি রামমোহন রায়কে উৎসর্গ করা হয়।

এই বছর রাজা রামমোহন রায়ের জন্মের ২৫০ বছর পালন করা হচ্ছে। বলতে বাধা নেই রামমোহন রায়কে ভারতীয় নবজাগরণের জনক বললে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না। নিজের সময়ের তুলনায় শতাধিক বছর আধুনিক

চিন্তার এই মানুষটি একটি আধুনিক ভারতীয় তথা মানব সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। অবিচার, অনাচার, অত্যাচার মুক্ত একটি সমাজ।

**ধর্মীয় অনাচার সহ্য করতে না পেরে পৃথক ধর্মের চিন্তা করলেন, জন্ম হয় 'ব্রাহ্মসমাজের', সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে নেমেছিলেন।**

ভবিষ্যত সমাজের উদারীকরণে শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনীকরণের গুরুত্ব বুঝতে পেরে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য শিক্ষার আমদানীর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। আধুনিক যুগে অনেকের কাছেই তাঁর ব্রিটিশের সাহচর্য দৃষ্টিকটু মনে হতে পারে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে সেই জায়গা থেকে ধারণা তৈরী করার আগে সেই সময়টাকে ভাবতে হবে। এবং পাশাপাশি মনে রাখতে হবে সেই সময়ে দাঁড়িয়ে রামমোহন রায় ব্রিটিশের তৈরী নীতির প্রকাশ্যে বিরোধীতা করেছিলেন। সেই মানুষটিও আজ আমাদের সমাজে প্রায় বিস্মৃত। কেন্দ্র বা তাঁর জন্মভূমি পশ্চিমবাংলা সহ কোনো রাজ্য সরকারই তাঁর জন্মের ২৫০-তম বর্ষ পালনে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। তবে করার কারণও নেই। আজকে যারা ধর্মের নামে, জাতির প্রাচীন ঐতিহ্যের নামে রাজনীতি করে তাঁদের

কাছে রামমোহন রায়ের মতো মনীষীদের যে গুরুত্ব থাকবে না সেটাই তো স্বাভাবিক। এই মানুষটি যে সমাজ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সেই সমাজে এরকম রাজনীতি যে খুবই অচল। তারা নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থরক্ষার্থে সমাজকে রামমোহন রায়ের প্রদর্শিত পথের ঠিক বিপরীতে নিয়ে যেতে চায়। এবার মানুষ তথা সমাজকেই ঠিক করতে হবে যে তাঁরা কোন পথের পথিক হবেন।

রাহুল রায়
স্বামীজী রোড, শিলচর

> "কতগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হয়। কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন, সে সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ মতভেদ নেই। তবে ভ্রান্ত হলেও এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। সংস্কৃতে যখন এইগুলি পড়াতেই হবে তখন তার প্রতিষেধক হিসাবে ছাত্রদের ভাল ভাল ইংরাজি দর্শনশাস্ত্রের বই পড়ানো দরকার।"
>
> - বিদ্যাসাগর

# বার্ডেন অব প্রুফ

- আমিনুল ইসলাম ইমন

Burden of Proof নামের একটা বিশেষ কনসেপ্ট আছে যেটার সাথে আমাদের দেশের সংস্কৃতিতে অশিক্ষিত মানুষ তো নয়ই খুব কম শিক্ষিত মানুষ পরিচিত। অথচ এই কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকলে মানুষ কখনো যৌক্তিক বা বিজ্ঞানমনস্ক হবে না।

এই কনেসেপ্ট এর মূল কথা হল,

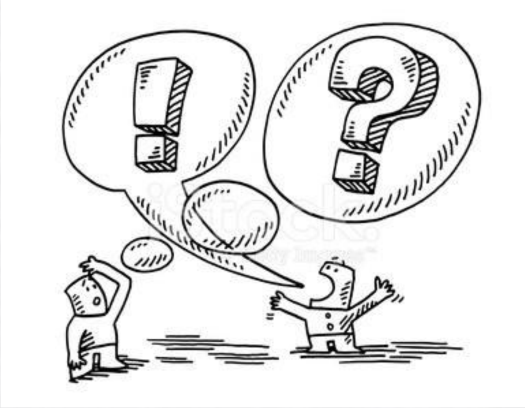
**“যে ব্যাক্তি কোন বিষয়ে কোন পজিটিভ ক্লেইম করবে তার স্বপক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করার দায় শুধুই তার”**

যেমন, কেউ যদি দাবি করে তার বাসায় একটা হরিণ আছে, এটা অন্যকে বিশ্বাস করাতে চাইলে তাকেই প্রমাণ করে দিতে হবে যে হরিণটা আসলেই তার বাসায় আছে। অনেক ভাবেই প্রমাণ করা সম্ভব। তার মধ্যে কোন না ভাবে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ তাকে করতেই হবে। না হলে তার কথাটা বিশ্বাস না করার দায় অন্যকে দিতে পারবে না। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা সহজ, সে মানুষ জনকে বাসায় নিয়ে

হরিণটা দেখাইলেই হবে। আবার অন্যান্ন বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বশরীরে না নিয়ে গিয়েও প্রমাণ করতে পারে।

সমস্যা আরেকটু জটিল হবে যখন কেউ দাবি করবে যে তার বাসায় একটা হরিণ আছে যেটা শুধু রাতের বেলা হেঁটে হেঁটে বাসায় হাজির হয়। সে নিজে দেখে কিন্তু অন্য কাউকে দেখাতে গেলে পালিয়ে যায়, কোনভাবেই সে হরিণটাকে প্রমাণ করতে পারছে না। কিন্তু সে সত্যি সত্যিই প্রতিদিন তাকে দেখে। তখন তার কথা অন্যদের বিশ্বাস করা উচিত, নাকি উচিত না? হয়ত লোকটা বাকি সব বিষয়ে সত্যবাদী, সুতরাং এই একটা বিষয়ে মিথ্যা বলেব কেন? আবার এমন ও হতে পারে এইই লোকটা সত্যবাদী হলেও সে এইএকটা বিষয়ে কোন কারণে মিথ্যা বলছে। তাই ভেবে তাকে মিথ্যাবাদী ভেবে নেওয়াই বা কেমন হয়ে যাচ্ছে। আমাদের কাছে তো আর এমন কোন প্রমাণ তো নেই যে, মধ্য রাতে তার বাসায় হরিণটা সত্যিই আসে না। আসতেও তো পারে। বিশেষ করে তার বাসা বন জঙ্গলের কাছে হলে তো হরিণ আসা অসম্ভব কিছু না।

তাহলে আমাদের করনীয় কী? একজন যুক্তিবাদী মানুষ



এক্ষেত্রে কি করবে? একজন বিজ্ঞানী কি করবে? একজন সুশিক্ষিত মানুষ এখানে কি করবে? উত্তর হচ্ছে, তাকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনটাই করবে না। তারা তাদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখবে।

এ আবার কেমন কথা! আমরা কি তাইলে এরকম হাজারো দাবীর বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবো? উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ। এরকম সিদ্ধান্তহীনতায় থাকা, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝে থাকাটাই হচ্ছে আসল শিক্ষা।

আমরা আমাদের জগত সম্পর্কে খুব অল্প কিছু কিছুই জানি, বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তর জানি না।

কেউ যদি জিজ্ঞ্যেস করে, আসলে কি এলিয়েন আছে, ভূত আছে, মারমাইড আছে, সান্টা ক্লজ আছে, ড্রাকুলা আছে, আমাদের উত্তর হবে জানা নাই। কিন্তু কেউ যদি দাবি করে এর কোন একটা আছে, তখন তাকেই চেপে ধরতে হবে, মামা এই বার তো Burden of proof তোমার ঘাড়ে এসে পড়ল। প্রমান করে দেখাও দেখি? আমরাও ব্যাপারটা বুঝে নেই। তার পাল্টা উত্তর এটা দিলে চলবে না যে, তুমি বা তোমাদের বিজ্ঞান কি প্রমাণ করে দিয়েছে যে ভূত নেই, মারমেইড, সান্টাক্লোজ বা ড্রাকুলা নেই? তার এ কথাই প্রমাণ করে যে সে প্রমাণ করা করার প্রসেসটাই বোঝে না। অর্থাৎ Burden of proof কনসেপ্টটা বোঝে না। সে আমাদের দেশের বেশাইরভাগ মানুষের মতই সাধারণ একজন। অথচ এরকম অসংখ্য দাবি নিয়েই আমাদের মানব জীবনে বসবাস।

এই যেমন ঔষধ জগতে, কেউ বলে খেজুর খেলে রোগ ঠিক হয়, কেউ বলে গোমূত্র। কেউ বলে তুলসী, কেউ বলে জলপাই, কেউ বলে কুয়ার পানি, কেউ বলে নদীর জল।

কেউ বলে ঝাড় ফুক, কেউ বলে তন্ত্র মন্ত্র। কেউ হোমিও কেউ এলো। কত ছাল বাকল, কত শিকড় বাকড়, কত পাতা, কত বিচি, লক্ষ কোটি গাছ পালা, পোকা মাকড়, কে জানে কার মধ্যে কী উপকার বা অপকার আছে, তাই না? এই সব ক্ষেত্রে উত্তর হবে, আমরা জানি না। যে দাবি করবে তাকেই চেপে ধরতে হবে, বলতে হবে ব্রাদার proof টা দেখাও না please.

আমরা যতক্ষণ এই লেখাটি পড়ছি ঠিক তখন বিশেষ ধরনের কিছু মানুষ (লাখ লাখ তো হবেই) ঠিক এই মুহুর্তে নিবিষ্ট মনে খুঁজে বেড়াচ্ছে এসবের মধ্যে আসলেই কোনটা কতটা উপকারী বা কোনটা ক্ষতিকর। কেউ খুঁজে পেলেই মহা উতসাহে অন্যদের জানাচ্ছে, তার মধ্যে বেশির ভাগ প্রাপ্তিই অন্যরা পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে কোন না কোন ত্রুটি খুঁজে পাচ্ছে। তারা সবাই মিলে পরেরদিন থেকে আরও সতর্ক হয়ে খুঁজছে। মোটামুটি ভাল কিছু পাওয়া মাত্র সেটা নানা পেপার বা জার্নালে লিখে ফেলে কোটি মানুষের সামনে সেটার বিচারের ভার তুলে দিচ্ছে। তাদের প্রতিদিন এর প্রাপ্তির যোগফলকেই আমরা বিজ্ঞান বলি, এঁর ওই বিশেষ মানুষগুলোকে আমরা বিজ্ঞানী বলি।

এই বিজ্ঞানীরা আবার অন্য সাধারণ মানুষদের মত, গোষ্ঠীকেন্দ্রিক না। তারা নিজেদের গোত্রের একে অন্যকে তেল মেরে বা মুখ রক্ষা করে চলে না। তাদের কোন নেতা নাই, তারা কারো ভক্ত না। বরং তারা সারাক্ষণ একে

অপরের ভুল ধরার চেষ্টায় থাকে, ভুল ধরে, ভুল শুধরে ঔষধটার নতুন আপডেট বা রিপ্লেসমেন্ট বের করে। তাদের সম্মিলিত এই সব কর্মকান্ডে  বিজ্ঞান প্রতিদিন আগের দিনের চেয়ে একটু বদলে যায়, আরেকটু উন্নত হয়। ঠিক যেভাবে আমাদের হ্যাতের মোবাইল গুলো আপডেট হয়।

এই যে পজিটিভ ক্লেইম এর নিজ Burden বুঝে দ্বায়িত্বে নিজ কাঁধে তুলে নেওয়ার ইচ্ছা, প্রমাণ খুঁজে বের করার চেষ্টা, অন্যদের প্রমাণে সন্দেহ করা, ভুল খেজে বেরার করার চেষ্টা এবং দিন শেষে খানিকটা আপডেট হওয়া, "জ্বী এটাই সায়েন্স"।

এটা সত্যি কথা যে এই প্রক্রিয়া খুব স্লো। এর চেয়ে কোন একটা কিছু বিশ্বাস করে নেওয়া অনেক স্বস্তির। এত চিন্তা করলে জীবন অতীষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া এই বিজ্ঞান প্রক্রিয়ায় আমাদের জীবদ্দশায় আমাদের মনে মধ্যে লুকিয়ে থাকা লক্ষ কোটি প্রশ্নের মধ্যে খুব কম প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। হয়ত কিছু প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান কোনদিনই দিতে পারবে না। কিন্তু সত্য কথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। আমোদের বলতে হবে ‘আমাদের জানা নাই’।

আমাদের জানা নাই বলার মধ্যে কোন মূর্খতা বা অজ্ঞতা নাই, কোন চতুরতা বা মিথ্যা নাই। কোন ভ্রান্তি বিলাস বা মানসিক প্রশান্তি নাই। তবে সততা আছে। নির্ভেজাল সততা আছে।

আমাদের জানা নাই বলাটা আমাদের ইশকুল, মাদ্রাসা, ও নানা বইয়ের পাতায় পাতায় লিখে লিখে পরবর্তী প্রজন্মের মগজে ঢোকাতে হবে। তাইলে তারা আরও জানতে চাইতে, শিখতে চাইবে। মুখস্ত বাদ দিয়ে খুঁজে বের করতে চাইবে। প্রতিটা পজিটিভ ক্লেইমকে চ্যালেঞ্জ করে Burden of proof কনসেপ্ট টা দেশের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেবে। তখন, পীর, ফকির, তান্ত্রিক, ওঝা, কবিরাজ, হোমিও যে যাই বলুক তাকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের লটারিতে না ফেলে, নিজেরা সারা জীবন দোটানায় না থেকে Burden of proof এর নিয়ম মেনে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

"what may be asserted without evidence, may be dismissed without evidence." Carl Sagan

> “বিজ্ঞানের দায় পড়েনি ধর্মগ্রন্থ থেকে দীক্ষা নিয়ে আলোর সন্ধান লাভ করতে, বরং ধর্মগুলোই জেনে গেছে, বিজ্ঞান ছাড়া তারা টিকে থাকতে পারবে না।”
>
> \- অভিজিৎ রায়

# পেরিয়ার রামাস্বামী – বিরল এক ব্যক্তিত্ব

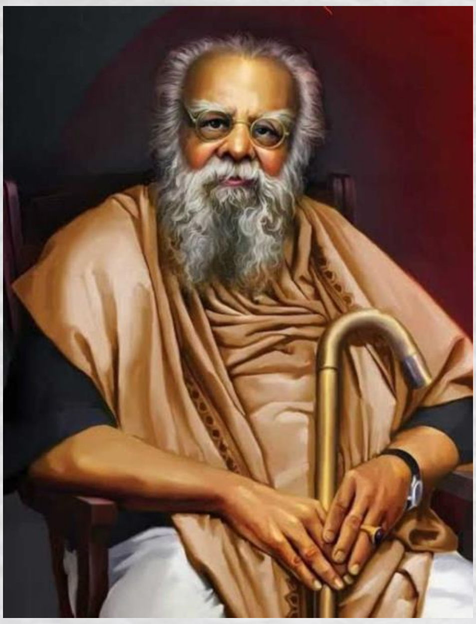
- কিনোক্ষ্যাপা

সাল ২০২২, তারিখ – ১৭-ই সেপ্টেম্বর, স্থান – কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এক টেকনোলজি ইন্সটিটিউট, যা আবার An Institute of National Importance-এর তালিকাভুক্তও বটে, সময় – সকাল ১০-টা। শুরু হয়ে গেল কাঁসর-ঘন্টার শব্দ আর সংস্কৃত মন্ত্র সহযোগে বিশ্বকর্মা পুজো। একেবারে হৈহৈ ব্যাপার। সাথে হিন্দুত্ববাদীদের আস্ফালন তো আছেই। কিন্তু মন শান্ত করে ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখলাম এ-তো নতুন কিছুই নয়। এই সাংস্কৃতিক আবহেই তো আমরা – উচ্চবর্ণের হিন্দুরা – বড় হয়ে উঠেছি। আজ 'হিন্দু রাষ্ট্র' নিয়ে আমরা অনেকে বহু আপত্তি প্রকাশ করছি বটে, কিন্তু তিল তিল করে এই হিন্দু রাষ্ট্র গড়ে তোলার কাজে আমরা, আমাদের পূর্বপুরুষরাই তো ইন্ধন জুগিয়েছি। সত্যিটা তো এটাই যে এই 'হিন্দু রাষ্ট্র'-র বীজটা সেদিনই সংবিধানের মধ্যে পোঁতা হয়ে গিয়েছিল যেদিন স্বয়ং নেহরু-র নেতৃত্বে পরিচালিত উপদেষ্টা কমিটি সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তটা প্রত্যাখ্যান করেছিল, এবং উল্টে সকল ধর্মকে সমান হিসাবে বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। Secular

শব্দটা ভারতে সেদিনই ‘Sickular’ হয়ে গিয়েছে। যে গণতান্ত্রিক রাজনীতি স্বাধীনতার পরে জন্ম নিয়েছিল তাতে যে ভারত রাষ্ট্র বাস্তবে উচ্চবর্ণের হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর ইচ্ছার কাছে, তাঁদের ধর্মের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হবে সেদিন একথা উপলব্ধি করা হয়নি, বা হয়তো জেনেবুঝেই সবটা করা হয়েছে। স্কুলে-কলেজে পুজো-অর্চনা সেই ঐতিহ্যই বহন করে চলেছে। সেই ঐতিহ্যের হাত ধরেই ১৭-ই সেপ্টেম্বর তারিখটা ভারতীয় সংস্কৃতি (পড়ুন হিন্দু সংস্কৃতি) অনুযায়ী বিশ্বকর্মা পুজো হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে, পেরিয়ার ই. ভি. রামাস্বামী-র (১৮৭৯-১৯৭৩) জন্মদিন হিসাবে উদ্‌যাপিত হয় না। তবে এখনও আমরা এই ভেবে নিজেদের সৌভাগ্যবান বলে মনে করতে পারি যে এই দিনটা বর্তমান ভারতে বিশ্বকর্মা-র অবতার, ‘Make in India’-র জনক, নরেন্দ্র মোদী-র জন্মদিন হিসাবে তো আর পালন হচ্ছে না! অবশ্য আগামী প্রজন্ম এতটা সৌভাগ্যবান না-ও হতে পারে। তাই তাদের সম্ভাব্য দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বাঁচাতে আসুন পেরিয়ার রামাস্বামী-কে নিয়ে একটু সংক্ষেপে চর্চা করা যাক।

এক ধনী ব্যবসায়ী পরিবারে ১৮৭৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন পেরিয়ার রামাস্বামী। দশ বছর বয়সেই প্রথাগত স্কুলশিক্ষা পরিত্যাগ, তরুণ বয়সে স্বল্পকালের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ, শীঘ্রই ধর্মীয় রীতিনীতি থেকে বিশ্বাস হারিয়ে কংগ্রেসে যোগদান মারফৎ সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ, সেখানেও মোহভঙ্গ ও

শেষে কংগ্রেসের সাথেও বিচ্ছেদ, তারপর আজীবন সমস্ত রকম নিপীড়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা – যেন স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটার জন্যই তিনি জন্মেছিলেন। ১৯২৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের সাথে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে, যখন ব্যাঙ্গালোর-এ গান্ধী-র সাথে সাক্ষাৎকারের পর তিনি বুঝতে পারেন যে গান্ধী নিজেই অন্তর থেকে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রতি ভীষণভাবে বিশ্বাসী। যদিও ইতিমধ্যে ১৯২৫ সাল থেকেই তিনি শুরু করে দিয়েছিলেন “আত্মসম্মান আন্দোলন” [Self-Respect Movement], যে আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল একদিকে জাতিভেদ আর তার রক্ষক ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে এবং অন্যদিকে নারীদের দমিয়ে রাখার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রচার চালানো ও পদক্ষেপ নেওয়া। সমকালীন জাতীয়তাবাদীরা যেমন ‘স্বরাজ’-কে একটা জন্মগত অধিকার হিসাবে দেখেছিলেন, তেমন পেরিয়ার-এর কাছে সেই জন্মগত অধিকারটা ছিল ‘আত্মসম্মান’। ‘এক মানুষ এক ভোট’-এর রাজনৈতিক গণতন্ত্র যদি ‘এক মানুষ এক মূল্য’-র ভাবনাটাকেই না সুনিশ্চিত করতে পারে তাহলে সেই গণতন্ত্র যে কখনই ভারতের নারী ও পুরুষের স্বাধীনতা, সৌভ্রাতৃত্ব আর সাম্যকে সুনিশ্চিত করতে পারবে না সেই কথাটা পেরিয়ার এবং তাঁর-মত জাতিব্যবস্থা-বিরোধীরা



গোড়াতেই উপলব্ধি করেছিলেন। পেরিয়ার মনে করতেন ভারতীয় জনজীবনের প্রতিটা দিকই বেদ, স্মৃতি, শাস্ত্র ও পুরাণ মারফৎ পরিপুষ্ট মনুর নিয়ম এবং বর্ণাশ্রমধর্ম দ্বারা পরিচালিত, যা মতাদর্শগতভাবেই 'এক মানুষ এক মূল্য' – এই চিন্তাভাবনার পরিপন্থী।

**ব্রাহ্মণ্যবাদ, বর্ণাশ্রমধর্ম, এবং হিন্দুধর্মকেই জাতিব্যবস্থার মূল মতাদর্শ হিসাবে, এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও অ-ব্রাহ্মণ শূদ্রদের মুক্তিকে জাতিব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য অপরিহার্য হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন পেরিয়ার।**

যাঁরা অস্পৃশ্য তাঁরা প্রথমে ও সর্বাগ্রে মেহনতী জনগণ। এই মেহনতী জনগণকে দাসত্ব এবং ভয় থেকে মুক্ত না করলে ভারতীয়দের স্বাধীনতা আর আত্ম-নির্ভরতার সমস্ত কথাবার্তাই আসলে ফাঁকা আওয়াজ। 'আত্ম-নির্ভর' ভারতে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে যতোই 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসভ' উদ্‌যাপন চলুক না কেন, এই বাস্তব সত্য আজও আমরা উপলব্ধি করতে পারি।

ধর্মের প্রতি, বিশেষ করে হিন্দুধর্মের প্রতি পেরিয়ার-এর সমালোচনার তীব্রতা ছিল মারাত্মক। জনগণ কি খাবে, কিভাবে পোশাক পড়বে, কাদের বিয়ে করবে, পেশা নির্বাচন, পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রকাশ্য ব্যবহার, রাজনৈতিক

পছন্দ, আরাধনার উপায় – সংক্ষেপে, হিন্দুদের প্রতিটা কাজেই একটা ধর্মীয় সংবেদনশীলতা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, আর এই কর্তৃত্ববাদের দূর্গেই কামান দেগেছিলেন তিনি। তাঁর কথায় জাতিভিত্তিক সমাজ গঠনের মূল ভিত্তিই ছিল এই ধর্ম। একইভাবে সতীত্ব বজায় রাখা, সন্তানের জন্মদানে সক্ষমতা প্রমাণ করা ইত্যাদি ব্যাপারে নারীদের উপর চাপ সৃষ্টি করার চিরাচরিত ধর্ম-কেন্দ্রিক ধারণাগুলোকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি কখনও ভাবেননি যে পুরুষের শরীর নারীর শরীরের থেকে আলাদা বলে পুরুষ আর নারী বৈশিষ্ট্য আর মেজাজের নিরীখে আলাদা। এছাড়া, নারীরা যাতে সৌন্দর্য্যের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁরা যাতে নিছক গয়না ঝুলিয়ে রাখার খুঁটিতে পরিণত না হয়ে যান সেই আহ্বানও জানিয়েছিলেন তিনি। পেরিয়ার-এর কাছে বিয়ের সম্পর্ক ছিল ব্রাক্ষ্মণ্যবাদী মূল্যবোধের একটা ব্যবস্থা। তাঁর কথায় – "যেমনভাবে ব্রাক্ষ্মণ্যবাদ মেহনতী জনগণের একটা বিরাট অংশকে শূদ্র হিসাবে নিন্দা করেছে, ঠিক তেমনভাবে এই মতাদর্শ নারীদেরও বিবাহের দাসত্ব স্বীকার করতে বাধ্য করেছে। .. একজন নারী যতই সতীসাবিত্রী ও আদর্শ স্ত্রী-এর আদবকায়দা মেনে থাকবে ততই সে নিজের দাসত্বকে স্ফূর্তির সাথে মেনে নেবে।"

ব্রাক্ষ্মণ-পারাইয়া, পুরুষ-নারী, ও ধনী-গরীবদের মধ্যেকার বিভেদ, যেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীগুলো প্রথম শ্রেণী দ্বারা

নিপীড়িত – সমাজের এই তিনটে বিভেদকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে একটা সমানতার আদর্শ ‘সমধর্ম’-র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পেরিয়ার ও তাঁর আত্মসম্মান আন্দোলনের সহকর্মীরা। চাকরিক্ষেত্রে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনুপাতিক ভিত্তিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব; বিভিন্ন জায়গা, পবিত্র স্থান, সম্পত্তি, চাকরি ইত্যাদির উপর সাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা; আত্মসম্মান আন্দোলনের সদস্যদের বিবাহের ক্ষেত্রে আইনি বৈধতা নিশ্চিত করা; জাতি বা ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে মন্দিরে পুরোহিত নিয়োগের মতো কাজকে সম্ভব করা ইত্যাদিকে ‘সমধর্ম’ আদর্শের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল। তাঁর নিজের ভাষায় – “সকল জাতির উচিত শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা ও সংস্কৃতিতে উন্নতি করা, এবং একে অন্যের সাথে সমতা অর্জন করা। … সকল জাতির উচিত সরকারী পদগুলোকে সমান ভাগে অর্জন করা … সকল জাতির উচিত একে অন্যের কাছাকাছি আসা এবং সংস্কৃতির একটা সাধারণ স্তর, একটা সাধারণ শিক্ষাগত মর্যাদা অর্জন করা, একটা সাধারণ নৈতিকতার অভিজ্ঞতা লাভ করা।” জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারত রাষ্ট্র যখন ‘secularism’ শব্দটার অর্থ ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ থেকে ‘সব ধর্ম সমান’-এ পরিবর্তিত করে সেই মুখোশের আড়ালে একটা নির্দ্দিষ্ট ধর্মের (ব্রাক্ষ্মণ্য ধর্ম) পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে, তখন পেরিয়ার-এর এই

‘সমধর্ম’-র আদর্শকে চর্চা করাটা নিঃসন্দেহে সময়ের একটা দাবি।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থারও কঠোর সমালোচনা করেছিলেন পেরিয়ার। তাঁর কাছে শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ধর্ম, শাস্ত্র ইত্যাদির উপর অন্ধ-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ চিন্তাভাবনার পরিবেশ গড়ে তোলা এবং তার সাথে পড়ুয়াদের নিজ বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী সচেতনভাবে ও স্বেচ্ছাকৃতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি করা। তাঁর মতে জনগণ ও দেশের জন্য পড়ুয়াদের মনে আত্মসম্মান, দৃঢ়তা, সাম্য, প্রেম ইত্যাদি বোধগুলোর সঞ্চার ঘটানোই শিক্ষকদের প্রধান কাজ হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাশ করা পড়ুয়ারা স্কুলে না যাওয়া অশিক্ষিত জনগণের থেকে যেকোনো দিক থেকে অনেক ভালো – এই ধারণাটা পেরিয়ার কোনওদিনও গ্রহণ করেননি। তাঁর কথায় – “যেমন একজন ধোপা ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় জানেন না, ঠিক তেমনই বি.এ. ডিগ্রীধারীরাও জানেন না যে কিভাবে ধোপাদের মতো কাপড় কাচতে হয়; একজন মুচি যেমন ব্যাকরণ এবং সাহিত্য জানেন না, ঠিক তেমনই বিদ্বান এবং শাস্ত্রজ্ঞরা জানেন না যে কিভাবে পায়ের জুতো তৈরী করতে হয়... সুতরাং, যাঁরা বি.এ. ডিগ্রী অর্জন করেছেন সেই বিদ্বান আর শাস্ত্রজ্ঞরা কোনওভাবেই ধোপা, নাপিত আর মুচি বা জাগতিক বিষয়ে আরও প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের থেকে বেশী শ্রেষ্ঠ নন। শিক্ষিত ব্যক্তিরা যেটা শিখেছেন সেটা হল একটা

নির্দ্দিষ্ট দক্ষতার কোনও একটা কৌশল, কোনও জ্ঞান নয়। এই শিক্ষিতরা বোকা হতে পারেন, স্বার্থপর হতে পারেন, তাঁদের আত্মসম্মান বোধ নাও থাকতে পারে, কিন্তু আবার বিপরীতে স্কুলে না যাওয়া জনগণ উদার, বুদ্ধিমান, এবং আত্মসম্মান বোধ-সম্পন্ন হতে পারেন।" যে শিক্ষাব্যবস্থা নিছক মুখস্থ করে শেখার প্রবণতা তৈরী করে এবং পড়ুয়াদের মধ্যে অনুসন্ধানের মানসিকতা, শিক্ষকদের প্রশ্ন করার সংস্কৃতি তৈরী করেনা, সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে ঘৃণা করতেন পেরিয়ার। এই ধরণের শিক্ষাব্যবস্থা যুব সম্প্রদায়ের মনের মধ্যে পারস্পরিক ভালো ব্যবহার এবং নৈতিকতা বোধের জন্ম দিতে পারে না।

পেরিয়ার কে ছিলেন? এক কথায় এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন – "একটা আকারে বড় দেশ যদি একটা অপেক্ষাকৃত ছোটো দেশের উপর নিপীড়ন চালায়, তাহলে সেই ছোটো দেশটার পাশে দাঁড়াবো। সেই ছোটো দেশটায় সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্ম যদি সংখ্যালঘুদের ধর্মের উপর নিপীড়ন চালায় তাহলে আমি সেই সংখ্যালঘু ধর্মের পাশে দাঁড়াবো। যদি সেই সংখ্যালঘু ধর্মে জাতপাতের বিভেদ থাকে এবং একটা জাতি যদি আরেকটা জাতির উপর নিপীড়ন চালায় তাহলে আমি নিপীড়িত জাতিটার পাশে দাঁড়াবো। সেই নিপীড়িত জতির কোনো একজন মালিক যদি তাঁর কোনো কর্মীকে নিপীড়ন করেন তাহলে আমি সেই নিপীড়িত কর্মীর পাশে দাঁড়াবো।

সেই নিপীড়িত কর্মী যদি বাড়ি ফিরে তাঁর স্ত্রী-কে নিপীড়ন করেন তাহলে আমি সেই নিপীড়িত মহিলার পাশে দাঁড়াবো। সামগ্রিকভাবে নিপীড়ন হলো আমার শত্রু।”

**তাই, একটা আদ্যন্ত নিপীড়নমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে এহেন একজন ব্যক্তির অস্তিত্ব, তাঁর আদর্শ ইত্যাদিকে ভুলিয়ে দিয়ে চাইবে সেকথা বলাই বাহুল্য।**

তাই আসুন, রাষ্ট্রের সেই চক্রান্তকে ব্যহত করে দেওয়া যাক, অন্ততপক্ষে প্রতি বছর ১৭-ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁকে স্মরণ করার মধ্যে দিয়ে, এছাড়াও বছরের অন্য যেকোনো সময়ে সুযোগ পেলেই, বা সুযোগ না পেলে সুযোগ তৈরি করে নিয়ে পেরিয়ার রামাস্বামী ও তাঁর কাজকর্মকে নিয়ে আরও বেশী করে চর্চার মাধ্যমে।

# অঙ্গদান ও মামা-ভাগ্নে বিসংবাদ

-নাফিস সাদিক শাতিল

ভাগ্নে বললো, "মামা চলো মরণোত্তর দেহ দানের ব্যাপারে কথাবার্তা ফাইনাল করে ফেলি।" আমি আতংকিত হয়ে বললাম, "এসব কি বলিস? এই শরীর, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মালিক কি তুই? যে চাইলেই দান করে দিবি?" ভাগ্নে পাল্টা প্রশ্ন করলো, "আমার শরীর, আমার অঙ্গের মালিক আমি নই? তাহলে কে?"

"কে আবার? যিনি তোকে সৃষ্টি করেছেন সেই মহান স্রষ্টা। তিনি তোকে সৃষ্টি করে তোর বডিটা তোকে কিছুদিনের জন্য ব্যবহার করতে দিয়েছেন। তাই তোর শরীরের কোন পরিবর্তন পরিবর্ধন করা ঠিক না। তুই ইচ্ছা করলেই তোর কোন অঙ্গ দান করে দিতে পারিস না। এই অধিকার তোকে দেয়া হয়নাই।"

"ও আচ্ছা। তাহলে এই একই লজিকে কোন ধরণের অপারেশনও তো করা যাবেনা। ধরো কারো এপেন্ডিক্স অপসারণের প্রয়োজন পড়লো, তাহলে সে কি করবে? অথবা কারো একটা দাঁত তোলার প্রয়োজন পড়লো, তাহলে সে কি করবে? এসব করলে তো দেহের পরিবর্তন হয়ে যাবে।" ভাগ্নে বললো।

"তুই আসলে বেশি বুঝিস। রোগব্যাধির বিষয়টা আলাদা। আর স্বেচ্ছায় দান করার বিষয়টা আলাদা। তোদের নাস্তিকদের মাথায় আসলে কিচ্ছু নাই। আসল ব্যাপার হলো মানুষকে তার ভাগ্যলিপি অনুসারে বানানো হয়েছে। যার ভাগ্যে কোন নির্দিষ্ট অর্গান ফেইলিওর লেখা আছে, সে কেন আরেকজনের অর্গান নিয়ে বেঁচে থাকবে? ভাগ্যলিপিকে পরিবর্তনের চেষ্টা করাটা অন্যায়।" আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম।

"সেই একই যুক্তিতে তো আমাদের সকল ওষুধ পত্র, এন্টিবায়োটিক, ভ্যাক্সিন, অপারেশন, ট্রিটমেন্ট সবই বয়কট করে দিতে হবে। কারণ যার ভাগ্যে রোগব্যাধিতে মৃত্যু লেখা আছে তার তো কোন অধিকার নেই ভ্যাক্সিন, এন্টিবায়োটিক গ্রহণ করে মৃত্যুকে বিলম্বিত করার।" ভাগ্নে পাল্টা উত্তর দিলো।

"আসলে তোদের মত স্বল্পবুদ্ধির গ*বেটরা কিছুই বুঝতে চাস না। তোর যদি মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস থাকতো, তাহলে এই চিন্তা কখনোই মাথায় আসতো না। মৃত্যুর পর আমাদের আবার জীবন্ত করা হবে। তোর বডি দান করে দিলে তুই কি নিয়ে দাড়াবি?"

"মামা, দাড়াতে গেলে গ্র্যাভিটি লাগে। তুমি কি শিওর সেখানে মহাকর্ষ কাজ করবে? তাছাড়া সেসময় কিডনি লিভার পাকস্থলি হার্ট লাংস এগুলোর কাজই বা কি হবে?

এগুলো দান করে দিলে সমস্যা কি? শুনেছি সেখানে মানুষের ক্ষুধা লাগবেনা, হাগু লাগবে না। তাহলে পরিপাকতন্ত্রের কাজ কি? সেখানে কি বায়ুমন্ডল থাকবে? বায়ুমন্ডলে কি অক্সিজেন থাকবে? না থাকলে লাংসের কাজ কি? তখনও কি বেঁচে থাকতে অক্সিজেনের উপর ভরসা করা লাগবে? তখনো কি শ্বেত রক্তকণিকা রোগ প্রতিরোধ করবে? হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন পরিবহণ করে নিয়ে যাবে কোষে কোষে? তখনও কি অনুচক্রিকা রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করবে? এগুলোর কাজ কি সে সময়?"

এই টাইপের মূর্খের সাথে তর্কের কোন মানেই হয়না ভেবে আমি আর কোন কথা না বলেই উঠে চলে যাচ্ছিলাম। পেছন থেকে ভাগ্নে বললো, “মামা, আত্মঘাতী বো মা মারতে গিয়ে যাদের বিশেষ অঙ্গ উড়ে যায়, তারা কী নিয়ে দাঁড়াবে?”

> “পৃথিবীতে যতদিন অন্তত একজনও প্রথাবিরোধী মানুষ থাকবে, ততোদিন পৃথিবী মানুষের।”
>
> - হুমায়ুন আজাদ

# প্রার্থনা বা যাগযজ্ঞে কি ফললাভ হয়?

-চিত্রদীপ সোম

প্রার্থনা বা যাগযজ্ঞ জাতীয় জিনিসগুলি বিশ্বজুড়ে প্রচলিত সমস্ত উপাসনা ধর্মগুলিরই একটি অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। বলা যেতে পারে উপাসনা ধর্মগুলি টিকেই আছে যে সমস্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তার মধ্যে অন্যতম হলো এইসব প্রার্থনা। বিভিন্ন ধর্মের প্রার্থনা পদ্ধতি বিভিন্ন। অমিলও প্রচুর। তবে একটা বিষয়ে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী মানুষই একমত, ঠিকমত প্রার্থনা করলে ফললাভ অবশ্যম্ভাবী। হাতে গোনা কয়েকটি ধর্ম বাদ দিলে প্রায় সমস্ত ধর্মেই ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে যাকে প্রার্থনায় তুষ্ট করতে পারলে তিনি মানুষের কামনা পূরণ করেন। যাগযজ্ঞ, মানত করা, ইত্যাদি এরই রকমফের।

কিন্তু ধর্মীয় প্রার্থনায় কি আদৌ ফললাভ হয়? বিশ্বাসীরা বলবেন অবশ্যই হয়। অবিশ্বাসীরা বলবেন ‘সব ঝুট’। এইসব তর্কের মীমাংসা হওয়া দুঃসাধ্য। তাই তর্কে না গিয়ে খোলামনে একটু দেখে নেওয়া যাক প্রার্থনায় আদৌ ফললাভ হয় কিনা।

সুরেশবাবু ব্যাংকের কর্মী। প্রথম সন্তান মেয়ে হবার বছর দুই পরে আবার সন্তানসম্ভবা স্ত্রী মিনতিদেবী। সুরেশবাবুর

একান্ত ইচ্ছা এবার একটি ছেলের মুখ দেখার। পাড়ার এক বয়স্কা মহিলার পরামর্শ মতো এক 'জাগ্রত' কালীর থানে মানত করলেন সুরেশবাবু পুত্রসন্তানের জন্য। এর কয়েকমাস পরেই স্ত্রীর প্রসববেদনা উঠলো। মিনতিদেবীর কোল আলো করে এলো এক ফুটফুটে পুত্রসন্তান। মায়ের কৃপায় বিগলিত সুরেশবাবু সেই সপ্তাহেই ছুটলেন মানত পূর্ণ করতে।

মাঝবয়সী বিজনবাবু ইদানীং খুব গ্যাস অম্বলে ভুগছেন। ওষুধ খেয়েও বিশেষ কিছু কাজ হচ্ছে না। অফিসের দত্তদার পরামর্শ অনুযায়ী হুগলীর এক বিখ্যাত ঠাকুরের চরণামৃত পরপর তিনদিন সকালে খালিপেটে খেলেন বিজনবাবু। আর তারপরেই ম্যাজিক। গ্যাস অম্বল যেন মন্ত্রবলে অনেকটাই কমে গেলো! ঠাকুরের এহেন কৃপায় বিজনবাবু একটি ছবি বাঁধিয়ে রেখেছেন ঠাকুরঘরে।নিত্য এখন সেই ছবিতে ফুলমালা দেন তিনি।

প্রদীপ বছর ছাব্বিশের এক বেকার যুবক। অনেক চাকরির পরীক্ষায় বসেছে। কিন্তু বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। বাড়ির লোক অনেকবার বলেছে ভালো দেখে একটা পুজো দিতে ঠাকুরের কাছে। কিন্তু যুবক প্রদীপ রক্তের জোরে সে সবকে এতদিন উপহাসই করে এসেছে। অবশেষে একদিন বাড়ির পীড়াপীড়িতে ঠাকুরের কাছে পুজো দিয়ে বুক পকেটে প্রসাদি ফুল বেলপাতানিয়ে চাকরির পরীক্ষায় বসলো

প্রদীপ। আর এবারেই বাজিমাত! লিষ্ট বেরোতে দেখা গেলো জ্বলজ্বল করছে প্রদীপের নাম।

উপরের ঘটনাগুলির মতো ঘটনা অহরহ হয়ে চলেছে আমাদের চারপাশে। আর এগুলোকে হাতিয়ার করেই দৈব বিশ্বাসীরা প্রশ্ন তুলে দেন যুক্তিবাদীদের দিকে। প্রার্থনায় যদি ফললাভ নাই হবে তাহলে উপরের ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা কি? আছে এসবের কোনো উত্তর অবিশ্বাসী নাস্তিকদের কাছে?

বিষয়টিকে ভালোভাবে বুঝতে উপরের ঘটনাগুলির কাটাছেঁড়ায় আসা যাক এবার। কিভাবে পূরণ হয়েছিলো উপরের প্রার্থনাগুলি? আসলে প্রার্থনায় সেইসব চাহিদাই পূরণ হয় যেগুলো এমনিতেও পূরণ হওয়া সম্ভবপর ছিলো। মাঝখান থেকে নাম হয় প্রার্থনার।

**আপনি যদি উপরের দিকে একটা কয়েন ছুঁড়ে প্রার্থনা করেন হেড পড়ার তাহলে প্রার্থনায় ফল লাভের সম্ভাবনা ৫০%। প্রার্থনা না করলেও হেড পড়ার চান্স ছিলো ওই ৫০%-ই**

কিন্তু প্রার্থনা করায় নাম হয়েছে প্রার্থনার। কিন্তু আপনি যদি কয়েন ছুঁড়ে প্রার্থনা করেন হেড ও টেল উভয়ই একইসাথে পড়ার তাহলে আপনার প্রার্থনা পূরণ হবার সম্ভাবনা ০%, সে আপনি যতই ভক্তিভরে আপনার ঈশ্বরকে ডাকুন না

কেন। কারণ বাস্তবত হেড ও টেল একইসাথে পড়া সম্ভব নয়। একইভাবে আপনি যদি ভারত পাকিস্তান খেলার সময় আপনার ভগবানকে ডাকেন আপনার দেশকে জেতানোর জন্য, যাগযজ্ঞ করেন এই উদ্দেশ্যে, তাহলেও আপনার প্রার্থনা পূরণ হবার সম্ভাবনা ৫০%। কিন্তু আপনি যদি প্রার্থনা করেন দুটো দেশই জেতার তাহলে আপনার প্রার্থনা পূরণ হবার সম্ভাবনা ০%। কারণ দুটো দেশের একসাথে জেতা বাস্তবে সম্ভব নয়।

উপরের উদাহরণগুলিতেও তাই হয়েছে। সুরেশবাবু মানত না করলেও তার পুত্রসন্তান হতে পারত। মানত করায় নাম হয়েছে মানতের। বিজনবাবু একইসাথে চরণামৃতও খেয়েছেন আবার ওষুধও খেয়েছেন। রোগ সারায় নাম হয়েছে চরণামৃতের। শুধু বিজনবাবু নন, অধিকাংশ রোগীই এটা করেন। আধুনিক চিকিৎসা ও দৈব পদ্ধতি উভয়েরই সাহায্য গ্রহন করেন। রোগ সারলে নাম হয় দেবতার। আর না সারলে 'ডাক্তারের ব্যর্থতা'।

**আজ অবধি কোনো ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষকেই দেখিনি ঈশ্বরের ক্ষমতার উপর ভরসা করে চিকিৎসা না করিয়ে কেবল প্রার্থনা বা চরণামৃত বা মাদুলি তাবিজের ভরসায় পড়ে থাকতে। এটাই এদের ভন্ডামি।**

অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওষুধ না খেয়ে কেবল চরণামৃত খেয়েও রোগ সারতে পারে। বিজ্ঞানসম্মত কারণও

আছে তার। যে কোনো চিকিৎসক মাত্রেই জানেন আমাদের দেহের অনেক রোগই সারানো যায় কোনো ওষুধ ছাড়াই কেবল মনের বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে। যাকে placebo effect বলেন চিকিৎসকরা। আজকের আলোচনায় এনিয়ে বিস্তারিত কথা বলার অবকাশ নেই, পরে কোনোদিন সুযোগ হলে বলব। আপাতত শুধু এটুকু জেনে রাখুন কেবলমাত্র মনের বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েই গ্যাস, অম্বল, হাঁপানি, নানা স্থানে ব্যাথা ইত্যাদি নানাপ্রকার রোগেরনিরাময় বা প্রশমণ সম্ভব। বহুক্ষেত্রে সাইকো-সোম্যাটিক রোগ(মন জনিত দেহের রোগ) সারাতে প্ল্যাসিবো এফেক্টের ব্যবহারও করেন ডাক্তারবাবুরা। আসলে চরণামৃতের ঔষধিগুন নয়, এক্ষেত্রে চরণামৃতের প্রতি রোগীর বিশ্বাসই তাকে সুস্থ হতে সাহায্য করেছে। প্রদীপের ঘটনাটির ব্যাখ্যাও একই। ফুল বেলপাতা ছাড়াও প্রদীপের সফল হবার সম্ভাবনা ছিলোই। কিন্তু সফল হওয়ায় নাম হয়েছে ঠাকুরের কৃপার।

তাহলে কিভাবে 'মিথ্যা' প্রমান করা যাবে প্রার্থনার শক্তিকে? খুব সোজা। এমন কিছু প্রার্থনা করুন যেগুলো এমনিতেই সফল হবার সম্ভাবনা 'শূন্য'। তাহলেই দেখবেন ঈশ্বর আর সাড়া দিচ্ছেন না প্রার্থনায়। তা সে যত 'জাগ্রত' দেবতাই হোক। যেমন আপনি আপনার মনোমত যে কোনো দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করুন ভারত যেন আগামী অলিম্পিকে সবচেয়ে বেশী পদক লাভ করে। দেখবেন প্রার্থনায় আর কোনো ফল হচ্ছে না। ভারত পদকতালিকায়

পড়ে থাকছে সবার শেষেই। কিম্বা প্রার্থনা করুন ভারত যেন আগামী দশ বছরের মধ্যে ফুটবলে বিশ্বকাপ জেতে। দেখবেন কালী বা আল্লা বা গড কোনো ঈশ্বরই আর প্রার্থনা পূরণ করছেন না। কিম্বা প্রার্থনা করুন আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে যেন ভারত থেকে সমস্ত দারিদ্র, অনাহার ও বেকারীত্ব দূর হয়ে যায়। এবারও দেখবেন কোনো ঈশ্বরই আর সাড়া দিচ্ছেন না আপনার প্রার্থনায়। কারণ এই দাবীগুলো বাস্তবে মেটা সম্ভব নয়। ওই হেড আর টেল একসাথে পড়ার মতই। আর তাই এখানে প্রার্থনার শক্তিও 'ফেল' করে যায়। এটাই বাস্তব।

অর্থাৎ এই আলোচনা থেকে প্রমাণিত প্রার্থনায় ফলে কেবল সেইসব দাবীগুলোই যেগুলো এমনিতেও ফলার সম্ভাবনা ছিলো। প্রার্থনার ভূমিকা তাই বাস্তবে শুন্য।

এরপরও যদি কেউ প্রার্থনার শক্তিনিয়ে কুতর্ক করতে আসেন তাহলে তার কাছে উদাত্ত আহ্বান থাকবে প্রার্থনার সাহায্যে আগামী দশ বছরের মধ্যে ভারতকে ফুটবলে বিশ্বকাপ জেতানোর বা প্রার্থনার সাহায্যে পাঁচ বছরের মধ্যে দেশ থেকে সমস্ত দারিদ্র, অনাহার, বেকারত্ব দূর করতে পারার। যদি পারেন, তাহলে যে কোনো কট্টর নাস্তিকও মেনে নেবে ধর্মীয় প্রার্থনায় সত্যিই ফললাভ হয়। আর যদি না পারেন তাহলে মেনে নিন প্রার্থনা কেবল মনের শান্তি বিশেষ। বাস্তব কোনো ফলপ্রদান সম্ভব নয়। কোনো

ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ চাইলেই এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে নাস্তিকদের মুখে ঝামা ঘষে দিতে পারেন। খোলা আহ্বান রইলো সমস্ত ঈশ্বরবিশ্বাসী, প্রার্থনার শক্তিতে বিশ্বাসী মানুষদের কাছে।

> “আমাকে আক্রমণ করা সহজ। আমি ফারাবীর মতো পারভেজ আলমকে হত্যার হুমকি দেই না, থাবা বাবাকে কুপিয়ে রাস্তায় ফেলে রাখি না, হুমায়ুন আজাদকে মেরে রক্তাক্ত করি না, বুকে ওড়না না পরে মাথায় পরার জন্য কোন মেয়েকে শরিয়া মোতাবেক পাথর মারি না, বিমান নিয়ে টুইন টাওয়ারের উপর ঝাপিয়ে পড়ি না, মসজিদ-মন্দির ভাঙাভাঙি করি না। বরং কেউ বিপদে পড়লে সাহায্যই করি যতটুকু পারি। কোন মুক্তচিন্তার ব্লগার আক্রান্ত হলে তাকে দেশের বাইরে কিভাবে পাঠানো যায় তা চিন্তা করি, দেশের এবং বাইরের মানবতাবাদী সংগঠনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেই, এমনকি পাঠাগার গড়তে কারো সাহায্য লাগলে এগিয়েই যাই। আমি ‘সালাফি সেক্যুলার’ না হলে হবে কে! ফারাবী? নাকি আইসিস?"

— অভিজিৎ রায়

# কিছু তেতো সত্য

- সুদীপ্ত বিশ্বাস

আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে কেউ মুসলমান ছিল না। আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগে কেউ হিন্দু ছিল না। তার আগেও বহুকাল ধরে মানুষ ছিল। মানুষের সাথে মানুষের বিবাদ বা বিভেদ যেটুকু ছিল তা ছিল খাদ্য ও বাসস্থানের। এরপর এল কিছু সুবিধাবাদী চালাক মানুষ। তারাই ধর্ম সৃষ্টি করল। পুঁতে দিল বিভেদের বীজ। তারপর মানুষ মানুষের থেকে এভাবে আলাদা হয়ে গেল যে আজ এতযুগ পেরিয়ে এসেও, এই স্মার্ট ফোনের যুগেও মানুষ এক হতে পারেনি। বরং ধর্মের বিষগাছটি শাখা প্রশাখা বিস্তার করে মানুষের রক্ত মজ্জায় ঢুকে গেছে। মানুষ হয়ে পড়েছে ধর্মান্ধ। শিক্ষা মানুষের জ্ঞান চক্ষুর উন্মোচন ঘটায় কিন্তু ধর্মের অন্ধত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে না। মানুষের জীবন, রাজনীতি, চিন্তাভাবনা সব কিছুর মধ্যেই ঢুকে পড়ে মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে সেই অতীতকালে কিছু চালাক মানুষের তৈরি 'ধর্ম'।

মাত্র ১০০০০ বছর আগে কোনো ধর্মই ছিল না। ছিল না ধর্ম-ধর্ম করে মানুষের সাথে মানুষের বিভেদ। ধর্ম কোনো কাজেই আসে না, শুধু যুদ্ধ বাধায়, রক্ত ঝরায়,মানুষকে

মানুষের থেকে আলাদা করে দেয়। প্রতিটি ধর্মই সমান খারাপ। মানুষের সর্বনাশ করেছে, করছে এবং করবে এই ধর্ম। আজ এই করোনা সঙ্কটে কোন ধর্ম কোন কাজে লাগছে? শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে বিষয়টাকে আরও জটিল করে তুলছে। হ্যাঁ,পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষই ধার্মিক।বেশিরভাগ মানুষই বিশ্বাস করেন তাদের নিজের নিজের ধর্ম শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য সব ধর্ম অতি নিকৃষ্ট। কিন্তু তাতেও কিছুই এসে যায় না। বিশিষ্ট আমেরিকান শিক্ষাবিদ Booker T. Washington এর কথায় "A lie doesn't become truth, wrong doesn't become right, and evil doesn't become good, just because it's accepted by a majority." মেজরিটি সবসময় সঠিক কথা বলে না। বেশিরভাগ মানুষ অশিক্ষিত হলে তারা অশিক্ষিত মানুষকেই তাদের নেতা হিসাবে পছন্দ করবেন। যেটা আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের সবকটি দেশেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি।

পদবি/জাত/পৈতে থাকলে জাতের নামে বজ্জাতিও থাকবে। সংরক্ষণ উঠিয়ে দেব, আর আমি ব্রাহ্মণ, আমি শ্রেষ্ঠ, আমি উচ্চ,এইসব মিথ্যে ধারণা নিয়ে অন্যকে ছোট করব, তা হয় না। ঠিক এই কারণেই আজও সংরক্ষণ চলছে, চলবেও। পৈতে একগাছা সুতো মাত্র, ইচ্ছে হলে একজন অব্রাহ্মণও পৈতে পরবে, ইচ্ছে হলে একজন ব্রাহ্মণ সন্তান ফালতু সুতো মনে করে পৈতে পরবে না, এই

ধারণাতে যতদিন সমস্ত ব্রাহ্মণ বিশ্বাস না করবে, ততদিন সংরক্ষণ তুলে দেবার কথা তাদের মুখে মানায় না। পদবি থাকলে ওই পদবি ধরেই আবার কাউকে উঁচু কাউকে নিচু ভাবা হবে। আপনি সাহা, আপনাকে ব্যানার্জি ভুরু কুঁচকাবে, আপনিও মীনা/সরেন/মুন্ডাকে নীচু ভাবার সুযোগ পাবেন। এই রিলিজিয়াস শোভিনিজম থেকে মুক্তি পেতে পদবি হতে হবে ব্যক্তির ইচ্ছেমতো। যার যা খুশি, সে তাই পদবি নিক।অন্ধ ধারণা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। ধরা যাক আপনার পদবি 'সাহা'। এক্ষেত্রে আপনার নামটা 'সাহা' দিয়েই শেষ হবে, আপনার ছেলের নামের শেষে ওই সাহা'ই থাকবে, এই ধারণা থেকে বের হয়ে না আসতে পারলে সংরক্ষণ তুলে দেবার মত বড় কথা আপনার ভাবা মানায় কী? বরং পদবি থাকবে কিন্তু সংরক্ষণ থাকবে না, এটাই ১০০% আঁতেলের মত কথা।

পদবি রাখলেই তার হাত ধরে সংরক্ষণও থাকবে। পদবিটা বংশধারা অনুযায়ী হলেই সমস্যা। পদবি নামের পরে একটা শব্দ মাত্র। নাম হতেই পারে দুই বা তিন শব্দের বা সংখ্যারও। যেমন "রাতুল রাহুল" নাম নিতে পারেন কেউ, যেখানে তার বাবার নাম হয়তো ছিল রাজীব মীনা। যাতে করে আর পদবি ধরে মানুষের জাত চেনা না যায়। এমনটা একটা দুটো প্রজন্ম করতে পারলেই কেল্লাফতে। কে উঁচু জাত ছিল, কে ছিল নীচু জাত, তা চেনাই যাবে না আর।

**পদবি ছাড়াই দু অক্ষরে খুব সুন্দর সুন্দর নাম দেওয়া যেতে পারে, আর সেখানে নামকরণের স্বাধীনতা অনেক বেড়ে যায়। যেমন, কারো নাম হতে পারে ‘সুদীপ্ত সুন্দর’ বা ‘সুদীপ্ত আলোকবর্ষ’ অথবা ‘নক্ষত্রজাতক সুদীপ্ত’। সুদীপ্ত বিশ্বাস/সুদীপ্ত দাস/সুদীপ্ত ব্যানার্জি/সুদীপ্ত ঘোষের চেয়ে এগুলো অনেক অর্থবহ এবং সুন্দরও।**

পদবি বিহীন, জাতপাত মুক্ত, ধর্ম মুক্ত পৃথিবী আমরা ইচ্ছে করলেই তৈরি করতে পারি। Frederick Douglass সঠিকভাবেই বলেছেন “If there is no struggle, there is no progress.” আমরা কেউ কি স্ট্রাগল করেছি? সবাই তো হাত পা গুটিয়ে থেকে শুধু পাকা ফলটি খাবার জন্য বসে আছি। ভুলে গেছি, ‘মা ফলেষু কদাচন’ প্রবাদটিকে।

মহাপুরুষ/প্রফেট যাদের বলা হচ্ছে তারা কেউ-ই মহান নন। বেশিরভাগ অন্ধকার এরাই ছড়িয়েছেন। এদের মুখোশ খুলে দেওয়া দরকার। এরা আসলে ভণ্ড, অন্ধবিশ্বাসী। প্রফেটরা কুসংস্কারই ছড়িয়েছেন। বিভিন্নভাবে স্ববিরোধী

বক্তৃতা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন। তাদের আসল উদ্দেশ্য ধর্ম প্রচার, দলবাজি আর অন্ধ পুজো-আচ্চার প্রচার। ওদিকে মুখে আবার বড় বড় যুক্তিবাদী ডাইলগ। আসলে যুক্তির য-ও নেই তাদের জীবনে। এরা ভণ্ড। মহাপুরুষ কখনোই নন। বিজ্ঞানীরাই আসল মহাপুরুষ। বিজ্ঞানীদের জন্যই আমরা এত সুন্দর ভাবে বেঁচে আছি।

Voltaire বলেছেন, “Prejudice is an opinion without judgment.” কিন্তু মানুষ আসলে অন্ধকারের পূজারি। আলোর চেয়ে অন্ধকার তার চিরকালের প্রিয়। তাই চিরকাল বিজ্ঞানীর চেয়ে প্রফেট, পুরোহিত বা পাদ্রির মূল্য অনেক বেশি তার কাছে। মহাকাশ বিজ্ঞানের বইয়ের চেয়ে ধর্মগ্রন্থের মূল্য অনেক বেশি মানুষের কাছে। বিজ্ঞানের বই পায়ে ঠেলে ধর্মগ্রন্থ মাথায় করে রাখে সমস্ত মানবসমাজ। অনেকে আবার ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিজ্ঞান খুঁজে পান! বিজ্ঞানের কাজ হল আলো ছড়ানো আর ধর্মগ্রন্থের কাজ হল অন্ধ মানুষকে আরও অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখা। তাই ধর্মগ্রন্থ ও বিজ্ঞান একে অন্যের পরিপূরক নয়। আলোর সাথে অন্ধকারের যা সম্পর্ক এদের সাথেও সেই একই সম্পর্ক। বিজ্ঞান নতুনের পূজারি। নতুন উন্নত চিন্তাভাবনা এলেই পুরানো ধারণাকে বাতিল করে দেয় সে। ওদিকে ধর্মগ্রন্থের ব্যাপারটা পুরো উল্টো। যত পুরানো হয়, ততই তার মান্যতা বাড়ে। পুরানো বস্তাপচা ধর্মগ্রন্থের সাথে যদি বিজ্ঞানের কোনো ধারণার খুব সামান্য মিল পাওয়া যায়, তাহলে আর

কথাই নেই, সব মানুষ ধর্মগ্রন্থ মাথায় নিয়ে ধেই ধেই করে নাচতে শুরু করে দেয়। আলোর চেয়ে অন্ধকার মানুষের বড় প্রিয়। রবীন্দ্রনাথের ছিঁটেফোঁটা সম্মানও পাননা নোবেলজয়ী সি. ভি. রমন বা চন্দ্রশেখরেরা। অথচ তাদের আবিষ্কার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ, মেধার পরিচায়ক ও শ্রমসাধ্য।

আগুনে বিশ্বাস করে হাত দিলে হাত পোড়ে।আগুনকে অবিশ্বাস করে হাত দিলেও হাত পোড়ে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের সাথে আগুনের চরিত্র বদলায় না। সাঁতার না জেনে জলকে বিশ্বাস করে অথৈজলে নামলে ডুবে মরতে হয়। জলকে অবিশ্বাস করে অথৈজলে নামলেও ডুবে মরতে হয়। বিশ্বাস অবিশ্বাসের সাথে জলের চরিত্র বদলায় না।

**ঈশ্বরকে বিশ্বাস করলে তিনি খুবই খুশি হন। ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করলেই তিনি ক্ষেপে যান। বিশ্বাস অবিশ্বাসের সাথে ঈশ্বরের চরিত্র বদলায়। যার চরিত্র সামান্য বিশ্বাস অবিশ্বাসের সাথে বদলায়, তাকে কতটা বিশ্বাস করা যায়?**

ঈশ্বর নামক জুজুর ভয় থেকে মুক্ত হয়ে বিপদের সময় আত্মবিশ্বাসী হতে শেখার নাম প্রকৃত শিক্ষা। ধর্মগ্রন্থের চেয়ে বিজ্ঞানের বইগুলো অনেক বেশি মূল্যবান, এটা বুঝতে পারার নাম প্রকৃত শিক্ষা। সাদাকে সাদা কালোকে কালো বলার সাহস অর্জন করার নাম প্রকৃত শিক্ষা। মিথ্যে বললে আখের গুছিয়ে নেওয়া যাবে জেনেও, সত্যকে আঁকড়ে থাকার নাম প্রকৃত শিক্ষা। প্রচলিত কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসগুলোকে লাথি মেরে গুঁড়িয়ে ফেলে যুক্তিবাদী এবং আত্মবিশ্বাসী হতে শেখার নাম প্রকৃত শিক্ষা।

অসময়ে কাজে আসেনি কোনও মন্দির-মসজিদ-গীর্জা। এগুলোকে ভেঙে হাসপাতাল করা যায় না?

শুধু ডেভলপমেন্ট নয়, সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট আমাদের দরকার। শুধু মানুষকে নয়, গাছপালা, পশুপাখি সব্বাইকে ভালোবেসে বাঁচো এবং বাঁচতে দাও। বিশিষ্ট ভিক্টোরিয়ান কবি Matthew Arnold সঠিকভাবেই বলেছেন, “The free thinking of one age is the common sense of the next.” আমাদের আজকের এই মুক্ত চিন্তার কথাগুলো আগামী প্রজন্মের কাছে অতি সাধারণ বলেই একদিন মনে হবে। কুসংস্কার ও অন্ধকারের গভীর থেকে তারা একদিন ঠিক আলোর দিশা খুঁজে পাবে।

Sudipta Biswas, (WBCS Exe.)
Nokari Uttar Para, Ranaghat

# আপনি কি মুক্তবুদ্ধির চর্চা করতে চান?

-প্রিন্স ফার্দিনান্দ

ওকে ফাইন, হে নবীন পথিক। মুক্তচিন্তার জগতে আপনাকে স্বাগতম। শুরুতেই বলে নিচ্ছি মুক্তবুদ্ধির চর্চা করতে হলে অর্থাৎ মুক্তচিন্তক বা মুক্তমনা হতে হলে আপনাকে অবশ্যই সিস্টেমের বাহিরে গিয়ে চিন্তা করতে হবে। মুক্তচিন্তা মুক্তমনা  মানেই হল আপনার চিন্তার জগত, আপনার কল্পনা, আপনার ধ্যান-জ্ঞান সবকিছুই হবে মুক্ত বিহঙ্গের মতো। বদ্ধ সিস্টেমের ভেতরে থেকে এটা সম্ভব নয়।

চলেন বিষয়টি নিয়ে সায়েন্স ও ফিলোসোফির আলোকে একটু আলোচনা করি।

বিজ্ঞানের আলোকে আমরা জানি যে, ইউনিভার্সের কোন কিছুই সুশৃঙ্খলভাবে চলছে না। এখানের সবকিছুই বিশৃঙ্খল। তবে এই বিশৃঙ্খল জগতের সকল পদার্থ ও শক্তির প্রকৃতি  ব্যাখ্যা করা যায় যেসব বৈজ্ঞানিক সূত্র দিয়ে তা কখনো পরিবর্তন হবে না। এই যেমন শক্তির নিত্যতা সূত্র, থার্মোডাইনামিক্সের

সূত্রসমূহ এসব কখনও পরিবর্তন হবে না। এই সূত্রসমূহ যেকোনো সিস্টেমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এমন কোন সিস্টেম বা ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে এই ইউনিভার্সাল সূত্রসমূহের ব্যত্যয় ঘটবে। এই সিস্টেম হতে পারে আমাদের পুরো মহাবিশ্ব কিংবা একটি নক্ষত্র অথবা আমাদের পৃথিবী বা অন্য কোন গ্রহ। আবার এই সিস্টেম হতে পারে আমাদের পৃথিবীর অন্তর্গত যেকোন কিছু, পৃথিবীর সাগর মহাসাগর, নদ-নদী, খাল, বিল,পাহাড় পর্বত,বাতাস ইত্যাদি।

**আপনার খাবার টেবিলে রাখা এক গ্লাস পানি, চুলোয় বসানো গরম পানিভর্তি পাতিল, পার্টিতে  কিনে আনা এক বোতল মদ, কিংবা কোল্ড ড্রিংকস এর ক্যান সবই একেকটা সিস্টেমের আওতাধীন।**

এতো গেল শুধু ম্যাক্রো লেভেলের উদাহরণ। এবার সিস্টেমের কিছু মাইক্রো লেভেলের উদাহরণ দেখে নেয়া যাক। পদার্থকে ভাঙলে যে অণু পরমাণু পাওয়া যায় সেগুলো ও একটা সিস্টেম। আবার পরমাণুকে আরও ভাঙতে থাকলে যে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন,ও অন্যান্য Particles পাওয়া যায় সেগুলোও  একটা সিস্টেমের

অন্তর্ভুক্ত। আবার আরেকটু ভিন্নভাবে চিন্তা করলে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা, রাস্ট্র, সরকার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান -মসজিদ,মন্দির,গীর্জা,প্যাগোডা, বিভিন্ন শিল্পকারখানা, যানবাহন, ক্রীড়া ও চিত্রজগত ইত্যাদির সবকিছুই কোন না সিস্টেমের অধীন। কাজেই এক কথায় বলা যায় ইউনিভার্সের সবকিছুই একটা সিস্টেমের আওতাধীন।

এখন আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, সিস্টেম আসলে কি? সিস্টেমের সংজ্ঞাই বা কি? ওকে ফাইন, উত্তরটা আমি জানিয়ে দিচ্ছি।

সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে "সিস্টেম হলো এমন একটি সজ্জিত নিয়ম বা পদ্ধতি বা গঠনতন্ত্র বা বস্তুর সন্নিবেশ যা একটি নির্দিষ্ট কৌশল বা পরস্পর আন্তঃসংযুক্ত নেটওয়ার্ক এর অংশ হিসেবে কাজ করে। যেমনঃ রাষ্ট্রীয় শিক্ষাব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় রেলওয়ে সিস্টেম, মোবাইল নেটওয়ার্ক সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম বা ইন্টারনেট, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি আবার পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় সিস্টেমকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে -

পরীক্ষা নীরিক্ষা করার সময় জড়জগতের যে অংশ বিবেচনা করা হয় তাকে সিস্টেম বলে। এই সিস্টেম ৩ ধরনের হতে পারে। যথা- বদ্ধ সিস্টেম, মুক্ত সিস্টেম ও বিচ্ছিন্ন সিস্টেম। মুক্ত সিস্টেমের ক্ষেত্রে পরিবেশের সাথে পদার্থ ও শক্তির

বিনিময় হয়। যেমন, গরম পানিযুক্ত উন্মুক্ত চায়ের কেটলি বা এক কাপ গরম চা বা কফি হল মুক্ত সিস্টেমের উদাহরণ। আবার বদ্ধ সিস্টেমের ক্ষেত্রে পরিবেশের সাথে শুধুমাত্র শক্তির বিনিময় হয় কিন্তু পদার্থ বা ভরের বিনিময় হয় না। যেমন, ঢাকনা দিয়ে আটকানো গরম পানি ধারণ কারী চায়ের কেটলি। অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন সিস্টেমের ক্ষেত্রে পরিবেশের সাথে পদার্থ ও শক্তি কোনটারই বিনিময় হয় না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ইউনিভার্সের কোথাও কোন বিচ্ছিন্ন সিস্টেম বলে কিছুই নেই। এটা জাস্ট একটা কাল্পনিক ধারণা।

যাইহোক, এসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে। কিন্তু আমার এই আলোচনায় আমি জাস্ট মূল থিমের আলোকে আপনাকে বুঝানোর চেষ্টা করছি। আশা করছি এতক্ষণে আপনি সিস্টেম সম্পর্কে অনেকখানি অবগত হয়েছেন। আপনি যদি সিস্টেম সম্পর্কে বুঝেই থাকেন তাহলে আপনাকে এখন বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। প্রশ্নগুলো আসতে পারে কোন অল্পশিক্ষিত চতুর ধূর্ত মোল্লার কাছ থেকে। ধূর্ত মোল্লা আপনাকে বলতে পারে যে, "পুরো মহাবিশ্বই যেহেতু একটা সিস্টেম, তাহলে এই সিস্টেম তৈরি করলো কে? এই সিস্টেম নিশ্চয় 'ভুগিভুগি' তৈরি করেছেন এবং তিনিই ইহা চালাচ্ছেন তার নিজের খেয়ালে।”

ধূর্ত মোল্লার এমন প্রশ্ন ও উত্তর শুনে যদি আপনি এখানেই থেমে যান তাহলে আপনি কোনদিন গন্ডীর বাহিরে চিন্তা করতে পারবেন না। আপনি জগতের সৃষ্টি রহস্যের আগামাথা কিছুই জানতে পারবেন না। আপনার পক্ষে কখনো মুক্তচিন্তক ও প্রগতিশীল হওয়া সম্ভব না। কাজেই আপনাকে থেমে গেলে চলবে না। ওই পয়েন্টটাই আপনার মুক্তচিন্তক হয়ে উঠার পেছনে প্লাস পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে যদি আপনি তাকে পালটা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে পারেন।

## আপনি তাকে প্রশ্ন ছুড়ে মারুন যে পৃথিবীতে ৪০০০+ ধর্ম আছে। কোন ধর্মের কোন 'ভুগিভুগি' এই সিস্টেম তৈরি করেছেন?

এই সিস্টেম তিনি কেন তৈরি করেছেন, কিভাবে তৈরি করেছেন? ভুগিভুগির তৈরি করা সিস্টেমে কোন শৃঙ্খলা নেই কেন? কেন পৃথিবীতে এক প্রাণী খাচ্ছে আরেক প্রাণীকে?

কেন মহাবিশ্বে সবসময় মহা কুরুক্ষেত্র লেগেই আছে? কেন কোন কিছুই সুক্ষ্মভাবে চলছে না? কেন নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠোকাঠুকি লাগে? কেন নক্ষত্র collapsed হয়ে ব্ল্যাক

হোলে পরিণত হয়ে সে Constellation এর সকল তারাগুলোকে গিলে ফেলে

কিংবা Neutron নক্ষত্র হয়ে মারাত্মক শক্তিশালী Gamma ray বিকিরণ করে আশেপাশের সব তারাকে ধংস করে দেয়? কেন বড় Galaxy ছোটো Glaxy কে গিলে খেয়ে আপন আকৃতিকে

বিশাল করে ফেলে? কেন মহাবিশ্বে এই অহরহ তান্ডবের লীলাখেলা চলছেই যার কোন নিয়ম কানুন নাই?

Why there is no plan or rule in the Cosmos? কেন যে যার খেয়ালে চলছে, ধ্বংস হচ্ছে আবার নতুন রূপে আবির্ভাব হচ্ছে? এভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে পারলে আপনি অতি দ্রুতই চিন্তায় ও মননে হাজারগুণে এগিয়ে যাবেন।

পরিশেষে বলি মুক্ত বুদ্ধির চর্চা করতে হলে আপনাকে আগে সিস্টেমের বাহিরে আসতে হবে। সিস্টেমের ভেতরে থেকে আপনি কখনোই সিস্টেমকে জানতে বা বুঝতে পারবেন না। সিস্টেমকে ভালোভাবে বুঝতে হলে আপনাকে অবশ্যই সিস্টেমের বাহিরে গিয়ে সিস্টেমকে observe করতে হবে। একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে বুঝাই-

আমাদের দেশে কওমি মাদ্রাসায় পড়াশোনা শিক্ষার্থীদের কথাই ধরুন। এই কাওমি মাদ্রাসা হল একটা সিস্টেম। এই সিস্টেমের ভেতরে যেসব ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে তারা

সাধারণত বাহিরের জগত উন্নত বিশ্বের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও আধুনিকতা সম্পর্কে অবগত থাকে না। তারা সিস্টেমের আওতাধীন হুজুরদের মুখে যা শুনে সেটাকেই মনে করে পুরো পৃথিবী। তারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কেও অনেক পিছিয়ে থাকে। এর কারণ কওমি মাদ্রাসার সিস্টেম অনুযায়ী সেখানে তাদেরকে সাধারণত ধর্মীয় বই পুস্তকই বেশি বেশি পড়ানো হয়। তাদেরকে বিখ্যাত লেখকদের বই পড়ার সুযোগ দেয়া হয় না। উন্নত বিশ্বের কোথায় কি হচ্ছে সে সম্পর্কে তারা খুব একটা ওয়াকিবহাল থাকে না। কাজেই কওমি সিস্টেমের ভেতরে থেকে পড়াশোনা করা একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে মুক্তচিন্তক হয়ে উঠা খুবই কম সম্ভব।

> “বিবর্তনের ধারণা সাধারণ মানুষ এখনও মন থেকে মেনে নিতে পারেনি,কারন এ তত্ত্ব গ্রহণ করলে 'ঈশ্বরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত' বিশেষ সৃষ্টি মানুষের বিশিষ্টতা ক্ষুণ্ণ হয়। আর এ কারণেই মানুষ আজও নিজেকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ভেবে নিজেকে সৃষ্টির মধ্যমণি করে,পৃথিবীকে মহাবিশ্বের মাঝে বসিয়ে সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। ফাইন টিউনিং ও অ্যানথ্রোপলজিকাল যুক্তিগুলো এ জন্যই মানুষের কাছে এখনও এত আকর্ষণীয়।”

-অভিজিৎ রায়

# মনের ফাঁদে

(মনস্তাত্বিক ভ্রম সম্পর্কে একটি ছোটো প্রবন্ধ)

-রাজর্ষি রীত

আমাদের চারপাশে যা কিছু ঘটে সেই তথ্যগুলিকে আমরা আমাদের মস্তিষ্কের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পারি ঘটনাটি কী, কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল, আবার এক তথ্য থেকে অন্য তথ্যে উপনীত হই। এই বিশ্লেষণ এর কাজটিকেই বলা হয় যুক্তি বা লজিক।

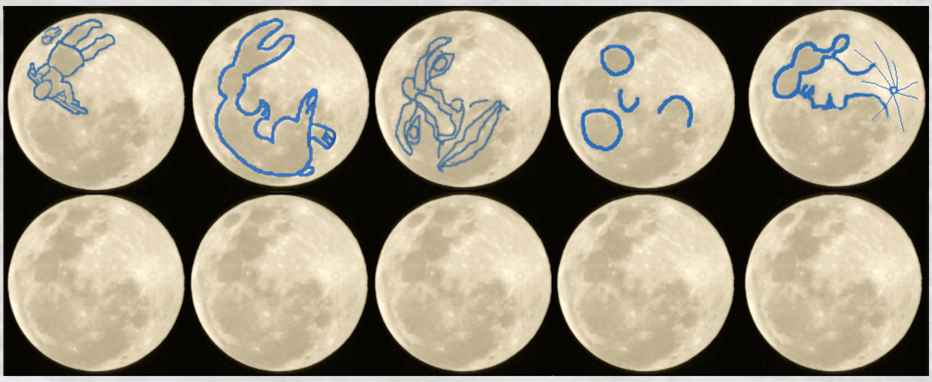


Figure 1 চন্দ্রপৃষ্ঠে প্যারিডোলিয়া। কৃতজ্ঞতাঃ উইকিমিডিয়া কমন্স

আবার এই মস্তিষ্কই কখনো কখনো তথ্যপ্রমাণের ভুল উপস্থাপনা করে, যার ফলে সঠিক বা বাস্তব তথ্য আমাদের সামনে বর্তমান থাকলেও আমরা অন্যকিছু বুঝি বা অন্যকিছু অনুভব করি বা অন্যকিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হই। এটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু এই বিভ্রান্তিগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়া, বিভ্রান্তিগুলিকে চিনতে শেখা এবং এড়িয়ে চলার যতটা সম্ভব চেষ্টা করা জরুরি।

বিভ্রান্তিগুলি বিভিন্ন কারণে সৃষ্টি হতে পারে। যেমন আমাদের স্মৃতি, শিক্ষা, বিশ্বাস, ধ্যানধারণা ইত্যাদিও প্রভাব ফেলতে পারে আমাদের অনুভূতি, চিন্তা, যুক্তির উপরে। আবার জন্মগতভাবে আমরা (যেকোনো মানব মস্তিষ্ক) কিছু কিছু বাঁধাধরা চিন্তাপদ্ধতির শিকার যার ফলে এইপ্রকার ত্রুটির উদ্ভব হয়। আজকের আলোচনায় রোগজনিত বা প্যাথলজিক্যাল বিভ্রম গুলিকে বাদ রাখছি। বিভ্রম বা ভ্রান্তি গুলিকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়।

১. ফ্যালাসি (fallacy), বা যুক্তির ফাঁকি ।

২. বায়াস (bias), বা কোনও ঘটনায় একটি ব্যাখ্যা বা একটি সম্ভাবনার উপরে প্রকৃত ব্যাখ্যার চেয়ে একটি ভুল ব্যাখ্যাকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হওয়া।

৩. ইলিউশন (illusion), বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির ত্রুটি।

৪. প্যারাডক্স (paradox), বা এমন ঘটনা যা আপাতদৃষ্টিতে যুক্তির বিপক্ষে যায় বা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়না, কিন্তু গভীরভাবে তদন্ত করলে এটি যুক্তিগ্রাহ্য ঘটনা। (আবার অনেকসময় পরস্পরবিরোধী যুক্তি কেও প্যারাডক্স বলা হয়) ইত্যাদি।

কোনও কোনও ত্রুটি এদের মধ্যে একাধিক শ্রেণীতে পড়তে পারে। এরা আবার মূলতঃ যুক্তির ভুলের কারণেই হতে পারে (লজিকাল এরর) অথবা এর পিছনে কোনো মনস্তাত্বিক কারণ থাকতে পারে (সাইকোলজিক্যাল এরর, সাইকোলজিক্যাল বায়াস) আমরা এদের মধ্যে অল্প কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করবো। মনে রাখতে হবে, সাইকোলজিক্যাল এরর, লজিকাল এরর এর মতই গুরুত্বপূর্ণ; বিচারপতি থেকে নীতিপ্রণেতা, গরীব ভোটার বা মধ্যবিত্ত খরিদ্দার, যে কেউ এইসব বিভ্রান্তির শিকার হতে পারেন। আবার রাজনীতিক বা ধর্মপ্রণেতা, সাধারণ জনগণ কে প্রভাবিত করতে নানা মনস্তাত্বিক কৌশল এর সাহায্য নিতে পারেন যা থেকে সতর্ক হওয়া অতীব জরুরি।

## যুক্তির ভুল

বিশুদ্ধ যুক্তির ভুল বলে হয়ত কিছু হয়না, কারণ যুক্তি আমাদের মন এবং মস্তিষ্কের ই অংশ। তবুও সাধারণভাবে যুক্তি বা কার্যকারণ সম্পর্ক বা অন্য শ্রেনীবিভক্তকরণে ভুল হলে সেগুলিকে যুক্তির ফাঁকি বা যুক্তির ভুল (লজিকাল ফ্যালাসি) বলা হয়। ধরা যাক নিম্নলিখিত কয়েকটি তথ্য বা বক্তব্য।

১. কুকুরের একটি লেজ

২. গরুর একটি লেজ

অতএব কুকুর হল একটি গরু।

কিংবা

১. মানুষের পাঁচটি আঙ্গুল

২. রামবাবুর চারটি আঙ্গুল

অতএব রামবাবু মানুষ নয়।

এগুলি কিছু যুক্তির ভুল যা সহজেই ধরা পড়ে। তবে মনস্তাত্বিক বিভিন্ন কারণে অনেকসময় এই ভুলগুলোই সত্যি মনে হয়। অর্থাৎ ভ্রমাত্মক বিশ্লেষণের প্রতি বায়াস সৃষ্টি করে। উপরের উদাহরণগুলোই সামান্য পরিবর্তিত করে ব্যাপারটা দেখাচ্ছি।

১. রামবাবু রাজনৈতিক দল ‘ক’ এর সমর্থক ও ধর্ম ১ বিশ্বাসী।

২. শ্যামবাবুও ধর্ম ১ বিশ্বাসী

অতএব শ্যামবাবু নিশ্চয়ই রাজনৈতিক দল ‘ক’ এর সমর্থক হয়ে থাকবেন।

কিংবা

১. মানুষের মান-সম্মান বোধ থাকতে হবে।

২. বুদ্ধি-প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যদু মান-সম্মান বলে আর কিছু অবশিষ্ট  রাখলো না।

অতএব যদু মানুষের পর্যায়ে গণ্য নয়।

এখানে প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিকোণ (পারসেপশন) বা বিশ্বাস (বিলিফ সিস্টেম); সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বিচার এ উপনীত করায়।

এবার আসি বিভিন্ন মনস্তাত্বিক ভ্রম এর উদাহরণ এ।

এগুলিকে কগনিটিভ বায়াস বা বুদ্ধিগত বিভ্রম ও বলা হয়। এর অজস্র প্রকারভেদ রয়েছে। তবে আমাদের স্বল্প পরিসরে এর কয়েকটি নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

**অ্যাপোফেনিয়া (Apophenia) –**

সম্পূর্ণ এলোমেলো (random) নয়েজের মধ্যে কোনও অবাস্তব সঙ্কেত দেখতে পাওয়া (যেমন ধরুন অজস্র রেডিও সিগন্যাল এর মধ্যে কোনওটিকে যথোপযুক্ত প্রমাণ ছাড়াই ভূত বা ভিনগ্রহী বলে দাবি করা, কিছু লোকজনের শারীরিক

গঠন দেখে তাকে খারাপ বা ভালো লোক বলে দাবি করা, এগুলি অ্যাপোফেনিয়া র উদাহরণ)।

**প্যারেইডোলিয়া (Pareidolia) –**

অ্যাপোফেনিয়া-র দৃশ্যগ্রাহ্য রূপ হল প্যারেইডোলিয়া। এতে আমরা কোনও হিজিবিজি জ্যামিতিক আকৃতির মধ্যে ভ্রমাত্মক অর্থবহ কিছু আকৃতি বা লেখা খুঁজে পাই। প্যারেইডোলিয়া যে সবসময় ক্ষতিকর তা নয় (যেমন মেঘের মধ্যে মানুষের মুখ বা আকাশের তারা র মধ্যে কন্সটিলেশন খুঁজে বার করতে ভালো লাগে বা তার কিছু ব্যাবহারিক উপযোগিতাও রয়েছে), কিন্তু প্যারেইডোলিয়া কে বুঝতে পারলে আমরা এটাও বুঝতে পারি মানুষ কেন কোনো প্রাকৃতিক গঠন এর মধ্যে দৈবী বার্তা খুঁজে পায়। যেমন কেউ হয়ত পাহাড়ের পাথরে কোন মুখাবয়ব দেখতে পেয়ে ভাবতে শুরু করলো কোনো দৈব শক্তি ওই পাথরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। আবার প্রাচীন কালে মানুষ যা কিছু নক্ষত্র দেখেছে তার প্রায় প্রত্যেক-কটা কে কোনো না কোনো কন্সটিলেশন (নক্ষত্র মণ্ডলী) র মধ্যে ঢুকিয়েছে। তারা হয়ত ভেবেছে এইসব আকৃতি কোনো দৈবী শক্তির

পরিচয় বহন করছে ও আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু আমরা এখন জানি সম্পূর্ণ এলোমেলো হিজিবিজির মধ্যেও আমাদের মস্তিষ্ক কোনো না কোনো নকশা খুঁজে পায়। এটা প্যারেইডোলিয়া, কোনো অলৌকিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ নয়।

**বার্নাম এফেক্ট (Barnum effect) –**

জ্যোতিষী, ভাগ্যগণক, প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ, কোনও অপরিচিত ব্যক্তির ভাগ্য, অতীত, ব্যক্তিত্বও, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে এমন বক্তব্য রাখে, যা প্রায় যেকোনো কারুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে ওই ভবিষ্যতবাণী সম্পূর্ণ অর্থহীন। কিন্তু ক্লায়েন্টের মগজ শুধু লক্ষ্য করে তাঁর নিজের সাথে ওই ভবিষ্যতবাণী মিললো। তার ফলে ভ্রমাত্মক ভাবে ওই ক্লায়েন্ট মনে করে ভাগ্যগণনা সঠিক হয়েছে।

প্ল্যাসিবো এফেক্ট (Placebo effect) এবং নোসিবো এফেক্ট (Nocebo effect) –

সম্পূর্ণ অকার্যকরী ওষুধ খেয়ে বা কোনো বস্তু ধারণ করে যখন মনে হয় রোগযন্ত্রণার উপশম হয়েছে তখন তাকে প্ল্যাসিবো এফেক্ট বলে। এর ঠিক বিপরীত ঘটনা কে বলা হয় নোসিবো এফেক্ট যেখানে কোনো অকার্যকর দ্রব্য বিষক্রিয়া বা অশুভ প্রভাব ছড়াচ্ছে বলে মনে হয়।

**কনফার্মেশন বায়াস (Confirmation bias) –**

আগে থেকেই যে ঘটনা বা ব্যাখ্যা জানা আছে, একগাদা তথ্যের ভিড়ে সেই তথ্য বা সেই ব্যাখ্যা ই প্রমাণিত হচ্ছে বলে মনে হয়। যদিও প্রকৃতপক্ষে তথ্যগুলি হয়ত এমন কোনও ব্যাখ্যা কে নির্দেশ করেনা অথবা অন্য কোনো ব্যাখ্যা কে নির্দেশ করে। এটা কিছুটা অ্যাপোফেনিয়া বা প্যারেইডোলিয়া-র ই মতন কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে, একটি প্যাটার্ন আপনি আগে থেকে জানেন, কাজেই আপনার মস্তিষ্ক অযাচিত ভাবে ওই প্যাটার্নটি সবকিছুতে খুঁজে পাচ্ছে। এর উদাহরণ হল, ধরুন একটি প্রবাদ বলছে অমুক জাতের লোক যদি কালো রঙের হয় তাহলে তারা বদমাইশ হবে। এক্ষেত্রে তদন্তকারী ব্যক্তি যদি ১০০০ মানুষ কে পর্যবেক্ষণ করে মনে করবার চেষ্টা করেন, তখন, কতবার অমুক জাতের কালো লোকরা বদমাইশি করেছে সেটাই মনে পড়বে। কতবার ওই জাতের সাদা লোক বদমাইশি করেছে আর কতবার ওই জাতের বাইরে অন্য জাতের কালো লোক বদমাইশি করেছে তা মনে করা কষ্টসাধ্য হবে।

**কনফরমিটি বায়াস (Conformity bias) –** যখন একই তথ্য বা পরিমাপ বা ব্যাখ্যা বা যুক্তি অনেক অনেক লোকজন দাবি করতে থাকে, তখন সংখ্যাগুরুর যুক্তিকেই অধিকতর

সঠিক বা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে মনে হতে থাকে। আবার অধিক মান্যতাপ্রাপ্ত কোনো অথরিটি যদি ভুল কথাকে সঠিক বলে আশ্বাস দেন তখনও এইপ্রকার ভ্রম হয়। একে অথরিটি বায়াস বলে।

**ডানিং-ক্রুগার এফেক্ট (Dunning Kruger effect) –**

যখন কোনো বিষয়ে সামান্য জ্ঞান অর্জন করার পরই মনে হতে থাকে অনেক জ্ঞান অর্জন করে ফেলেছে। আবার এর উল্টোটাও হয়, যাকে ইমপোস্টার সিনড্রোম বলা হয় - যখন অত্যন্ত জ্ঞানী বা যোগ্য কেউ নিজেকে অযোগ্য ভাবতে থাকেন।

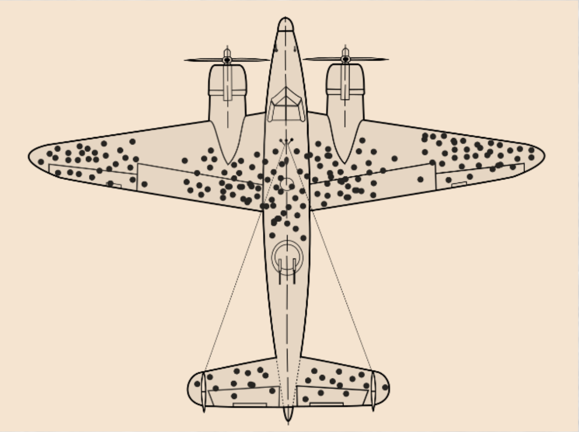
**সেলফ-ফুলফিলিং প্রফেসি (self fulfilling prophecy)**

এটি হল একটি সামাজিক ঘটনা যেখানে কোনো ভবিষ্যৎবাণী বা অলৌকিক আদেশ (আশীর্বাদ অভিশাপ ইত্যাদি) বা অদ্ভুত কোনো দাবী নিজেই নিজেকে সত্যি করে তোলে। অর্থাৎ এটি একটি কগনিটিভ বায়াস এবং তার পরিণতি দুই মিলিয়ে এই ঘটনা ঘটে। ধরা যাক একটি ছাত্র পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে কেউ বলল যদি আজ ডিম খাস তাহলে পরীক্ষায় গেল করবি। ছাত্রটি ডিম খেয়ে ফেলার পর নার্ভাস হয়ে পড়ল এবং মনে করলো সে

বোধহয় সত্যিই ফেল করবে। এর ফলে সে পড়াশোনা করে যাওয়া সত্ত্বেও কিছু লিখতে পারলোনা, ফেল করল। এটি নসিবো এফেক্টের সাথে তুলনীয়। এতে করে দাবির ফলাফল মিলেগেলেও দাবির অলৌকিকতার সত্যতা প্রমাণিত হয়না।

**সারভাইভারশিপ বায়াস (Survivorship bias) –**

আমরা সর্বদা সফল লোকের কথা শুনি, সফল ছাত্রের মতামত কে অধিক গুরুত্ব দিই। এর ফলে আমরা অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে ভুল ব্যাখ্যায় উপনীত হই। একে সারভাইভারশিপ বায়াস বলে। এর একটি ঐতিহাসিক উদাহরণ হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মাটি থেকে ছোঁড়া গোলার আঘাতপ্রাপ্ত যুদ্ধবিমান। দেখা যাচ্ছিলো, যেসব বিমান যুদ্ধ করে ফিরে আসছে তাদের ডানা ও লেজে অপেক্ষাকৃত বেশি গোলার



দাগ। তখন সিদ্ধান্ত করা হল যে বিমানের ডানা ও লেজের ওইসব স্থানেই হয়ত বেশি গোলা লাগার সম্ভাবনা। অতএব সেনাকর্তারা বললেন ওইসব স্থান অধিক মজবুত করে তৈরী করা হোক। কিন্তু গণিতজ্ঞ আব্রাহাম ওয়াল্ড বললেন ঠিক উল্টো কথা। যে স্থানগুলিতে একেবারেই গোলা লাগছে না,

আসলে মজবুত করতে হবে সেই জায়গাগুলি। কেন? তার কারণ যে বিমানগুলি আর ফিরে আসেনি, তারা সেই সমস্ত স্থানেও গোলা খেয়েছে। সেই জায়গাগুলিতে ছিল বিমানের ইঞ্জিন ও পেট্রোল ট্যাংকার। যে বিমানগুলি ফিরে এসেছে তারা ওই স্থানগুলিতে গোলা না খাওয়ার ফলেই ফিরে আসতে সমর্থ হয়েছিলো। ঠিক এইরকম ভ্রম হয় যখন মনে করা হয় বিড়াল উঁচু  থেকে পড়লেও কখনই মারা যায়না। আসলে মৃত বিড়ালকে কেউ হাসপাতালে নিয়ে আসে না, কাজেই মৃত বিড়াল পরিসংখ্যান থেকে বাদ যায়। আবার, কোনো স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় কত ভালো তা জানতে সাধারণতঃ সফল অ্যালামনি দের মতামত চাওয়া হয়। ড্রপআউট দের সাথে কী কী ঘটেছিলো তা কেউ জানতে পারে না। আবার অনেক সফল ব্যক্তির ছবি দেখিয়ে বলা হয় উনি চেষ্টা করেছেন তাই পেরেছেন। কিন্তু যারা চেষ্টা করেও পারলো না, তাদের তথ্য হারিয়ে যায়। যারা পারলো না, বিফল হল, তাদের প্রচেষ্টা ছিলোনা বলেই আপাতদৃষ্টি তে মনে হয়।

**নরম্যালসি বায়াস (Normalcy bias)** –

বহুল প্রচলিত রীতি বা ধারণার সাথে মেলে না এমন তথ্যপ্রমাণ সামনে আসলে নতুন করে সত্যিটাকে মেনে

নিতে কষ্ট হয়। এমনকি মানসিক দোলাচলগত যন্ত্রণা (কগনিটিভ ডিসোন্যান্স) তৈরি হয়। ফেলে আসা মিথ্যাটাকেই অধিক সত্য বলে মনে হয়। একে নরম্যালসি বায়াস বলে।

পরিশেষে আবারও বলছি, ফ্যালাসি বায়াস ইলিউশন এগুলি কোনো অপরাধ নয়। এগুলি মানব মস্তিষ্কের সীমাবদ্ধতা বলা যেতে পারে। কিন্তু যুক্তি ও আত্মঃসমীক্ষার মাধ্যমে এইসব বিভ্রান্তির থেকে প্রকৃত তথ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কোন প্রচলিত বিশ্বাস বা চিন্তাপদ্ধতির বাইরে বেরিয়ে নিজের মনকে যেকোনো দিকে চিন্তা করার স্বাধীনতা দিতে হবে। অর্থাৎ মনকে মুক্ত রাখতে হবে। তবেই সত্যিটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

তথ্যসূত্রঃ

১. Series – ‘Brain Games’ : National Geographic Channel

২. Wikipedia – List of Cognitive bias

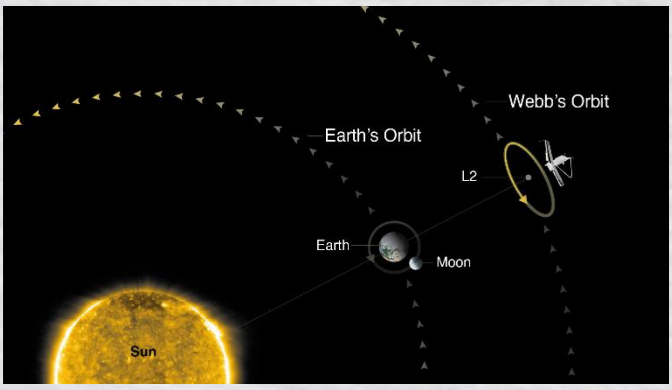
৩. Michael Stevens (Vsauce) youtube channel.

# JWST, ধর্ম ও আমার ঈশ্বর

- সময়

"Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people." - Karl Heinrich Marx

সম্প্রতি জেমস ওয়েব স্পেস চোখ দিয়ে মানুষ মহাবিশ্বের প্রাচীনতম ছবি দেখতে সক্ষম হয়েছে। হাবল টেলিস্কোপের উত্তরসূরি এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি গত 25 ডিসেম্বর উৎক্ষেপণ করা হয়েছিলো। সৃষ্টির জন্মলগ্নে ব্রম্ভান্ডের গতি-প্রকৃতি এবং তার অভ্যন্তরীন গ্যালাক্সি সমূহকে বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যেই এই প্রজেক্টটি গ্রহণ করা হয়েছিলো। অবশেষে সকল অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে JWST প্রায় 1300 কোটি বছর




আগের মহাবিশ্বের রূপকে আমাদের সামনে প্রকাশিত করেছে!

সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে আসতে প্রায় 8 মিনিট 20 সেকেন্ড সময় লাগে। মানে এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে

আমরা যেই সূর্যকে দেখি সেটি ৪ মিনিট 20 সেকেন্ড আগের সূর্য। একই রকম, নক্ষত্রপুঞ্জগুলি থেকে অবলোহিত তরঙ্গ প্রায় 1300 কোটি বছর ধরে পথ ভ্রমন করে JWST তে ধরা পড়েছে এবং এভাবেই চিত্রগুলি আমাদের সামনে ফুঁটে উঠেছে।

ছবিতে আমরা অজস্র উজ্জ্বল ছায়াপথ, নক্ষত্রপুঞ্জকে দেখতে পারছি। কোনো শিল্পীর প্যালেটের মত শত বর্ণে রঞ্জিত। ক্যালাইডোস্কোপের রঙিন ফর্ম গুলির মতো প্রতিটি ছায়াপথে লুকিয়ে আছে চেতনাতীত রহস্য, কল্পনার মেঘকেও ছাড়িয়ে যাওয়া রূপকথার জেটপ্লেন কিংবা, শুধুমাত্রই মহাজাগতিক ধূলিকণা আর কিছু গ্যাসের মিশ্রণ।

কিন্তু, এখানে ঈশ্বর কোথায়? কোথায়-ই বা স্বর্গ-দোজখের ঠিকানা? ওমনি ঠিক কেউ রে রে করে তেড়ে আসবে এই বলে যে মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষের মাঝেই ঈশ্বর। খুবই সত্যি কথা। কিন্তু, তাহলে সেই ঈশ্বরের ই আবাসস্থল নিয়ে এই এতো মারামারি-কাঁটাকাটি কেন? এই সব নীতিকথা ঈশ্বপের গল্পের শেষ লাইনেই আবদ্ধ, বাস্তবে বেশিরভাগ মানুষ এ সবের ধার ধরেনা। পাহাড় প্রমান ডিগ্রি ধারী তথাকথিত শিক্ষিত বিজ্ঞানের অধ্যাপক যখন দশ আঙুলে দশটি রত্ন পরিধান করে কোনো এক পেটমোটা

ধর্মগুরুর পায়ে মাথা নোয়ায়, এর থেকে ঘৃণ্য কাজ আর কিছু হতে পারেনা।

কেউ যদি ব্যক্তিগত ভাবে কোনো কাল্পনিক সত্ত্বার প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহলে আমার কিংবা সমাজের কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। সে তো পাশের বাড়ির পাঁচ বছরের প্যাঙলাও তো স্পাইডারম্যান কে তার আইডল মনে মরে, ও বিপদে পড়লে নাকি 'স্পাইডি' এসে তাকে উদ্ধার করবে।

কিন্তু, সমস্যাটা তখন হয়, যখন এই ধর্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস দাসসুলভ দূর্বলতায় পরিণত হয়। ব্যাপারটা বোঝার জন্য টাইম মেশিনের পিঠে চেপে, সমাজ গঠনের আদি পর্বে চলে যেতে হয়। সেই আদিম যুগে মানুষ বুঝতে পেরেছিলো যে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বসবাস করলে হিংস্র পশু কিংবা কোনো দূর্যোগ থেকে নিরাপদে থাকা যায়। কর্মক্ষম নারী-পুরুষেরা খাদ্য সংগ্রহ করে আনতো এবং পরে তা সকলের মধ্যে বন্টন করা হতো। খাদ্য সংগ্রহে যার ভূমিকা বেশি থাকতো, স্বাভাবিক ভাবেই খাবারে তার অগ্রাধিকার থাকতো। কিন্তু, বাদ বাকি সবাই ও ন্যায্য পরিমানে খাবার পেতো। এই ভাবে আদিম সমাজের সূত্রপাত ঘটে।

লিঙ্গ বৈষম্যহীন সেই সমাজে, যে যেই কাজে দক্ষ ছিলো, সে সেই কাজই করতো। শ্রেণীহীন, বর্নহীন সেই সমাজে সবার সমান অধিকার ছিলো। ক্রমে, এই সকল সমাজে ক্ষমতার জোরে কিছু ব্যক্তিবর্গ নিজ প্রভাব বিস্তার করে। কিছু মানুষকে অনুগত সৈন্যে পরিণত করে তারা নিজেদের একাধিপত্য গঠন করে।

**খাদ্য ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই শাসকেরা সাধারণ মানুষের সাথে এক অলিখিত চুক্তি স্বাক্ষর করে। রুশো একে "Social Contract" বলে অভিহিত করেছেন।**

এর পরিবর্তে সাধারণ মানুষ শাসক কে কর দিয়ে সাহায্য করে এবং তাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট হতে সাহায্য করে। এই ভাবেই এক রাষ্ট্র জন্ম নেয়।

বলে রাখা ভালো, এর অনেক আগেই মানুষ বহু প্রাকৃতিক ঘটনাকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে না পেরে দৈব বলে মনে করে, ভয়-ভক্তির বশে পূজা-প্রার্থনায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু,

শাসক ও কিছু স্বার্থান্বেষী জনগোষ্ঠী (পুরোহিত ও মহাজন) এই ঈশ্বরে বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে জনগণকে শোষণের কাজ চালাতে শুরু করে। প্রথমে তারা দৈববানীর নামে রাষ্ট্রের শীর্ষে উপবিষ্ট হয়, এরপর তাদের অক্ষমতাকে ঢাকার জন্য 'ঈশ্বর'-এর, যথেচ্ছ ব্যবহার করা শুরু করে। খেটে খাওয়া মানুষ গুলোকে প্রথমে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তারপর এই বলে স্বান্তনা দেয় যে এই পৃথিবী তো মায়া, তোমাদের দুরাবস্থার জন্য পূর্ব জন্মের কর্মফলই দায়ী। তাই, এই জন্ম ঈশ্বরের নাম জপ করে আর ধর্মগুরুর পদলেহন করে নির্বাহ করো, মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে অপ্সরা-হুরেরা সুরা-কুসুমদাম দিয়ে তোমায় বরণ করে নেবে। আর, প্রতিবাদ করলেই নরকের আগুনে জ্বলে-পুড়ে শেষ।

ধর্ম আর কিছুই নয়, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমজীবী, সাধারণ মানুষকে শোষণ করার এক যন্ত্র মাত্র। ঘোড়ার চোখের ঠুলির মতো ভাবতে পারেন, আসল সমস্যা থেকে চোখ সরিয়ে অন্য দিকে নিয়ে ফোকাস করতে সাহায্য করবে। তাই তো দেশের অর্থনীতি ডুবিয়মান, তা যাক না ডুবে, আসল সমস্যা হলো – “মন্দির/মসজিদ ওয়াহি বানায়েঙ্গে .....”।

এতো গেলো ধর্ম নিয়ে অনেক কথা। এবার একটু কলমের খোঁচা দেওয়া যাক। আস্তিক-নাস্তিক শব্দ দ্বয় মূলত '√অস্' ধাতু থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে, যার অর্থ - থাকা। কোনো শক্তি বা বস্তুর অস্তিত্বের প্রতি আস্থা বা বিশ্বাসকেই অস্তিক্যবাদ বলা হয়। নাস্তিক শব্দটি সম্পূর্ণ এর বিপরীত অর্থ ধারণ করে। আমি কোনো দৈব কিংবা অতি-প্রাকৃতিক সত্ত্বায় বিশ্বাস রাখিনা, যে কিনা আমার ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে অথবা যার পায়ে মাথা নোয়ালে, আমার জীবন টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের মতো বদলে যাবে।

আমি এমন কোনো পাড়ার মোরাল জেঠিমা টাইপের ঈশ্বরে বিশ্বাস করিনা যে কিনা বলে দেবে যে এটা করা সঠিক, আর এটা করা বেঠিক। আর এই স্যাডিস্টিক ঈশ্বরের কথা না শুনলে, সে আবার নরকের আগুনের পোঁড়াবার ভয় দেখায়।

এবার, আপনি বলতে পারেন যে সমাজে নৈতিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনেই ঈশ্বর নামক মোরাল ফিগার কে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী এমিল দুর্খেম ও এই কথায় বলেছেন। কিন্তু, এখানে একটা বিষয় স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার যে নৈতিকতা বিষয়টা অত্যন্ত আপেক্ষিক। একটা সমাজের কাছে কোনো কিছু নৈতিক মনে হলেও,

অন্য সমাজের কাছে তা অনৈতিক মনে হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ - হিন্দু ধর্মালম্বী মানুষদের মধ্যে গো-মাংস ভক্ষণ অত্যন্ত ঘৃণ্য অপরাধ(কেন তা আমি জানিনা)। আবার, ইসলাম ধর্ম মেনে চলা জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবার গরু খাওয়ার চল আছে। এই একটি বিষয় নৈতিক না অনৈতিক তা নিয়ে দুই ধর্মালম্বী সমাজের মধ্যে সংঘর্ষ বর্তমান। এথিকসের সংজ্ঞায় একে কালচারাল রিলেটিভিসিম বলে। অর্থাৎ, বিভিন্ন সমাজের মধ্যে নৈতিকতা-অনৈতিকতার ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। তাই, আবার ব্যক্তি বিশেষের মধ্যেও নৈতিকতার ধারণার বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। এথিকাল এবসোলিউটিসম-এর ধারণা অনুযায়ী পৃথিবীর সর্বত্র কিছু নৈতিকতার স্থির ধারণা বর্তমান। যেমন- ব্যক্তি, সমাজ কিংবা ধর্ম নির্বিশেষে হত্যা একটি গর্হিত অপরাধ। সব ধর্ম এই বিষয়ে এক মত পোষণ করে যে মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটলে, সে হত্যার মতন এমন ঘৃণ্য কর্মে লিপ্ত হতে পারে। কিন্তু, একবার ভেবে দেখুন তো ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবীরা যখন ব্রিটিশদের গাড়িতে বোমা মেরেছে কিংবা সাদা চামড়ার শোষকদের নির্বিচারে গুলি করেছে, সেটাও কিন্তু হত্যাই। তখন দেশ কে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাত থেকে মুক্ত করাটাই মুখ্য

উদ্দেশ্য হয়ে যাওয়ার কারণে, নর হত্যা কে আমাদের অনৈতিক বলে মনে হচ্ছেনা। এর থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ব্যক্তি কিংবা পরিস্থিতি বিশেষে নৈতিকতার ধারণার পরিবর্তন ঘটে। তাই, মেঘের ওপর থেকে কোনো ব্যক্তির এথিকসের ছড়ি ঘুরিয়ে জ্যাঠামো কে আমি সম্পুর্ন রূপে অবজ্ঞা করি।

আমার ঈশ্বর জাত-বর্ন-লিঙ্গ-পদবী মানে না। আমার ঈশ্বর বড়লোকের ম্যানসনে কিংবা মধ্যবিত্তের শো-কেসে থমকে নেই। নাম না জানা প্রান্তিক কোনো গ্রাম যেখানে এখনো বিদ্যুৎ পৌঁছতে পারেনি, সেখানেও আমার ঈশ্বর বিরাজমান। মেঘাচ্ছন্ন বিকেল, এক কাপ চা আর রবীন্দ্রসঙ্গীত কিংবা ফিফথ্ সিম্পফনিতে আমার ঈশ্বর বেঁচে থাকে, ভ্যান গগের রঙে সে প্রতি মুহূর্তে প্রাণ ফিরে পায়। আবার, এলিমেন্টরি পার্টিকেলের স্ট্যান্ডার্ড মডেলই আমার ঈশ্বর, বোসন আর ফার্মিয়ন কণা দিয়ে সে তৈরি হয়েছে। মেহনতি মানুষের হাতুড়িতে, প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠস্বরে আমার ঈশ্বর স্থান পেয়েছে।

আমার ঈশ্বর প্রশ্ন করতে শেখায়, প্রতিবাদ করতে শেখায়। ব্রুনোকে যেদিন ধর্মের পিশাচেরা জীবন্ত পুড়িয়ে মারে, সেদিন আমি আমার ঈশ্বরকে পুড়তে দেখেছিলাম, চে র

গুলি বিদ্ধ ছিন্ন-ভিন্ন নিথর দেহে আমি আমার ঈশ্বরের মৃত্যু দেখেছিলাম। কিন্তু, আমার ঈশ্বর রক্তবীজ। একটা প্রতিবাদী স্ফুলিঙ্গ থেকে সে নব রূপে উজ্জীবিত হয়। আমার ঈশ্বর ধর্মের মাকড়সার জালে আটকে থাকতে শেখায় না, সে চিন্তার মুক্ত আকাশে যুক্তি দিয়ে সব কিছু বিচার করতে শেখায়। আমার ঈশ্বর শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন, ধর্মহীন সমাজের প্রতীক।

আমি আস্তিক, আমি আমার ঈশ্বরে বিশ্বাসী। আমার ঈশ্বর, আমার চেতনা।

> "ধর্মকে আসলে স্রেফ ভাইরাস হিসেবেই চিহ্নিত করা প্রয়োজন। ধর্মের সংক্রমণ, পুনরুৎপাদন এবং প্যারাসাইটিক বৈশিষ্ট্যগুলো কেবল ভাইরাসের মধ্যেই দেখা যায়। এমনকি ভাইরাসের চিকিৎসার ব্যাপারটিও ধর্মের সাথে অনেকটাই মেলে।
> (বিশ্বাসের ভাইরাস)"
>
> — অভিজিৎ রায়

# সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ধর্ম কী?

-পার্থ প্রতিম পাল

ধর্ম একটি মানবীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এটি মানুষের কিছু জীবন জিজ্ঞাসার জবাব দেয়ার চেষ্টা করে যা সে অন্য কোন স্থান থেকে পায়নি বা পাবার চেষ্টা করেনি। এই জগৎ অতিপ্রাকৃতের জগতের উপর নির্ভরশীল না হলেও, মানুষের বিশ্বাস, চিন্তা ও কাজ প্রতিক্ষেত্রে না হলেও অনেকক্ষেত্রেই অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস, বস্তু বা চিন্তার উপর নির্ভরশীল।

**অতিপ্রাকৃতের এই প্রভাব আদিম বা বর্তমানকালের মানুষের জীবনযাত্রায় এমনিভাবে জড়িয়ে আছে যে কোথায় এর শুরু, কোথায় শেষ, কোথায় তা প্রকৃতিকে অতিক্রম করে অতিপ্রাকৃতে পৌঁছে গেছে তা নির্ধারণ করা কঠিন।**

এটি মানুষের সমাজজীবনে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে সমাজকে ছেড়ে ধর্ম ও ধর্মকে ছেড়ে সমাজকে অনুধাবন করা যায় না। ধর্মের সাথে মানুষের সম্পর্ক অনেক গভীর। সমাজবিজ্ঞান তাই ধর্ম কী, ধর্মের উদ্ভব কিভাবে হয়েছে, ধর্মের ফাংশন কী, বর্তমান সমাজে ধর্মের ভূমিকা কী, মানব জীবনে এর ভূমিকা কী এসব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করে। তবে সেইসব প্রশ্নে যাবার আগে সমাজবিজ্ঞানের চোখে ধর্ম কী, ধর্মের দিকগুলো কী, ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলো কী তা জানা দরকার।

মূল তালিকা—ধর্মের সংজ্ঞাধর্মের ৭টি ডাইমেনশন বা দিকধর্মগুলোর মধ্যকার সাধারণ বৈশিষ্ট্যতথ্যসূত্র

ধর্মের সংজ্ঞা—

শব্দের ব্যুৎপত্তি – ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ religion, যা ল্যাতিন থেকে এসেছে, যা ব্যক্তিজীবনের তথা জাতীয় জীবনের সমার্থ সংগতি আনে তাই ধর্ম। ধৃ ধাতুর সাথে মন প্রত্যয় যোগে সংস্কৃতিতে ধর্ম শব্দের উৎপত্তি। আদিম সমাজের নিয়ান্ডার্থাল মানুষ থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত সর্বত্র একটি অন্যতম মৌল সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্ম তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। ধর্ম একটি প্রাচীন

প্রতিষ্ঠান, কোন ধর্ম একেশ্বরবাদী, কোনটা বহুঈশ্বরবাদী, আবার কোনটায় ঈশ্বর অনুপস্থিত, কোনটা আত্মায় বিশ্বাসী। তাই ধর্মের সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। নৃবিজ্ঞানী ই. বি. টেইলর বলেন, ধর্ম হল অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস। ইয়ঙ্গার (Yinger) বলেন, ধর্ম হল আবেগ, বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার ও অভ্যাসের এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একদল লোক মানব জীবনের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যার সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করে। ফ্রেজার তার The Golden Bough গ্রন্থে বলেন, ক্ষমতা বা শক্তির আকাঙ্ক্ষা, মানুষের চেয়ে মহৎ যা মানুষের জীবনকে প্রকৃতির অভিশাপ থেকে রক্ষা করে তাই ধর্ম। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ডুর্খেইম তার The Elementary form of Social Life গ্রন্থে বলেন, ধর্ম হচ্ছে পবিত্র জিনিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত আচার-ব্যবহার ও বিশ্বাসের একটি সমন্বিত পদ্ধতি। নৃবিজ্ঞানী লৌঈ (Lowie) তার Primitive Religion গ্রন্থে ধর্মকে অসাধারণ ভীতিপ্রদ সত্তার প্রতি মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া বলে মনে করেন। তিনি তার সংজ্ঞায় অতিপ্রাকৃতের সাথে মানব মনের বিশেষ প্রতিক্রিয়ার কথা বলেছেন। এম রেভাইলের মতে, ধর্ম হচ্ছে রহস্যাবৃত মনের

সাথে মানব মনের সম্পর্ক সৃষ্টির ভাবানুভূতিগত বন্ধনের নির্ধারণী।

বিশ্ব ও ব্যক্তির উপর উক্ত শক্তির প্রভাবকে ব্যক্তি স্বীকার করে নেয় ও সে মহাত্মার সাথে নিজের সম্পর্কের কথা ভেবে ব্যক্তিমন পুলকিত হয়। কার্ল মার্ক্স বলেন, ধর্ম জনগণকে তন্দ্রাবিষ্ট করে রাখে। মানে এখানে ধর্ম মানুষেরই সৃষ্টি, কিন্তু আসলে এটি সমাজ ও রাষ্ট্রের সৃষ্টি যা ব্যবহৃত হয় মানুষকে মোহগ্রস্ত ও নিয়ন্ত্রণের জন্য। সমাজবিজ্ঞানী গেলেস (Gelles) তার An Introduction to Sociology গ্রন্থে বলেন, ধর্ম হল এমন একটি প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাস ও চর্চা যা জীবনের নির্দিষ্ট অর্থের সাথে সম্পর্কিত। ধর্ম ঐশ্বরিক, অতিপ্রাকৃত ও অর্থপূর্ণ নীতিমালার উপর ভিত্তি করে সামাজিক আচরণের জন্য একটি নকশা তৈরি করে। মানুষ কেন ধর্ম বিশ্বাস করে তা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা ও বিতর্ক আছে। নৃবিজ্ঞানী ব্রনিস্লাউ ম্যালিনস্কির মতে, ধর্ম হল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতার মধ্যকার শূন্যস্থান পূরণের প্রক্রিয়া। জগতের ঘটনাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার মত মানুষের ক্ষমতা সীমিত। অহরহ দুর্ঘটনা ঘটছে, অদৃশ্য একধরণের শক্তি মানুষ, মাটি, বায়ু, জল সবকিছুকে ধ্বংস করছে।

মানুষের তৈরি ও আবিষ্কৃত কোন প্রযুক্তি আবহাওয়া, জলবায়ু, ভূমিকম্প নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না, অকালমৃত্যু থামাতে পারছে না। ধর্ম মূলত এসব জীবন-অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির সাথে মানুষকে খাপ খাওয়ানোর সামর্থ তৈরি করতে প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য দিয়েছে। সমাজবিজ্ঞানী ট্যালকট পারসন্স (১৯৫২) এর মতে, ধর্ম হল সামাজিক প্রত্যাশাসমূহের সাথে অভিজ্ঞতার শূন্যস্থান পূরণের একটি প্রক্রিয়া। প্রতিটি সমাজে কম বেশি দেখা যায়, সামাজিক প্রত্যাশাগুলো প্রায় সময়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, দুঃখ ও বঞ্চনা অযাচিতভাবে প্রসারিত হচ্ছে, মাঝেমাঝে নীতি বহির্ভূত কাজ বা নৈতিক মূল্যবোধ লঙ্ঘনকারী গোষ্ঠী বা প্রক্রিয়া পুরস্কৃত হয় ও অসাধারণ অর্জনগুলো ব্যক্তিগত প্রবঞ্চনা বা হার ও পরাজয়ের কারণে অবসান হয়। ধর্ম এসব দুঃখকষ্ট ও অনৈতিক কাজগুলোকে ঐশ্বরিক বা অতিপ্রাকৃত শক্তির পরিকল্পনা বা অংশ হিসেবে মানুষের কাছে ব্যাখ্যা প্রদান করে। নৃবিজ্ঞানী ক্লিফর্ড গিরটজ এর মতে (১৯৬৫), মানুষ যখন তার বিশ্লেষণমূলক ও নৈতিক দূরদৃষ্টি দ্বারা কোন ঘটনাকে বা ঘটনাসমূহকে বিচার-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়না, তখন সে সীমাবদ্ধতা ও টেনশন থেকে মুক্তি পাওয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়টির উপর

নির্ভর করে তা হল ধর্ম। তিনি বলেন, মানুষকে বুঝতে বা উপলব্ধি করতে হবে যে, বিশ্ব একটি যৌক্তিক কাঠামো বা প্রক্রিয়া। এখানে প্রতিটি ঘটনার পিছনে এক বা একাধিক কারণ আছে। ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, ধর্ম 'অর্থের সমস্যাসমূহ' নিয়ে কাজ করে ও এক্ষেত্রে একটি প্রেষণাদায়ী হিসেবে কাজ করে। ধর্মাচরণের সবচেয়ে পুরনো নিদর্শনের বিষয়ে জানতে হলে আমাদেরকে ৫০০০ বছর পেছনে যেতে হবে। ইউরোপ, পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়া, নেদারল্যান্ডস এর মানুষেরা কোন মৃতদেহ কবরস্থ করলে সাথে বেশ কিছু যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও দরকারি জিনিসপত্র দিয়ে দিত। তারা বিশ্বাস করত, মৃত্যুর পর আরেকটি জগৎ আছে যেখানে এগুলোর দরকার পড়বে। ঐতিহাসিক রেকর্ড ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে, বিশ্বের প্রতিটি গোষ্ঠী, ব্যক্তি, মানুষের বিভিন্ন ধর্ম আছে। আর এই ধর্ম বিশ্বাস ও চর্চা একে অন্য থেকে স্বতন্ত্র ও আলাদা।

কোন ধর্ম বিশ্বাস পূর্বপুরুষকেন্দ্রিক, কোনটি আবার অতিপ্রাকৃত শক্তি, কোনটি দেব-দেবী ও অসংখ্য দেবতাকে ও কোনটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ছন্দময়তাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়। এভাবে ধর্মবিশ্বাস স্থান-কাল-পাত্রভেদে পরিবর্তিত হয়।

ধর্মের ৭টি ডাইমেনশন বা দিক—

স্কটিশ লেখক ও সেক্যুলার রিলিজিয়াস স্টাডিজের অগ্রদূত নিনিয়ান স্মার্ট ধর্মের ৭টি দিক বা ডাইমেনশনের কথা উল্লেখ করেন, যা প্রত্যেকটি ধর্মের মধ্যেই দেখা যায় –

১। Practical and ritual dimension:

ধর্মের মধ্যে আরাধনা, প্রার্থন্যা এসব রিচুয়াল ডাইমেনশন বা আচারগত দিক আছে। ধর্ম থাকলে ধর্মীয় আচার থাকবে, কারও বা কোনকিছুর উদ্দেশ্যে প্রার্থনার ব্যাপারও থাকবে।

২। Experiential and emotional dimension:

এইসব আচার ও প্রার্থনার পেছনে থাকে মানসিক চাঞ্চল্য উদ্রেককারী উপাদান, যা হল ধর্মের এক্সপেইয়েনশিয়াল ও ইমোশনাল ডাইমেনশন, অর্থাৎ অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক বা আবেগগত দিক। ধর্ম মানুষের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও আবেগের সাথে সম্পর্কিত হয়। মানুষ ধর্মীয় বিষয়গুলোকে যেমন ঈশ্বরকে অনুভব করার জন্য তার ভেতরের অভিজ্ঞতা ও আবেগকে ব্যবহার করে।

৩। Narrative and mythic dimension:

ধর্মের একটি ন্যারেটিভ বা মিথিক ডাইমেনশন আছে, মানে একটি আখ্যানগত বা পৌরাণিক দিক আছে। যেমন

ইহুদিধর্মে নোয়াহ এর বন্যার কাহিনী, খ্রিস্টধর্মের ইডেনের কাহিনী ইত্যাদি। ধর্ম বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে যার জন্য এইসব আখ্যান বা পুরাণের আবির্ভাব হয়। আবার অনেক পূর্বে তৈরি হওয়া কোন কাহিনী, ঘটনা কালক্রমে বিভিন্ন ধর্ম নিজেদের মধ্যে এডপ্ট করে নেয় ও তা নিজের কাজে লাগায়। ধর্মগুলোর অনেক আচারেই এইসব আখ্যানের প্রতিফলন দেখা যায়।

৪। Doctrinal and philosophical dimension:

ধর্মে একটি ডক্ট্রিনাল এন্ড ফিলোসফিকাল ডাইমেনশন অর্থাৎ তাত্ত্বিক ও দার্শনিক দিক আছে। ধর্মগুলোকে জগতের পরমসত্তা কী, ঈশ্বরের স্বরূপ কী, আত্মা কী, চেতনা কী, মানুষের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক কী, ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ কী – এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়, আর তা খুঁজতে গিয়ে এগুলোকে ধর্মদর্শন তৈরি করতে হয়, অথবা ইতিমধ্যে কারও দর্শনচিন্তাকে এডপ্ট করে নিতে হয়।

৫। Ethical and legal dimension:

ধর্মগুলো মানব নৈতিকতার ধারক ও বাহক হতে চায়। এটি মানুষের নৈতিক ও আইনি ধারণায় এতটাই প্রভাব বিস্তার করে যার ফলে মানুষ মনে করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর

বাণীই হল নৈতিক, আর যা যা এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে যায় তাই অনৈতিক। ধর্ম তার নিজের মত করে মানুষের মধ্যে বিশেষ মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে চায়। আইন ও নৈতিকতার সাহায্যে এটি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সম্পর্কিত করে কোন কাজকে জাস্টিফাইড বা আনজাস্টিফাইড বলে দাবি করে। এগুল হল ধর্মের নৈতিক ও আইনি দিক।

৬। Social and institutional dimension:

ধর্ম সমাজেরই একটি অংশ, মানুষও সমাজের অংশ যাকে ধর্ম প্রভাব ফেলতে চায়। ছোট থেকে বড় হতে মানুষের যে সামাজিকীকরণ বা সোশ্যালাইজেশনের প্রয়োজন হয় সেখানে ধর্মের ভূমিকা থাকে। মানুষের যে সামাজিক চাহিদাগুলো আছে সেগুলো ধর্ম পুরণ করে থাকে। চার্চ, মসজিদ, মন্দিরের মত স্থানে সোশ্যাল গ্যাদারিং এর ব্যবস্থা করে এটি মানুষের সামাজিকতার চাহিদা মেটায়, কোন সামাজিক সংকটের কালে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো চেষ্টা করে তাদের স্ট্রেস কমাতে ও কোন দিক নির্দেশনা দিতে, বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মগুলো মানুষের বিনোদনের চাহিদাও পুরণ করে। এছাড়া ধর্ম মানুষকে একরকম সেন্স অফ আইডেন্টিটি দান করে।

এই বিশেষ আইডেন্টিটির জন্য মানুষ নিজের মানুষ পরিচয়ের আগে নিজেকে একজন হিন্দু, একজন মুসলিম, একজন খ্রিস্টান হিসেবে চেনে। ধর্ম এই আইডেন্টিটি দানের মাধ্যমে নিজের ধর্মীয় আইডেন্টিটির সাথে মিলে যায় এমন মানুষকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতে শেখায়, তাদেরকে আপন ভাবতে শেখায়, আর যাদের ধর্মীয় আইডেন্টিটি তার আইডেন্টিটির সাথে ম্যাচ করে না তাদেরকে পর ভাবতে শেখায়। এগুলো ধর্মের সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দিক।

৭। Material dimension:

ধর্মের মেটারিয়াল বা বস্তুগত দিকও আছে। ধর্মগুলো কোন নির্দিষ্ট বিল্ডিংকে পবিত্র বিল্ডিং বা দালান বানিয়ে রাখে, যেমন মন্দির-মসজিদ। এটি কোন শিল্পকে পবিত্র শিল্প বানিয়ে রাখে, কোন কোন চিহ্নকে বানিয়ে রাখে পবিত্র চিহ্ন, কোন কোন গ্রন্থকে বানিয়ে রাখে পবিত্র গ্রন্থ। এইসব বিষয়ে ধর্ম পবিত্রতা আরোপ করে অন্যান্য বিষয়ের সাথে, জনসাধারণের সাধারণ বিষয়গুলোর সাথে বিচ্ছিন্ন করে রাখে যা সেই পবিত্রতার উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনেরই শর্ত হিসেবে কাজ করে। আর এইসব পবিত্র বস্তুগুলো যারা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের ব্যক্তিত্বের সাথেও জুড়ে যায় পবিত্রতা,

তাদের বাণীও হয়ে ওঠে পবিত্র। এগুলো হচ্ছে ধর্মের বস্তুগত দিক বা মেটারিয়াল ডাইমেনশন।

ধর্মগুলোর মধ্যকার সাধারণ বৈশিষ্ট্য—

নিয়েলস নিয়েলসেন তার রিলিজিয়ন্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড গ্রন্থে ধর্মগুলোর মধ্যকার ১৩টি সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন-

১। অধিকাংশ ধর্ম অতিপ্রকৃতিকে (spirits, gods, God) বিশ্বাসএর অন্তর্ভূক্ত করে বা কিছু বাস্তবতার আড়ালের কোন শক্তিকে বিশ্বাস করে যা মানব জ্ঞানের ও অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে, কিন্তু মানুষ এগুলোর সাথে একরকম সম্পর্ক অনুভব করে।

ক) হিন্দুরা ৩৩ কোটি দেবদেবীতে বিশ্বাস করে, কিন্তু আবার তারা পরম ব্রহ্ম নামে এক চূড়ান্ত সত্তা বা আল্টিমেট রিয়ালিটিতেও বিশ্বাস করে।

খ) খ্রিস্টানরা একেশ্বরে বিশ্বাস করলেও ত্রিত্ব বা ট্রিনিটিতে বিশ্বাস করে, আবার মুসলিমরা একেশ্বরবাদী হলেও তাদের মধ্যে ত্রিত্বে বিশ্বাস নেই, কারণ তারা একে বহুঈশ্বরবাদের ঝুঁকিসম্পন্ন বলে ভেবে থাকে।

২। ধর্ম সময়, স্থান, বস্তু ও মানুষের প্রেক্ষিতে পার্থিব বা সাধারণ বস্তু ও পবিত্র বস্তুর মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি

ক) মুসলিমদের কাছে মক্কার গুরুত্ব আর মিলওয়াইকী (আমেরিকার একটি শহর যা বিয়ার ইন্ডাস্ট্রির জন্য বিখ্যাত) শহরের গুরুত্ব এক নয়।

খ) খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারে ক্রিসমাস আর ইস্টার অন্যান্য দিনের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

৩। ধর্মের জন্য অনুমোদিত আচারিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজন হয়, যা ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সদস্যরা বিশ্বাসের সাথে পালন করে।

ক) এই আচার মানুষের জন্ম, মৃত্যু ও জীবনচক্রের সাথে জড়িত, যা সব ধর্মেই দেখা যায়।

খ) অধিকাংশ ধর্ম পবিত্র কিছু কাহিনী বা ঘটনাকে তুলে ধরে বাৎসরিকভাবে উৎসবের সাথে সেগুলো পালন করে।

৪। ধর্ম সাধারণভাবে একটি নৈতিক বিধিবিধান বা নৈতিক নীতিমালা প্রদান করে যা ব্যক্তি বা সমাজ বাধ্যবাধকতার সাথে মেনে চলে।

ক) বাইবেলের ক্ষেত্রে টেন কমান্ডমেন্টস, ইসলামের ক্ষেত্রে শরিয়ত আইন এর উদাহরণ।

খ) বৌদ্ধরা গৌতম বুদ্ধের পথ অনুসরণ করে।

৫। ধর্মীয় জীবন একটি সাধারণ আবেগগত ও অন্তর্জ্ঞানলব্ধ আনবিক অনুভূতি প্রদান করে।

ক) এই অনুভূতির মধ্যে আছে আশ্চর্যবোধের অনুভূতি, রহস্যময়তার অনুভূতি, আনন্দের অনুভূতি, অপরাধবোধের অনুভূতি, সম্প্রদায়গত বন্ধনের অনুভূতি।

খ) ধর্মীয় প্রার্থনাগুলোতে প্রায়ই অনুসারীদেরকে অপরাধবোধের জন্য ও ক্ষমা ভিক্ষা করতে বলা হয়, একই সাথে আনন্দ ভোগ করতে ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করতেও বলা হয়।

৬। ধর্ম মানুষের সাথে ঐশ্বরিকতার যোগাযোগকে উৎসাহিত করে, আর এই যোগাযোগের জন্য অনুসারীকে পথপ্রদর্শন করে।

ক) ইহুদি, মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে একক ও সমন্বিত প্রার্থনা লক্ষ্য করা যায়।

খ) হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে এই ঐশ্বরিকতা প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন রকমের ধ্যানের উপায় বলা হয়েছে।

৭। পবিত্র কাহিনীর মাধ্যমে ধর্মগুলো একরকম সঙ্গতিপূর্ণ বা সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানের চেষ্টা করে।

ক) বিভিন্ন রকম ক্রিয়েশন মিথ বা সৃষ্টিপূরাণ তৈরি করে বিশ্বজগৎ কিভাবে তৈরি হল, মানুষ সহ অন্যান্য প্রাণীদের উদ্ভব কিভাবে হল এগুলোর 'যৌক্তিক' উত্তর দেবার চেষ্টা করা হয়।

খ) অনুসারীদেরকে ধর্মীয় নেতাদের জীবনী পড়ানো বা শেখানো হয়, আর তার মাধ্যমে তাদেরকে 'সঠিক', 'কল্যানকর' ও 'পরিপূর্ণ' জীবনযাপনের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়।

৮। ধর্ম এর অনুসারীদের জীবনকে অরগানাইজ বা সংগঠিত করে বা করতে চায়, যার মাধ্যমে মানুষের উপর আরোপ করে পোশাক পরার বিধিবিধান, খাদ্যাভাসের বিধিবিধান, পেশাবিষয়ক বিধিবিধান, ও সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার বিধিবিধান।

ক) একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে গেরুয়া রঙ এর পোশাক পরতে হয়, মাথা নেড়া বা মস্তকমুণ্ডন করতে হয়।

খ) মুসলিম নারীদের উপর হিজাব পরা বা পর্দা অনুসরণ করার বিধান আছে।

৯। ধর্মের প্রয়োজন হয় সামাজিক সংগঠনের ও প্রাতিষ্ঠানিক আকারগুলোর যার সাহায্যে এটি প্রার্থনার জন্য, ক্ষমতার

জন্য, জনসাধারণের মধ্যে ধর্মশিক্ষা প্রদানের জন্য, ধর্মীয় আচারগুলো টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পাদন করতে পারে।

ক) প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানদের পোপ নেই, সুন্নি মুসলিমদের নেই আয়াতুল্লাহ খোমেনির মত সুপ্রিম রিলিজিয়াস লিডার (যা শিয়াদের আছে)।

খ) কিন্তু সব সম্প্রদায়েরই ধর্মীয় কার্যক্রম আছে, ও আছে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।

১০। জীবনে উত্থানপতন থাকলেও ধর্ম অনুসারীদের মধ্যে একরকম অন্তঃস্থ শান্তি (Inner peace), সামঞ্জস্যতা বা সমন্বয়ের (Harmony) প্রতিশ্রুতি দেয়।

ক) বস্তুগত অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এমন কোন অর্থ খুঁজে পেয়ে অনেক সময় বিশ্বাসীরা তাদের জীবনের বিভিন্ন রোগ, শোক, অবিচার প্রভৃতি বাধাকে জয় করে।

খ) যেসব ধর্ম অনেক বছর ধরে শত শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও টিকে আছে সেগুলো তার অনুসারীদেরকে আশা ও জীবনের বিশেষ রকমের অর্থ প্রদান করে।

১১। কষ্টভোগ (suffering) ও দয়া (compassion) বেশিরভাগ ধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

১২। ধর্ম নতুন যুগের বা পরকালের মাধ্যমে ভবিষ্যতের একটি আশা প্রদান করে।

ক) বেশিরভাগ ধর্ম মানুষকে আশা দেয় যে ভবিষ্যতে কোন ঐশ্বরিক ব্যক্তি আসতে চলেছেন যিনি মানবজাতির দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটিয়ে একটি শান্তির নতুন যুগে নিয়ে যাবে – যেমন ইহুদি ধর্মে মেসিহা, যিশুর দ্বিতীয়বার ফিরে আসা, বিষ্ণুর অবতার কল্কির আগমন, বুদ্ধের শেষ প্রকাশ ইত্যাদি।

খ) অনুসারীদেরকে স্বর্গ বা নতুন পৃথিবী, বা শারীরিক অস্তিত্বের ঊর্ধ্বের কোন অবস্থা যেমন মোক্ষ লাভের মধ্য দিয়ে সুন্দর ভবিষ্যতের আশা প্রদান করা হয়।

১৩। ধর্মগুলোকে ধর্মের মধ্যে নতুন নতুন সদস্যের অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে ও বিশ্বাসীদের মধ্যে সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে এর প্রসারকে নিশ্চিত করতে হয়।

ক) বৌদ্ধধর্ম, খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম হল বিশ্বের মূল তিন মিশনারি ধর্ম যেগুলো অন্য ধর্মের লোকেদেরকে তাদের ধর্মে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করে।

খ) বেশিরভাগ ধর্ম তাদের অনুসারীদের মধ্যে সন্তান উৎপাদনকে উৎসাহিত করে যা সেই ধর্মের নতুন সদস্যদের আগমনের প্রাথমিক উৎস্য।

# আমাদের ন্যায়পালিকা: তিস্তা থেকে বিলকিস

-জাহিদ রুদ্র

একটা রাষ্ট্রের জাতীয় দিবস তার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ আর এর মধ্যে যদি স্বাধীনতার ৭৬তম বর্ষ উদযাপন হয় তো এর মাহাত্ম্য কতটুকু হতে পারে বোঝতেও পারছেন। এরমানে দেশ কতটা এগোচ্ছে এর একটা প্রমাণ আমরা ওয়াকিবহাল। নির্দিষ্ট শ্রেণীর কয়েকজন কারাবন্দীদের মুক্ত করে দেয়া কোন ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়। ভারতীয় আইনে এই ধরনের ব্যবস্থা আছে। গৃহ বিভাগ সচিব, আইন বিভাগের সচিব এবং কারাগার বিভাগের জ্যেষ্ঠ ব্যাক্তিদ্বয়ের প্রস্তুত করা তালিকা মন্ত্রীসভাতে অনুমোদিত হওয়ার পর রাজ্যপালের কাছে প্রেরণ করা হয়। সেই তালিকাতে রাজ্যপাল সন্মতি জানালে তবেই তালিকাভুক্ত সকল কারাবন্দী মুক্তি পাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। এই তালিকাতে ভয়ংকর অপরাধীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না এবং নির্বাচিত সকল কারাবন্দীদের সেলে থাকা সময়ের আচার-আচরণ (বিশেষভাবে বিগত তিন বছরের)

সন্তোষজনক হতে হব। উল্লেখিত সময়ে অসদাচরণের জন্য তাদেরকে আলাদা কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে এমন নয়।

এইবার স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহ বিভাগ এমনি এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রাজ্য সরকারের কাছে আবশ্যকীয় নির্দেশিকা প্রেরণ করে। বন্দীমুক্তির এই ব্যবস্থা চলতি বছরের ১৫ আগষ্ট, আগামী বছরের ২৬ জানুয়ারি এবং ১৫ আগস্টের ভিতরে কার্যকরি করতে হবে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, গৃহ বিভাগের নির্দেশাবলীতে মুক্তির জন্য নির্বাচিত কারাবন্দীদের মধ্যে হত্যাকারী এবং ধর্ষণকারী থাকতে পারবে না বলেও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে।

কিন্তু এই নির্দেশাবলীর অহেতুক সুবিধা নিয়ে গুজরাট সরকার প্রথম খেউয়ে যে ১১জন লোককে মুক্তি করে দেয়, সমগ্র দেশবাসীর চোখ কপালে তুলতে তারা সফল হয়। পিএম মোদী স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার মানসিকতা গড়ে তুলতে আহ্বান জানানোর কিছু সময়ের পরই এই গুরুতর কয়েকটি

অপরাধীদের মুক্তি করে দেয়া হয়। তার থেকেও বিস্ময়কর এবং উদ্বেগজনক কথাটা হ'ল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মকর্তারা তাদেরকে কারাগারের সম্মুখে মিষ্টিমুখ করিয়ে দেয়, তিলক লাগানো হয়, পা স্পর্শ করে সম্মান জানানো হয়। কথাটা বিস্ময়কর এবং উদ্বেগজনক বলে একারণেই বলছি যে

**সেই সকল কারাবন্দীরা কোনো রাজনৈতিক বন্দী ছিল না, দেশ তথা জনতার হিতে সংগ্রাম করে দণ্ডিত করা হয় নি। তারা ছিলেন হত্যাকারী এবং ধর্ষণকারী**

অথচ গৃহ বিভাগের নির্দেশাবলীতে উল্লেখ আছে, হত্যাকারী এবং ধর্ষণকারীকে মুক্তির তালিকায় সন্নিবিষ্ট করতে দেয়া হবে না। ২০০২ সনের গুজরাটের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে সেই ১১জন বেকসুর খালাসীরা বিলকিস বানো নামের ইসলাম ধর্মীয় পাঁচ মাসের অন্তসত্ত্বা এক মহিলাকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করেছিল। কেবল বিলকিস কে ধর্ষণ করাতে এরা

থেমে থাকেনি, তার চোখের সম্মুখেই তার তিন বছরের কন্যা সন্তান সালেহা কে হত্যা করার পরও পরিবারের আরও সাতজন লোকের হত্যা করা হয়েছিল। এরা যে কতটা ভয়ংকর অপরাধী, তা বলে জানানোর আবশ্যকতা নাই।

যাইহোক, কেন্দ্রের গৃহবিভাগ সমগ্র দেশের জন্য জারি করা নীতি গুজরাট সরকার বুড়ো আঙুল দেখিয়ে পদদলিত করে উক্ত দুর্ধর্ষ অপরাধীদের সসম্মানে মুক্ত আকাশের নিচে বাহির করে আনার সাহস করলো কিভাবে? উল্লেখ্য যে এই ১১জন কারাবন্দীর মধ্যে একজন বন্দী, যে ইতিমধ্যে ১৫ বছর কারাবাসের সাজা কাটাচ্ছিল, তা লাগব করার উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আবেদন দাখিল করেছিল। সেই আবেদনের ভিত্তিতে ন্যায়ালয় গুজরাট সরকারকে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তির বিষয়টি বিবেচনা করার নির্দেশ দিয়েছিল। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সেই নির্দেশের উপর আমল করে গুজরাটের বিজেপি সরকার বাকী ১০জন লোককে মুক্তি দিয়ে দেয়।



ইতিহাসের পাতায় গুজরাট সরকারের এহেন কার্য নিশ্চয় কোনো সোনালী অক্ষরে লিখা থাকবে না বরং স্বাধীনতার

অমৃত মহোৎসব বর্ষে এই ঘটনা কলংকিত করে রাখবে। কলংকিত করে রাখবে, কারন রাজ্য সরকারের এই কু-কার্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পরোক্ষ সমর্থন আছে বিজ্ঞ মহলে চর্চিত। সমর্থন আছে এজন্যই কেন্দ্রের জারি করা নীতি উলংঘন করে রাজ্য সরকার যে কার্য সংঘটিত করেছে, কেন্দ্রীয় সরকার তার বিরুদ্ধে একটা কিছু লিখিত বা অন্তত একটা কথাও আজ পর্যন্ত বলে নাই দেশবাসীর প্রতি সম্বোধন করে। দেশের অগণিত মানুষ গুজরাট সরকারের এইকাজের প্রতিবাদে সবর হয়ে উঠেছে দেখেও কেন্দ্রীয় সরকার এখনও নির্বিকার হয়ে আছেন। উনাদের মৌনতা এই কথার স্পষ্ট আভাস দেয় যে বিলকিস বানো তথা তার পরিবারের মধ্যে আসতে পারে সম্ভাব্য দুশ্চিন্তা এবং বিপদ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার একদমই উদ্বিগ্ন নয়, বরং আম আদমি পার্টির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা তাদের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। একজন সোসিয়াল এক্টিভিস্ট বলেন 'সম্ভবত গোধরা বিধায়ক সি কে রাহুলের .. they are Brahmins. Anyway, the sanskar of Brahmins is very good." এই মন্তব্য আপ্তবাক্য রূপে মোদী-শাহ অন্তস্থল থেকে বিশ্বাস করেন। উল্লেখযোগ্য যে, সাজা লাগব করা

পর্যালোচনা সমিতিতে রাহুল জি'র ছাড়াও আরও একজন মহিলা বিধায়িকা সুমন চৌহান ও ছিলেন !'

সম্প্রতিকালে ভারতের ন্যায়ব্যবস্থা নিয়ে যে সকল অবাঞ্ছিত প্রশ্নের অবতরণ হয়েছে, বিলকিস বানোর ঘটনাই সব 'দুধ কা দুধ, পানি কা পানি' হয়ে গেছে। এর আগে তিস্তা সিতালভাড় এবং শ্রীকুমারকে নিয়ে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে দেয়া রায়ের বিষয়ে বিভিন্ন লোক ভারতীয় বিচার ব্যবস্থাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তুলেছেন। অবশ্য দুই একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ন্যায় ব্যবস্থাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা দুর্ভাগ্যজনক। আমাদের ন্যায়লয়ের উপর আমার আস্থা আছে এবং তা রাখতে হবে। যদিও কয়েকটি রায় ন্যায়ালয়ের মর্যাদা অবনমিত করেছে বলে অনেক লোকের মন্তব্য। এমনকি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রাক্তন বিচারপতি এবং জ্যেষ্ঠ আধিকারিকের কাছ থেকেও মন্তব্য শোনা যায়। তিস্তা সিতালভাড় এবং শ্রীকুমারের বিষয়টি আন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়েও তোলপাড় শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দেশের বিশ্ববরণ্য কিছু ভালো মানুষ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়কে অনুরোধ জানিয়ে এইবলে আবেদন দাখিল করেছে যে স্বতস্ফূর্ত উদ্যোগ নিয়ে ন্যায়ালয়ে সিতালভাড় এবং শ্রীকুমারের কেইস দুটো তাৎক্ষণিকভাবে রফা-দফা করতে হবে। এই আবেদনে

সকল স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন—— ব্রিটিশ সাংসদ এবং রাজনৈতিক তত্ত্ববিদ ভিখু পারেথ, ভাষাতত্ত্ববিদ তথা স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কি, ভারতীয় মূলত আমেরিকান নৃতত্ত্ববিদ অর্জুন আপ্পাডুরাই, মার্কিন রাজনৈতিক তত্ত্ববিদ ওয়েণ্ডি ব্রাউন, ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত পণ্ডিত শেল্ডন পল ক., অর্থনীতিবিদ রবার্ট পলিন, দার্শনিক কেওল বরেন, চার্লস টেইলব, মার্কা নুসবাউম, আকিল বিলগ্রামী আরও অন্যান্য। এর দ্বারা দুটো কথা স্পষ্ট হয়। এক, এতো দিন ধরে আমাদের সরকারের — "ভারতের ন্যায়পালিকা স্বতস্ফূর্ত'— কথাগুলোর আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। দুই, ন্যায়পালিকাকে প্রহসনমূলক করার ক্ষেত্রে বিজেপি সরকারের ভূমিকা সুস্পষ্ট।জরুরীকালীন অবস্থায় ইন্দিনা গান্ধী ন্যায়পালিকাকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করেন নি, কিন্তু সাম্প্রতিক কালে ন্যায়পালিকার গতি-বিধি জরুরী কালীন অবস্থা কে তুচ্ছ করে তোলেছে।

এখনও আমাদের দেশে জরুরিকালীন অবস্থা জারি করা হয়নি। যদিও এর আবশ্যকতাও নেই। কারণ ফ্যাসিবাদ ঘোষণার মাধ্যমে ইহা আসে না, এটা আসে হস্তক্ষেপে একজনে দুজনের ভাগ আত্মসাৎ করার জন্য। ইতিমধ্যে

আমার ঘটি, লোটা, বাটি আমার বহু বস্তু নেয়া হয়েছে। কিন্তু আমি অন্ন যোজনা, অরুণোদয়, সোনা রূপার মোহে বন্দী, আজমল মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আতংকে আক্রান্ত। একটা সময়ে আনোয়ারা তাইমুরও মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। আমরা এতোটাই অন্ধ হয়ে গিয়েছি যে পরনের কাপড়টা যেদিন হারাবো, সেইদিন আর রাজার বিরুদ্ধে বাহিরে এসে প্রতিবাদ করতে পারবো না। ইতিমধ্যে আমরা 'বইলিং ফ্রগ সিমড্রমে' আক্রান্ত হয়েছি।

> অযোগ্য শাসনকর্তার মতো দেশ ও জাতির বড় ক্ষতি আর কেউ করতে পারে না।

-এরিস্টটল

# ধর্মীয় মৌলবাদ আসলে কতটা ধর্মীয়?

-শ্রীকুমার মন্ডল

না মানে আমরা যদি ইতিহাস দেখি তাহলে ইসলামিক জঙ্গি গোষ্ঠী যেই সময় বেড়ে উঠছে ঠিক তার কাছাকাছি প্রায় একই সময়ে হিন্দু মৌলবাদ বা হিন্দুত্ববাদ বড় হচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশের বুকে। খ্রিস্টান মৌলবাদ আবার সেদিকে আমেরিকায় তৈরি হয়ে গেছে আগেই। আর ধর্ম



আলাদা হতে পারে, কিন্তু মৌলবাদের কনসেপ্টগুলো একই, "আমাদের ধর্ম বিপদে পড়েছে আর তাই আমাদের নিজেদেরকে নিজেদের ধর্ম রক্ষা করতে হবে।" তাহলে কি ধর্মীয় মৌলবাদ কি সত্যি ধর্মীয় না কি মৌলবাদের পেছনে অন্য কোনো মৌলিক কারন আছে যা সমস্ত ধর্মকে ব্যবহার করে মৌলবাদের মাধ্যমে নিজের কার্য সিদ্ধি করছে?

মৌলবাদ সাধারণত ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদ বা religious revivalism এর কারনে ঘটে থাকে, যেটা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ।

অর্থাৎ যখন সমাজ থেকে প্রিডোমিনেন্ট ধর্মীয় প্রভাব ও বিশ্বাস ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করে হয় আধুনিকতা বা নতুন ধর্মের প্রতি মানুষের আকর্ষণে বা অন্য কোনো কারণে, তখন

**ধর্ম ব্যবসায়ী, ধর্মীয় ঠিকাদার, ধর্ম রাজারা আবার সেই পুরোনো ধর্মকে ফিরিয়ে আনতে সমাজের স্বাভাবিক নিয়মে আশা প্রগতিশীলতার পথে বাধা দিতে চায়।**

ভারতীয় সংস্কৃতির ঠিকাদার, আমেরিকান সংস্কৃতির ঠিকাদার, আরব সংস্কৃতির ঠিকাদার টাইপের যেকোনো সমাজের প্রতিক্রিয়াশীলরাই আসল মৌলবাদী। অর্থাৎ কেউ যদি বলে যে এটা আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি, তাই আমাদের পালন করে চলা উচিত, তাহলে চোখ বন্ধ করে বুঝে নিতে হবে সে মৌলবাদী। তাহলে ধর্মীয় মৌলবাদ এখন জাতীয়তাবাদী মৌলবাদের রূপ নিয়েছে। আমরা আবার দেখলাম যে মৌলবাদ আলাদা ধর্মের মধ্যেও হয়,

আবার এমনকি জাতীয়তাবাদী মৌলবাদও হয়। এখন সমধর্মীয় রাষ্ট্র গঠন করার বহু প্রচেষ্টা হয়েছে, যেখানে মেজরিটি ধর্ম বিশ্বাসীরা মাইনরিটি ধর্মীয় বিশ্বাসীদের ওপর নিজেদের ইচ্ছে মতো অত্যাচার করে তাই জাতীয়তাবাদী মৌলবাদ পুরোটাই ধর্মীয় মৌলবাদের সঙ্গে জড়িত যদি না সেই জাতি বা রাষ্ট্র পুরোপুরি স্যাকুলার রাষ্ট্র হয়। এই যেমন ভারতীয় সংস্কৃতি মানে হিন্দু সংস্কৃতি ছাড়া আসলে কিছু না। যদিও ভারতে মুসলিমের সংখ্যা কম নয়, তবুও মুসলিম দের সংস্কৃতিকে ভারতীয় সংস্কৃতি বলেনা। মুসলিম দের সংস্কৃতি কে আরবীয় সংস্কৃতি বলে, তা সে হোক না ভারতীয় মুসলিম। ঠিক একই ভাবে আমেরিকায় চলে খ্রিশ্চিয়ান মেজরিটি সংস্কৃতি।

**অর্থাৎ পরিষ্কার ভাষায় মেজরিটি যার ক্ষমতা তার, সংস্কৃতি তার, মৌলবাদও তার। তাহলে মৌলবাদ কি ধর্মের ওপর নির্ভর করছে না কি ক্ষমতার ওপর?**

তাহলে আমরা আমেরিকায় যেখানে মৌলবাদের জন্ম তার ইতিহাসটা একবার যদি দেখি তাহলে আমরা দেখবো ঊনবিংশ শতকে যখন বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ আমেরিকা যাচ্ছে, তখন সেখানকার কনজারভেটিভ খ্রিশ্চিয়ান ইউরোপিয়ান আমেরিকানরা (যারা নিজেরাই অবৈধ বহিরাগত অনুপ্রবেশকারী) দেখলো যে বিভিন্ন কালচারের মিশ্রনের ফলে খ্রিস্টান মেজরিটি কালচার বিপদে পড়তে পারে। এই ভেবে তারা খ্রিস্টান ধর্মের 5টি অবশ্য করণীয় ডক্ট্রাইন (Doctrine) ওপর একটি লেখা প্রকাশিত করে, যার নাম দেয় "fundamentals"। আর এইখান থেকেই জন্ম হয় fundamentalism বা মৌলবাদের।

এই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে খ্রিস্টান চার্চ নিজেদের প্রভাব ধরে রাখার জন্যই এত কলাকুশলী করেছিল। যদিও তাদের ফুটসোলজাররা মনে করতো যে তারা এইসব পসলন করে আর জোর করে অন্যদের পালন করিয়ে নিজেদের ধর্ম রক্ষা করছে। কিন্তু আসলে তারা কনজারভেটিভদের ক্ষমতা আর পজিশানকে রক্ষা করছে। যদিও এর বিনিময়ে ফুট সোলজাররা কিছুই পায়না, দিনের শেষে রক্ত ঝরিয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসে। কিন্তু তবুও ওরা নিজেদের শোষকদের হয়েই কাজ করে। তাহলে মৌলবাদ

যতটা না ধর্মীয় তার থেকে অনেক বেশি সমাজের প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধে কনজারভেটিভ দের ক্ষমতা ও নিজেদের আগের অবস্থানে টিকে রাখার প্রতিক্রিয়াশীল দ্বন্দ্ব। অবশ্য সমাজে ধর্ম আর ধর্মান্ধতা না থাকলে এই প্রতিক্রিয়াশীল বাধা সৃষ্টি করা সহজ হতো না। ফুট সোলজার জোগাড় করা মুশকিল হতো, অর্থাৎ ধর্ম মৌলবাদের জন্য সবথেকে বড় সহায়ক হলেও মৌলবাদের কারন নয়, মৌলবাদের কারন হলো ক্ষমতায় টিকে থাকার স্ট্রাটেজিক যুদ্ধ। হিন্দু মৌলবাদ ও একই কারণে উঠে এসেছিল আমেরিকার পরে পরেই। যখন ভারতীয়রা (বিশেষ করে so called লোয়ার কাস্ট হিন্দুরা) হিন্দু ধর্মীয় গোঁড়া আর বার্নবাদী সিস্টেমের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে যাচ্ছে, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি চরম নারকীয় ভয়াবহতা থেকে রাম মোহন, বিদ্যাসাগরেরা যখন মানুষকে নবজাগরণের দিকে মুখ ঘোরাতে সক্ষম হয়েছে ঠিক সেই সময়ে

## বিবেকানন্দ/সভারকর দের মতো কনজারভেটিভ প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় বাবারা হিন্দু মৌলবাদের মাটি তৈরি করতে শুরু করে, যেগুলোকে আজ আমরা RSS, হিন্দু মহাসভা, বজরং দল, বিশ্ব হিন্দুপরিষদ ইত্যাদি রূপে দেখতে পাই।

হ্যাঁ এদের গোড়া পত্তন করেছে বিবেকানন্দ, সভারকররা। কিন্তু এরা একা একা কিছু করেনি। এরা করেছে আমেরিকার শিকাগোর আয়োজন করা ধর্মীয় সভায় নিজেদের মার্কেটিং এর মাধ্যমে, হ্যাঁ সেই থেকে শুরু। কি অদ্ভুত সমাপতন, এদিকে আমেরিকা নিজেদের খ্রিশ্চিয়ান মৌলবাদ গড়ে নিয়েছে, সেদিকে ব্রিটিশ কলোনি ভারতে খ্রিশ্চিয়ান দের প্রাদুর্ভাব কম দেখে হিন্দু ধর্মকেই ব্যবহার করেছে নিজেদের প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী কান্ডকারখানা চালানোর জন্য। এদিকে সভারকর আবার এডলফ হিটলারের ফ্যানবয় ছিল। ন্যাৎসিজম এর ভারতীয় সংস্করণ হিন্দুত্ববাদ এর স্রষ্টা ছিল স্বয়ং সভারকর, যা ইংরেজদের ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি চালাতে অনেকটাই সাহায্য করেছে। এবং ইংরেজ দের উত্তর সুরি কংগ্রেস আর BJP আজপর্যন্ত তাই করে যাচ্ছে। আবার 1400 বছর আগে

ইসলামের জন্ম হলেও মুসলিম জঙ্গী গোষ্ঠী গুলোর আবির্ভাবও আমরা দেখেছি এই ঊনবিংশ শতকে কোল্ড ওয়ারের সময়ে। যখন ওই মুসলিম কান্ট্রি গুলো আমেরিকা আর USSR এর ওয়ার বেস হয়ে উঠেছিল, হ্যাঁ এখানেও আমেরিকা। তাহলে আমরা দেখলাম মৌলবাদ আসলে যতটা না ধর্মীয়, তার থেকে অনেক বেশি সমাজের স্বাভাবিক প্রগতিশীলতাকে বাধা দিয়ে নিজেদের ক্ষমতা আঁকড়ে রাখার জন্য একটা প্রতিক্রিয়াশীল অপচেষ্টা। এখন এই অপচেষ্টার নাম হলো ফ্যাসিবাদ, কারন ক্ষমতা ধরে রাখতে চায় কনজারভেটিভ ক্যাপিট্যালিস্ট সাম্রাজ্যবাদীরা। আর পুঁজিবাদ নিজের ক্ষমতা ধরে রাখতে যা যা করে, তাকে বলে ফ্যাসিবাদ।

এবার দেখবো এই মৌলবাদ কখন জঙ্গিবাদ বা টেরোরিজম হয় আর কখন হয়না। হ্যাঁ মৌলবাদ আর টেরোরিজম এর মধ্যে পার্থক্য আছে। মৌলবাদীরা যতক্ষন ফ্যাসিবাদী ক্ষমতার হয়ে লড়বে ততদিন তাকে জঙ্গি বা টেরোরিস্ট বলা হয় না (সাবঅল্টারন ভাবে যাকে বলে দেশদ্রোহী)। কিন্তু পুঁজিবাদী ফ্যাসিবাদের তৈরি সেই প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদীরাই যদি কোনো ভাবে তাদের সৃষ্টিকর্তার (ক্ষমতার) বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়, তখন তাকে জঙ্গী বা

টেরোরিস্ট বা দেশদ্রোহী বলা যাবে। আরেক ভাবে বললে এটাও বলা যেতে পারে যে সংখ্যা গুরুর মৌলবাদ হলো ভালো মৌলবাদ কিন্তু সংখ্যা লঘুর মৌলবাদ হলো জঙ্গীবাদ/টেররিজম/দেশদ্রোহীতা। আরেক ভাবে বললে এ ও বলাযায় যে ফ্যাসিবাদি মৌল বাদীরা ভালো মৌলবাদী কিন্তু ফ্যাসিবাদ বিরোধী মৌলবাদীরা জঙ্গী/টেরোরিস্ট/দেশদ্রোহী।

এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হলো, জয় শ্রী রাম বলে খুন করলে তাকে জঙ্গি বলা হবে না কিন্তু আল্লাহু আকবর বলে খুন করলেই তাকে বলা হবে জঙ্গি। কারন জয় শ্রীরাম বলে খুন করা হলো এই দেশে সংখ্যাগুরু মৌলবাদ, এবং এই দেশের পুঁজিবাদী ফ্যাসিস্ট দের স্লোগান ও হলো জয় শ্রীরাম। কিন্তু আল্লা হু আকবরের ক্ষেত্রে তা নয়, সেটা কোনো না কোনোভাবে জেনে হোক বা তাদেরই অজান্তে সংখ্যা গরিষ্ঠ ও ফ্যাসিবাদের সরাসরি পক্ষে নয়। যদিও পরোক্ষ ভাবে ফ্যাসিবাদ এদের ও ব্যবহার করে। এদের কাগুজে বাঘ বানিয়ে সংখ্যা গরিষ্ঠ মৌলবাদী রিএক্সনিস্ট দের ভয় দেখিয়ে ভেড়ার পাল কে নিজের খোঁয়াড়ে ঢোকানোর জন্য।

# ঠিক একই ভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ যখন সংখ্যা লঘুদের খুন করে মাটিতে পুঁতে তার ওপর ফুলকফি চাষ করে সেটাকে জঙ্গিবাদ বা টেররিজম বলে না।

কিন্তু এই কাজ যখন সংখ্যা লঘু বা ক্ষমতার প্রত্যক্ষ বিরোধীরা (পরোক্ষ ভাবে যদিও ক্ষমতারই লাভ হয়) করে তখন সেটা জঙ্গিবাদ হয়ে যায়। ঠিক একই ভাবে ডাব খাওয়ার নাম করে সংখ্যা গরিষ্ঠ ক্ষমতার দালালরা যখন ঘরে ঘরে অস্ত্র জমানোর আহ্বান দেয় তখন সেটা আর জঙ্গীবাদ থাকে না। কিন্তু সংখ্যালঘুরা করলেই সেটা হয়ে যায় জঙ্গীবাদ। এর আরো ভালো উদাহরণ হলো তালিবান, আলকায়েদা নামক জঙ্গী গোষ্ঠী গুলো যতদিন আমেরিকা ও পুঁজিবাদের হয়ে লড়েছিল তখন এরা জঙ্গী গোষ্ঠী নামে পরিচিত হয়নি। যেই এরা আমেরিকার বিরুদ্ধে গেল, তবে থেকেই এরা জঙ্গী নামে খ্যাত হলো। আর খ্রিস্টান মৌলবাদীরা কোনোদিন ক্ষমতার বিরুদ্ধে যায়নি, বরং এরা সবসময় ক্ষমতার পক্ষে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তাই খ্রিস্টান মৌলবাদীরা আজও ‘জঙ্গী’ উপাধি পায়নি।

আমি জঙ্গীবাদ কে জাস্টিফাই করছি না। বরং আমি বলতে চাইছি যে জঙ্গীর জন্ম একসময় সাম্রাজ্যবাদী ক্যাপিট্যালিস্ট ফ্যাসিস্টদের হাত ধরেই জন্ম নিয়েছিল, কিন্তু আজ ওরা কোনো ভাবে নিজেদের অজান্তেই প্রত্যক্ষ বিরোধী হয়ে উঠেছে, যদিও পরোক্ষ ভাবে ওরা ওই ফ্যাসিবাদের আগুনেই তেল দিয়ে চলেছে। আমি শুধু বলছি যে মৌলবাদ আর জঙ্গিবাদের জন্ম দেয় ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। অবশ্য ধর্ম এর জন্য খুব ভালো মিডিয়াম। ধর্ম না থাকলে ফ্যাসিস্ট দের কাছে এই ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ব্যবহার করা সহজ হতোনা। কিন্তু মৌলবাদের বড় কারন ধর্ম নয়, এর বড় কারণ হল পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ বা আরেক ভাষায় কনজারভেটিভ ক্ষমতাশালীরা।

# অলৌকিক বলে কিছু হয় না

-অশোক সরকার

একটা সময় যুক্তিবাদী মানুষরা যীশুখ্রীষ্টের জীবন ও জীবনী সম্বলিত ধর্ম কাহিনীর উচ্চতর সমালোচনা শুরু ক'রেন। ফরাসি দার্শনিক দেকার্ত বাইবেলের ঈশ্বরকে অস্বীকার ক'রে ঈশ্বরতত্ত্বকে একটি যুক্তিবাদী দর্শনের সমস্যা রূপে চিহ্নিত করেন। যীশুর সব মিরাকেল বা অলৌকিক কার্যকলাপ তিনি যুক্তি বিরুদ্ধ বলে উড়িয়ে দেন।

তিনি বলেন: "ঈশ্বরকে বাইবেলের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। একমাত্র যুক্তিপূর্ণ দার্শনিক মনের মধ্যেই তাকে সন্ধান করতে হবে। এইভাবে মানুষ যখন মননের মাধ্যমে ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য উপলব্ধি করতে পারবে, তখন তারা বাইবেলকে বর্জন করবে।"

ডাচ দার্শনিক স্পিনোজা বলেন: "বাইবেলের সঙ্গে যুক্তি ও দর্শনের কোন মিল নেই, তারা দুটি আলাদা জগতের বিষয়। তাছাড়া বাইবেল, কে বা কারা লিখেছিলেন, কবে লিখেছিল, কেন লিখেছিল? কে বা কারা সবগুলো কাহিনী একসঙ্গে সংকলিত করেছিল, ইত্যাদি প্রশ্ন তুলে তিনি বিশ্বাসী দের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেন। প্রকৃতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্পিনোজা বলেন যে, সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিই ঈশ্বর। জীবজগৎ

সহ মহাবিশ্বের সর্বত্র শুধু প্রকৃতি নামক একটি বস্তু বিভিন্ন রূপে বর্তমান, এবং এই প্রকৃতিই ঈশ্বর।” (এখানে একটা কথা বলে রাখি, বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন একমাত্র স্পিনোজার দর্শনকেই বিশ্বাস করতেন। স্পিনোজা কে নিয়ে আমার একটা লেখা আছে। আবার করার ইচ্ছা রইল।) আর এইসব বক্তব্যের জন্য একবার ১৬৫৬ সালে এবং আরেকবার তার মৃত্যুর পরে ১৬৭৮ সালে তাকে ইহুদি ধর্ম থেকে বহিষ্কার করা হয়।

**সপ্তদশ শতাব্দীতে আর যাদের রচনা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে বাইবেলে বিশ্বাসের উপর আঘাত হেনেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন টমাস হবস, জন লক এবং জন মিল্টন।**

১৮ শতকে ইউরোপে বিশেষকরে ফ্রান্সে, যে জ্ঞানবাদী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, দিদেরো, হেলভেশিয়াস, ভলতেয়ার প্রমূখ সেই আন্দোলনের তাত্ত্বিক নেতারা বাইবেল তথা খ্রিস্ট ধর্মকে যুক্তি এবং ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের সাহায্যে নস্যাৎ করবার চেষ্টা করেন। তাছাড়া ইংল্যান্ডের ডেভিড হিউম তাঁর যুক্তিবাদ ও প্রয়োগবাদের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় খ্রিস্টধর্মের ভিত নাড়িয়ে দেন। জার্মানিতে

ইমানুয়েল কান্ট তাঁর Critigue of pure reason গ্রন্থে দেখান যে, ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ নেই।

এইসব যুক্তিবাদী প্রবাহের ফলে উনিশ শতকে যীশুর জীবন কাহিনীকে "নিউ টেস্টামেন্ট" এ আগের বর্ণিত সমস্ত অলৌকিকতা থেকে মুক্ত করে, একজন আদর্শ লৌকিক মানুষের জীবন হিসাবে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

পলাশ (Paulus) ১৮২৮ সালে একটি যিশুচরিত রচনা করেন। যাতে তিনি যীশুর অলৌকিক জন্ম, জীবনের সমস্ত অলৌকিক কার্যকলাপ এবং পুনরুজ্জীবিত হয়ে কবর থেকে উঠে আসার কাহিনী কে অসত্য এবং অবিশ্বাস্য বলে ঘোষণা করেন।

আরেকটি বিখ্যাত উদাহরণ রেনান বা রঁন্যার তাঁর life of Jesus বইতে, তিনি একইভাবে সমস্ত অলৌকিকতা বর্জন করে, জিশুকে একজন সাধারন কিন্তু আদর্শ মানুষ হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

**এভাবেই খ্রিস্টধর্ম তাদের অলৌকিকতা বর্জিত ধর্মকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হিন্দু ধর্মে এটা মনে হয় কোনদিন সম্ভব নয়।**

কৃষ্ণের জন্ম হয়েছে এক বিরাট অলৌকিকতার মাধ্যমে যা কোনদিন সম্ভব নয়। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসীরা তা অন্ধের মত বিশ্বাস করে। অবশ্য বিশ্বাস না করে কোনো উপায়ও নেই।

অলৌকিকতায় অবিশ্বাস করলে, কৃষ্ণকে নিয়ে লেখা সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী গুলি যে কল্পকাহিনী তা প্রমাণ হয়ে যায়।

> "আমি কখনোই আসমানী খোদাকে মান্য করিনা। মানুষের মধ্যে যে খোদা বিরাজ করে আমি তার চরণেই পূজো দেই। মন্ত্র পড়া ধর্ম নয়, কর্মকেই ধর্ম মনে করি। লাখ লাখ টাকা খরচ করে হজ্জ্ব পালনের চেয়ে এই টাকাগুলো দিয়ে দেশের দুঃখী দরিদ্র মানুষের সেবা করাটাকে অনেক বড় কাজ মনে করি। প্রচলিত ধর্ম-ব্যবস্থা। আমাদের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ তৈরী করে দিয়েছে। কতিপয় হীন মোল্লা-পুরুত আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে বিভাজন নিয়ে এসেছে। এ বিভাজনই যদি ধর্ম হয় সেই ধর্মের কপালে আমি লাথি মারি।"
>
> - শাহ আব্দুল করিম

# কর্পোরেট রাষ্ট্র ও শিক্ষাব্যবস্থা

-তন্ময়

যে রাষ্ট্র কর্পোরেট পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে এবং কর্পোরেট পুঁজিকে নিরাপত্তা প্রদান করে সেই রাষ্ট্রের অপর নাম কর্পোরেট রাষ্ট্র। ফ্যাসিস্ট শক্তি বিজেপি কর্পোরেট রাষ্ট্রেরই সমর্থক তা তাদের দেশ চালনার অর্থনৈতিক নীতির অভিমুখ দেখলেই বোঝা যায়। সরকারি ক্ষেত্রগুলো সংকুচিত করার সাথে সাথে ঢালাও বেসরকারিকরণ সেই নীতিরই অংশ। অন্যান্য ক্ষেত্রের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় প্রাইভেট উদ্যোগের পথ প্রশস্ত করার লক্ষ্যেই প্রনয়ণ জাতীয় শিক্ষানীতির।

**জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের আগামী পরিকল্পনা হচ্ছে শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয় গুটিয়ে আনার জন্য ধীরে ধীরে সরকারি বিদ্যালয় থেকে হাত তুলে নেওয়া।**

গত ১৬ ই এপ্রিল আসামের মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষকদের নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠানে ফাঁস করেছিলেন এই সত্যটা। তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে আগামী এক দশক পর আর

সরকারি বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব থাকবে না। অর্থাৎ ফেলো কড়ি, মাখো তেল। টাকা দাও, পন্য (শিক্ষা) নাও। যাদের যথেষ্ট পয়সা নেই তাদের শিক্ষার অধিকারও নেই।

"ইউনাইটেড ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ফর এডুকেশন" বিভাগ থেকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে সারা দেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মোট ৫১০০০ সরকারি বিদ্যালয়(৪.৭৮ শতাংশ)। ওই বছরে বেসরকারি বিদ্যালয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১১৭৩৯ টি।

মৌলিক অধিকার "শিক্ষা" আজ বাজারের পণ্য।

টাইমস অফ ইন্ডিয়া, রাইজিং কাশ্মীর, হিন্দুস্থান টাইমস, কাউন্টার ভিউ, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী উত্তরাখণ্ডে মোট ১৫০০ কাশ্মীরে ১২০০ গুজরাটে ৫০০ ওড়িশায় ১২০০ হরিয়ানায় ২৫০০ ত্রিপুরায় ৯০০ উত্তরপ্রদেশে ২৬০৭৪ মধ্যপ্রদেশে ২২৯০৪ টি বিদ্যালয় একত্রীকরণ এবং বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বন্ধ করে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছে আরও কয়েক হাজার বিদ্যালয়। এর মধ্যে ওড়িশায় আরও ১৪০০০টি এবং মধ্যপ্রদেশে আরও১০০০টি বিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী রাজ্য সরকারগুলিকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের একত্রীকরনের মাধ্যমে স্কুলের সংখ্যা হ্রাস করতে হবে। একই সঙ্গে খবরে প্রকাশ স্কুল একত্রীকরণ

ও বন্ধ করে দেওয়ার পর অবশিষ্ট স্কুলের অর্ধেক পরিচালিত হবে "Mission School of Excellence" নামে একটি প্রকল্পের অধীনে। 'বিশ্ব ব্যাঙ্ক' এবং 'এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কের' যৌথ নিবেশের মাধ্যমে চলবে এই প্রকল্প।

এর থেকেই স্পষ্ট হয়, শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে হাত তুলে নিচ্ছে সরকার। উৎসাহ পাচ্ছে বেসরকারী সংস্থাগুলো।

২০২১ এর ৭ই সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া উন্নত করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সরকারী স্কুলগুলোকে বেসরকারী হাতে তুলে দেওয়ার জন্য পিপিপি মডেল অনুসরণ করার কথা বলেন।

ব্যাতিক্রম হতে পারল না কেরালার বামপন্থী সরকার। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের খসড়া পরিকল্পনা পেশ করেন পার্টির রাজ্য সম্মেলনে। এই বিষয়ে একটি প্রশ্নের জবাবে পার্টির রাজ্য সম্পাদক বালাকৃষ্ণান জানান সিপিএম বেসরকারিকরণের বিরোধী নয়, যদি সেটা সরকারি নিয়ন্ত্রণে হয়। লাল, নীল, সবুজ,

হলুদ, গেরুয়া সব রঙ আজ একাকার কর্পোরেটের নির্দেশিত পথে পা মেলাতে।

শিক্ষার চৌকাঠে পা আটকে শুধু অগণিত নিম্নবিত্ত মানুষদের।

> "ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি থেকে বাদ দেওয়া উচিত। ধর্ম ব্যক্তি বিশেষের বিষয় হওয়া উচিত। ধর্মীয় বিষয়ের দ্বারা রাজনীতি পরিচালিত হওয়া উচিত নয়।"
>
> - নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

# করণীয় কি? হিন্দু মুসলিমের মধ্যে এত মিল এত বিভেদ?

-মুজিব রহমান

এ অঞ্চলের মুসলিমদের সামান্যই বাইরে থেকে আসা। অধিকাংশই হিন্দু বা বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলিম হয়েছে। আবার আর্যরাও বাহির থেকেই এসেছে। আর্যদের ধর্মীয় চেতনা স্থানীয় ধর্মের চেতনার সাথে মিলেই আজকের বৈদিক ধর্ম তৈরি হয়। আমাদের ইউনিয়নে দেবনাথ সম্প্রদায়ের লোক রয়েছে। দেশের সমস্ত নাথ ও দেবনাথরাই নাথ ধর্মের লোক ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মও আলাদা ধর্ম ছিল। শৈবরাও ছিলেন আলাদা ধর্মের। এক বৈষ্ণবদের মধ্যেও বহু মত-পথ রয়েছে। মুসলিম আগমনই হয়তো তাদের এক ধর্মে নিয়ে এসেছে। অথচ এখনো ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের হিন্দুরা ভিন্ন-ভিন্ন দেবতার পূজা করে। বাংলার দুর্গা দেবীর অস্তিত্ব দক্ষিণ ভারতে নেই। বাংলাভাষী অধিকাংশ মানুষই একইরকম দেখতে, মূলত অস্ট্রিক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ যাদের মধ্যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর জিন রয়েছে। এজন্য তাদের শংকরজাতিও বলা হয়। আবার দুই ধর্ম বিশ্বাসীদের মধ্যে বেশ কিছু মিলও পাবেন। মুসলিমদের আদি পুরুষ আদম-হাওয়ার মতোই হিন্দুদের রয়েছে মনু-শতরূপা! সাধারণভাবে কে হিন্দু ও কে মুসলিম ধরার কোন

পথ নেই। অথচ শুধুমাত্র ধর্মের কারণে তাদের মধ্যে বিরাজ করে তীব্র বিদ্বেষ ও ঘৃণা।

আগের ধর্ম সংস্কার করেই নতুন নতুন ধর্ম এসেছে। ইহুদী-খৃস্টান-মুসলিম এর বিবর্তন আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি। বৈষ্ণব ধর্ম থেকে শ্রীচৈতন্য হয়ে আজকের ইশকনের মধ্যেও একটি ধারাবাহিকতা হিসাব করতে পারি। অথবা সাংখ্য, শৈব, বৈষ্ণব ধর্ম থেকে আজকের হিন্দু ধর্ম নিয়েও পর্যবেক্ষণ করতে পারি। ধর্মগুলো শুধু স্রষ্টা বা দেবতার আরাধনাই নির্দেশ করে দেয়নি তারা একেকটা দর্শনও ঠিক করে দিয়েছে। যে দর্শন একসময় প্রাধান্য বিস্তার করতো তাদের অনুসন্ধিৎসার জবাব কিন্তু বিজ্ঞান খুঁজে নিয়েছে। বিজ্ঞানই সত্যের কাছে পৌঁছাতে পেরেছে। এতে দর্শনের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে পড়েছে, উন্নত দেশে ধর্মের প্রভাবও কমেছে কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার উন্নতি কমই হয়েছে। দারিদ্রতার মতো অন্ধতাও দূর হয়নি।

**১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের সময় ভারত ও পাকিস্তানের দায়িত্ব নেন দুজন প্রগতিশীল ও ধর্মের প্রতি বিশ্বাসহীন মানুষ। জওহরলাল নেহেরু ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মধ্যে ধর্ম বিশ্বাসই ছিল না।**

তারা দুজনই ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। তখন একটা ধারণা অনেকে করতেন যে আগামী ৫০ বছরে দক্ষিণ এশিয়াও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষে ভরে উঠবে। কিন্তু তা হয়নি। এখন দক্ষিণ এশিয়া জুড়েই ধর্মান্ধতার অন্ধকার নেমে এসেছে। ১৯০৬ সালে বাংলা ভাগ হলে মুসলিমরা খুশি হয় এবং হিন্দুরা আন্দোলন করে ভারত ভাগের বিরুদ্ধে। এর একটি কারণ ছিল যে, পূর্ববঙ্গে অনেক হিন্দুর জমিদারি ছিল এবং তারা বাস করতো কলকাতায়। বাংলা ভাগ হলে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পাবে। রবীন্দ্রনাথের পরিবারের পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জমিদারি ছিল। যখন তাদের আন্দোলনে বঙ্গভঙ্গ রদ হল তখন হিন্দুরা ভিন্ন সংকট সামনে দেখতে পেল। ১৯৩১ সালের আদমশুমারী দেখেই অনেকে আৎকে উঠেন। তারা বিস্ময়করভাবে পরিসংখ্যান দেখেন যে, দুই বাংলায় মুসলিমের সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে অনেক বেশি। এর ফলও পান পরবর্তী নির্বাচনে। বাংলার পরপর তিনজন প্রধানমন্ত্রীই হন মুসলিম- শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমউদ্দিন- যাদের নিয়ে ঢাকার দোয়েল চত্বরে তিন নেতার মাজার রয়েছে। কলকাতার হিন্দু বাবুরা বুঝে গেলেন- রাজনীতিতে যত বড় নেতাই তারা হন না কেন ভোটের দৌড়ে কখনোই তারা আর পেরে উঠবেন না। সিআর দাশের মতো মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্যও কেউ নেই। ধর্মটাই সামনে চলে আসে, চলে আসে বিদ্বেষটাও যা

নতুনও নয়। দেশভাগের পরে জমিদারি প্রথা বাতিল হয়। তাতেও হিন্দুদের প্রভাব আরেক ধাক্কায় কমে যায় কারণ অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন হিন্দু। পূর্ব বঙ্গ থেকে হিন্দুরা চলে যেতে থাকে পশ্চিমবঙ্গে আর পশ্চিম বঙ্গ থেকে মুসলিমরা আসতে থাকে পূর্ব বঙ্গে। হিন্দুদের দেশান্তরের সংখ্যাটা অনেক বেশি। এতেও হিন্দুরাই বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পূর্ববঙ্গে থাকা বহু সম্পদই তারা হয় নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে যায় নতুবা স্রেফ ফেলে রেখে যায়। পূর্ববঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা অনেক কম থাকা সত্ত্বেও জমিদারি ও উচ্চ শিক্ষার কারণে তাদের হাতেই ছিল রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষমতা। বাংলাদেশে থেকে যায় সাধারণত দরিদ্র ও পিছিয়ে থাকা হিন্দুরা। আমাদের গ্রামেও একসময় ভট্টাচার্য, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, সেন ও রায় পরিবার ছিল। ১৯৩১ সালের পরিসংখ্যানে আমার ভাগ্যকুল গ্রামে ৫১% হিন্দু ছিল। এখন সংখ্যায় কমে আসলেও হিন্দু ভোটার ৩৫-৪০% এর কমবেশি। এরমধ্যে একজনও ভট্টাচার্য, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, সেন ও রায় নাই। রয়েছেন কয়েক ঘর সাহা ও পোদ্দার আর অধিক সংখ্যক মাল ও রাজবংশী যারা জেলে সম্প্রদায়ের। দেশ ভাগের কারণে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা ক্ষমতায় যায়। সেখানে এখন ৯ কোটি মানুষের মধ্যে আড়াই কোটি মুসলিম। আবার বাংলাদেশে সাড়ে ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে দেড় কোটি হিন্দু (৮%)। দুই বাংলা মিলিয়ে

দেখুন এখনো ২৫ কোটি বাঙ্গালির মধ্যে আট কোটি হিন্দু আর প্রায় তার দ্বিগুণের বেশি মুসলিম। হিন্দুদের ক্ষমতা হ্রাস ও মুসলিমদের সংখ্যাধিক্য- এই পরিসংখ্যানই হয়তো দ্বন্দ্বের ও ঘৃণার প্রধান কারণ হয়ে উঠে। তবে মুসলিমদের মধ্যে থাকা প্রকট ধর্মান্ধতা, জিহাদী চেতনা ও সুশিক্ষা বিমুখতা পারস্পরিক ঘৃণাকে বাড়িয়ে দিয়েছে।

ভারত ভাগের পরেও পাকিস্তান আমলে আমরা দেখেছি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের ভিতরেও একটি প্রগতিশীল চেতনা জেগে উঠতে। বিশেষ করে বাম রাজনীতির প্রভাবে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ তৈরি হচ্ছিল। সেখানে ধর্ম-অনুরাগহীন একটা শ্রেণিও ছিল যারা সমাজে প্রভাব বিস্তার করতো। কমিউনিস্ট পার্টিতে যারা নেতৃত্বে ছিল তারা অধিকাংশই হিন্দু নেতা। তারা  বস্তুবাদের চর্চাই করতেন। সেখানে যারা মুসলিম ছিলেন তারাও বস্তুবাদী চেতনাধারী ছিলেন। ফলে হিন্দু মুসলিম নেতারা কাধে কাধ মিলিয়ে আনন্দের সাথেই রাজনীতি করতে পেরেছেন। হিন্দু-মুসলিম চেতনা তাদের স্পর্শ করতো না। কিন্তু বাম দলগুলোতে হঠাৎই একটি পরিবর্তন চলে আসে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পরে। বস্তুবাদের পরিবর্তে আসে ধর্ম-কর্ম সমাজতন্ত্রের কথা। মাওলানা ভাসানী আন্দোলনে নিয়ে আসে নামাজ ও মোনাজাত যা ইসলাম ধর্মীয় বিষয়। হিন্দুদের আস্থার জায়গাটা নষ্ট হয়ে যায়। আমরা সেই ধারাটাই এখনো দেখছি। মঞ্জুরুল আহসান খান মাজারপন্থী সুফিবাদী দর্শনের

মানুষ যা বস্তুবাদ পরিপন্থী। তিনি আবার হজ্বব্রত পালন করে শরিয়তপন্থীও হয়ে গেলেন। এমনটা আরো অনেকের মধ্যেই দেখা গেল। ইনু-মেননও হজ্বব্রত পালন করে হাজিসাব হয়ে উঠলেন। ধীরে ধীরে প্রগতিশীল হিন্দুরাও ছাড়তে থাকেন বাম রাজনীতি এবং তারা আশ্রয় নেন মূলত আওয়ামী লীগের পতাকা তলে। প্রগতি চর্চার জায়গাগুলোও নষ্ট হয়ে যায়। তৈরি হয় ধর্মীয় আবহ ও বিদ্বেষ। বাংলাদেশ থেকে যে হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে গিয়েছিল তারা ওখানে গিয়ে করতো সিপিএম। এতে সিপিএমের শক্তিও অনেক বেশি ছিল। মুসলিমরাও সিপিএম করতো। ফলে পশ্চিমবঙ্গে একটি প্রগতিশীল সমাজ তৈরি হয়েছিল। হিন্দু মুসলিমরা একসাথেই ধর্মের প্রতি উদাসীন থেকেই রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড করতেন। সেই জায়গাটাও হারিয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গে বিস্ময়করভাবে সিপিএম ও সিপিআইর সমর্থকরা বিজেপিতে যোগ দিতে লাগল। বাংলাদেশ থেকে যাওয়া হিন্দুরা প্রায় সকলেই বিজেপির সমর্থক বনে গেল। তারা হঠাৎ করেই কি প্রগতিশীল থেকে ধর্মান্ধ হয়ে উঠল! মুসলিমরাও যোগ দিল তৃণমূল কংগ্রেসে। কেন এমনটা হল? ভারত ও বাংলাদেশে কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। পরস্পরের প্রতি বেড়েছে অবিশ্বাস ও ঘৃণা।

আমার মনে হয়েছে পারস্পরিক আস্থাহীনতা, ঘৃণা ও বিদ্বেষ থেকেই এটা হয়েছে। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ আমার ভালভাবেই পড়া

আছে। হিন্দু ধর্ম নিয়মিত পড়ে এমন একজনের কাছে জানতে চাইলাম- কোন ধর্মগ্রন্থে গরুকে দেবতা বলা হয়েছে? আমরা একমত হলাম যে, কোন ধর্মগ্রন্থেই এমনটা বলা নেই। তবে গরু দিয়ে হালচাষ করা হয় এবং গাভী দুধ দেয় তাই ভারতে যখন গরুর সংখ্যা কমে গেল তখনই গরু খাওয়ার বিরুদ্ধে রাজারা ব্রাহ্মণদের দিয়ে বিভিন্ন কথা বলা শুরু করাল।

**গরু দুধ দেয় ও হালচাষে কাজে লাগে বলেই তাকে মায়ের সাথে তুলনা করে বলা হয় গো-মাতা। আর তাতে গরু না খাওয়ার একটি ভাবাদর্শ তৈরি হল। মহাভারতে যজ্ঞে গোবৎস (বালক গরু) খাওয়ার কথা বলা আছে।**

যজ্ঞে হাজার হাজার গরু কাটা হতো বলেই গরুর সংকট তৈরি হতো। কিন্তু ভারত ভাগের সময়তো গরুর অমন সংকট ছিল না। তাহলে সেই গরু না খাওয়ার তীব্রতা কিভাবে বহাল থাকলো? এখানে কি মুসলিমদের কোরবানী ও গরু খাওয়ার বিষয়টি জড়িয়ে রয়েছে? মুসলিমরা ধর্মীয় উৎসবে গরু ব্যবহার করে ও খায় বলে হিন্দুরা এর বিরুদ্ধে সেই প্রথা আরো জোরদার করেছে সম্ভবত(?)।

ইংরেজরা একটা চেষ্টা করেছিল ভারতীয় বৈদিক ধর্মে একেশ্বরবাদী চেতনা জাগ্রত করতে। তারা বুঝেছিল যদি

এমনটা করা না যায় আর খৃস্টান ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে এতো বৈপরত্য থাকে তাহলে সংঘাত আসবেই। ইংরেজরা ব্রাহ্ম ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করে। রাজা রামমোহন রায়, কেশব সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচেষ্টা চালান। ভারতে শংকরাচার্যও একেশ্বরবাদের একটি ধারণা দিয়ে গিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্ম ধনিক শ্রেণির মাঝে জনপ্রিয়তা পেলেও সাধারণ হিন্দুরা তা গ্রহণ করেনি প্রচণ্ড রাষ্ট্রীয় চাপ না থাকায়। ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন তখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তারা সেটার দিকেই মনোযোগ দিয়েছে। ভারতে মুসলিম শাসনামলে ধর্মপ্রচারকগণ সুবিধা নিয়ে প্রচুর হিন্দু/বৌদ্ধকে মুসলিম বানিয়েছে। তবে রাষ্ট্র নিজে এজন্য কঠোর ছিল না। আবার তারা হিন্দু ধর্মকে একেশ্বরবাদী ধর্ম বানানোর দূরদর্শি চিন্তা করতেও পারেনি। এরমধ্যে রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মীয় নেতারা সুবিধা নেয়ার জন্য হিন্দু ও মুসলিমদের ধর্মীয় দূরত্বকে কাজে লাগিয়ে ঘৃণা ও বিদ্বেষটা চরমভাবে জাগিয়ে রেখেছে। পৃথিবীতে ধর্মগুলোকে মোটা দাগে দুইভাগে ভাগ করা যায়। একটা সেমিটিক একেশ্বরবাদী আরেকটি পৌত্তলিক প্যাগান। দুটি ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে মিল কমই। তারমধ্যে আবার বিভেদ বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা সবাই চালিয়েছে। বিপরীতে প্রগতিশীল ও বিজ্ঞানমনস্ক চেতনার মানুষ তৈরির চেষ্টা কোন সরকারই কোনকালে করেনি। ফলে বিভেদও দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এই আধুনিক ও সভ্য যুগে রাষ্ট্রের পক্ষে আর সম্ভব নয় মানুষের ধর্মবিশ্বাস বদলে দিয়ে আরেক ধর্মের দিকে ঠেলে নেয়া। তাহলে এই বিভেদ থেকে রক্ষার পথ কি? পথ একটাই আর তাহল বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গঠন করা। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাছেই ধর্মটা পরিস্কার হয়ে উঠে। নেতাদের কারসাজি ও প্রতারণা টের পায়। ভণ্ড ধর্মব্যবসায়ীদের আহবান তারা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এজন্য রাষ্ট্র ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা করা থেকে বিরত থাকবে। ধর্ম হবে ব্যক্তিগত অনুশীলনের জায়গা। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পাঠ্যবই হবে বিজ্ঞাননির্ভর অর্থাৎ বিজ্ঞান সমর্থন করে না এমন কিছ পড়ানো যাবে না। রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারকে করতে হবে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে। তাহলেই ধর্মব্যবসায়ী ও নেতাদের এবিষয়ে আগ্রহ কমে আসবে। মানুষের মধ্যে ঘৃণাকে জাগিয়ে রাখতে তারা আর অর্থ ব্যয় করবে না। রাষ্ট্র এগিয়ে না আসলে অনেক সময় লেগে যাবে। আর এজন্য প্রগতিশীল ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষকে প্রচুর কথা বলতে হবে এসব নিয়ে।

# আস্তিকতায় পেট ভরে না, রোগ সারে না

- সায়ক সরকার

যখন খুব খিদের পরে গরম ভাতের গন্ধটা নাকে আসে, তখন মনে হয় এটাই স্বর্গ কিন্তু পৃথিবীর অনেক মানুষ এই স্বর্গ সুখ ঠিকমত পায় না, তারা তাদের দুঃখের কথা বললে কোনো ধার্মিক গুরু বলবে এখন এতো কষ্ট করছ, দেখবে মৃত্যুর পরে তুমি সুখ পাবে, আসলে এসব বলে একটি মানুষ কে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হলো। যখন করোনা হলো তখন ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, NGO, রেড ভলান্টিয়ার্স (ভারত)-দের আমাদের ফ্যারিস্তা বলে মনে হয়েছিল। এই কিছুদিন আগে বাংলাদেশে যখন বন্যা হলো, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশের ধর্মীয় গুরু, ইউটিউবার-রা, তাদের অর্থ বল জুগিয়েছিল সাধারণ মানুষ। তাহলে সব তো আমরাই করলাম। তাহলে অদৃশ্যমান ঈশ্বর কোথায়? যেই গরম ভাতের গন্ধ আমাকে সুখ দিয়েছিলো সেই ভাতের ধান কৃষকরা বানায়, বানানোর সময় নজর রাখে সারের বৈজ্ঞানিক উপাদান, জলবায়ুর প্রকৃতি, মাটির

উর্বরতার উপর, সোজা কোথায় তারা একটা অঙ্ক করে ফেলে, তারপরে নিজেদের উত্তর বের করে, এই অঙ্ক করতে লাগছে যুক্তি, তাহলে হঠাৎ করে কিছু হলো না।

অনেক লোক যেমন অনেক রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচার করেছে, ঠিক সেইভাবে অনেক ভাবে ধর্ম প্রচার করেছে, তাতে যে যা ভেবেছে সেটা বলে গেছে, তারাও আমাদের মতো এই পৃথিবীতে এসেছিলো, তাদের ও হাত-পা ছিল, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোন ছিল না, ছিল না বিজ্ঞানের দুর্দান্ত আবিষ্কার, সময় বদলে গেছে আমাদের সেই ধর্মীয় চিন্তাকে প্রশ্ন করতে হবে।

**আজকে চিকেন পক্স হলে আমাদের ডাক্তার দেখাতে হবে, একটা সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান উন্নত ছিল না, তাই মানুষ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতো, নিরামিষ খেত।**

আজকেও অনেকে করে এটা, করে কি লাভ? ত্বকের উপরে ছোপ দাগ থেকে যায়, ওষুধ খেলে খুব তাড়াতাড়ি সেরে যায়, না তো সেই ভোগাবে। আবার প্রশ্ন করছি ঈশ্বর

কোথায়? দিন রাত এক করে আমরা ওষুধ আবিষ্কার করেছি।

আজও কোনো জটিল অপারেশন হলে রোগীর বাড়ির লোক নামাজ পরে, প্রার্থনা করে, কিন্তু কাজ করছে ডাক্তারদের একটা দল, তারা কতটা কি পারছে তার উপরে জীবন নির্ভর করছে, অতএব সেই ডাক্তার রাই তখন ভগবান তুল্য।

বাংলাদেশে আজ একটা পোশাক নিয়ে বিতর্ক তৈরী হয়েছে, ছোট পোশাক পড়া অশালীন, পুরো চেহারা জুড়ে পোশাক পড়া শালীন। না বললেও আমরা জানি এটা একটা ধর্মীয় বেড়াজালের থেকে কোনো অংশে কম না, আসলে ধর্মের অজুহাতে মেয়েদের একটা খাঁচার মধ্যে রাখার চেষ্টা চলেছে, যেই ধর্মীয় বিধিনিষেধ মানুষের নিজের মতো বেঁচে থাকার অধিকার কে মূল্য দেয় না, আমি তার পক্ষে কেন থাকবো?

যেই মন্দিরে বসে আমরা পুজো করছি, যেই মসজিদে বসে আমরা নামাজ পড়ছি, সেই মন্দির মসজিদ বানিয়েছে শ্রমিকরা, সেই বাড়ি বানানোর পরিকল্পনা কেমন হবে, সেটা করেছে আর্কিটেক্ট-রা, ভগবানের উপাসনা করতে

গিয়ে অসুস্থ হলে আপনাকে দেখবে ডাক্তাররা। অতএব চারদিকে স্বর্গের রূপে যা আছে সেটা বাড়ি হোক বা ডাক্তারখানা বা এম্বুলেন্স, সবটা করেছে মানুষের শ্রম আর উদ্ভাবনী শক্তি।

লিখতে লিখতে বাংলাদেশের এক রাজনৈতিক ব্যক্তির কথা মনে পড়লো, কমরেড জসিমুদ্দিন।

সোজা ভাষায় কথা বলতেন উনি, ওনার অঙ্ক খুব সোজা ছিল, উনি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইতেন, সেটা হলেই সমাজের সকল মানুষ নারী-পুরুষ- তৃতীয় লিঙ্গ এর মানুষ সকলে নির্দ্দ্বিধায় শিল্পকলা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, উঁচু ইমারত গর্বে, তখন বুঝতে পারবে যা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছি, সবই মানুষের শ্রম ও উদ্ভাবনী শক্তির জন্যে।

# ঈশ্বরের মহানতা

(একটি ছোট্ট কাহিনী)

- মহঃ সামিম

ইউরোপের নরওয়ে দেশের মধ্যে একটি সুন্দর গ্রাম ছিল। গ্রামটির নাম ‘God's Land’(ভগবানপুর)। সেখানে রাস্তাঘাট ছিল অতি সুন্দর, পুকুর ছিল মাছে ভর্তি, মাঠ ছিল ফসলে ভর্তি, স্বাস্থ্য সেবা অসাধারণ। গ্রামের জনসংখ্যা খুবই অল্প, প্রায় 20 জনের একটি গ্রাম। এককথায় অসাধারণ সুন্দর একটি গ্রাম যা শুধু কল্পনার জগতেই শোনা যায়।

সেখানে মানুষদের সুরক্ষার জন্য একজন সেনাপতি ছিল, তার নাম ছিল এলোহিম। সেই গ্রামের সব মানুষ তাকে ঈশ্বরের মত শ্রদ্ধা করতো এবং তাকে বিভিন্ন দামী দামী উপঢৌকন এবং খাবার দিয়ে যেত। এলোহিমের সাথে তার আরও 4 জন সৈনিক থাকত। তারাও আনন্দের সাথে সেই সব গ্রহণ করত। গ্রামবাসীর এই সব কর্মের পিছনে একটা বিশ্বাস ছিল যে কোনো বিপদ আসলে এলোহিম্ এবং তার সৈনিকটা তাদের বাঁচাবে।

এই রকম ভাবেই তাদের জীবন চলছিল। হঠাৎ একদিন 5 জনের একটি ডাকাতের দল তাদের গ্রামে হামলা করল। তারা প্রাণের ভয়ে এলোহিমের কাছে ছুটে গিয়ে তাদের রক্ষা করার আবেদন জানাল। কিন্তু আশ্চর্য রকম ভাবে এলোহিম তাদের জানাল, "আমি তোমাদের কিচ্ছু সাহায্য করতে পারবো না।" এই কথা শুনে গ্রামবাসীরা কাকুতি মিনতি করতে লাগল তাদের বাঁচানোর জন্য। এলোহীমের কাছে তার পায়ে পড়ে নিজেদের প্রাণের ভিক্ষা চাইতে লাগলো। কিন্তু সেই সব কিছুই এলোহিমকে তার স্থান থেকে সরাতে পারলো না। তখন তারা গ্রামের শিশুদের এগিয়ে দিয়ে বললো, "আমাদের না হয় ছেড়ে দিন, এই ছোট্ট শিশুদের তো বাঁচান"। কিন্তু এলোহিমের কঠোর মন কিছুতেই শুনলো না। শেষে এলোহিম বলল, "আমি আসলে ঈশ্বর, আমার এটাই কাজ, আমি শুধু দেখি"।

তারপরে ডাকাতের দল গ্রামের সমস্ত মানুষকে এক এক করে হত্যা করল। এলোহিম শুধু চুপ চাপ দেখে গেলো। আর বললো, "এটাই তোদের ভাগ্যে ছিল"।

# শিক্ষক ও ধর্ম

-অনিক সরকার

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম নিরপেক্ষতার গুরুত্ব-বিদ্যাসাগর মহাশয় বলতেন- আমাদের দেশে এমন শিক্ষক চাই,যারা বাংলা ভাষা জানেন, ইংরেজি জানেন.আর চাই ধর্মীয় সংস্কার মুক্ত শিক্ষক। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে, বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষা দান করবেন এর সাথে ধর্মীয় সংস্কার এর কী সম্পর্ক? সম্পর্ক আছে, এবং তা যথেষ্ট গভীর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর পাঠ্যক্রম বিজ্ঞান নির্ভর, আর ধর্ম বিশ্বাস(পড়ুন অন্ধবিশ্বাস) নির্ভর। পরস্পরের সাথে চরম ভাবে সাংঘর্ষিক। এবার ধরুন এক বাংলার শিক্ষক ভাষার উৎপত্তির ইতিহাস যখন পড়াবেন, তখন ওনাকে আদিম গুহা মানব এর দেয়াল এ আঁচড় কেটে চিহ্ন আঁকিবুকি থেকেই শুরু করতে হবে সে বলতে পারবে না দেবী সরস্বতী স্বয়ং এসে বিদ্যা দান করে গেছেন। সমস্যাটা এখানেই। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি কতটা আত্মবিশ্বাস এর সাথে এগুলো শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা করবেন এটা নিয়ে সংশয় থেকে যায়। কারণ যে মুহূর্তে বলবেন আমাদের পূর্বপুরুষ গুহা মানব

ভাষার সৃষ্টিকর্তা তিনি নিজের ধর্মের সাথে বেইমানি করবেন। যেটা ধার্মিকরা খুব সহজে করতে চায় না। আবার ধরে নিলাম উনি ধর্মকে সাইড-এ রেখে এটাই পড়ালেন, এবার উনি বাড়ি গিয়ে যখন আবার দেবী সরস্বতীর চরণে লুটিয়ে পড়বেন তখন কিন্তু নিজের শিক্ষা, পেশা সব কিছুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে কারণ কোনো বৈজ্ঞানিক শিক্ষা কাল্পনিক দেব দেবীকে মেনে নেয় না। উনি ইতিহাস পড়িয়ে ধর্মের সাথে বেইমানী করলেন, আবার ধর্ম পালন করে নিজের পেশার সাথে বেইমানী করলেন। এরকম দু নৌকায় পা দিয়ে চলা শিক্ষক সমাজের জন্য কতটা নিরাপদ সেটা নিয়ে সংশয় থেকেই যায়।

## ধর্ম আর বিজ্ঞান একে অপরের পরিপূরক এই কথাটা ডাহা মিথ্যা।

হাতে গ্রহের দোষ কাটানোর রত্ন পড়া শিক্ষক কোন যুক্তিতে শিক্ষার্থীদের গ্রহণ এর কারণ বোঝাবেন সেটাই বোধগম্য হয় না। অথবা ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন বিশ্বাস করা ব্যক্তি কোন যুক্তিতে বিবর্তন পড়াবেন। পড়ালেও তা পারিশ্রমিক এর লোভের বশবর্তী হয়ে, জ্ঞান চর্চার জন্য তো মোটেও নয় শিক্ষা বেছে নিলে ধর্ম অবমাননা হয়, ধর্ম বেছে

নিলে শিক্ষা অবমাননা হওয়া আবশ্যক। যারা ধর্ম আর বিজ্ঞান শিক্ষাকে সহাবস্থান করাতে চায় তারা হয় চরম লেভেল এর নির্বোধ অথবা চরম ধুরন্ধর।

> "সৎ কাজ করিবার সময় লোকের নিন্দাকে, লোকের কথাকে ভুলিতে না পারিলে, এ পথে যাওয়া ঘোরতর অন্যায়।"
>
> - ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর




শিক্ষকতার পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় "পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শেখা", "আকাশ পর্যবেক্ষণ শিবির (স্লাইড সহযোগে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা ও টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে)", কুসংস্কার বিরোধী পরীক্ষা নিরীক্ষা ও আলোচনা, সাপ সম্পর্কে সচেতনতা শিবির ইত্যাদি বেশ কিছু বিষয়ে কাজ করে থাকি বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার করার জন্য। দীর্ঘ বিরতির পর আবার নতুন উদ্যমে কাজ করতে চাই। আপনার স্কুল ও এলাকায় এই ধরনের অনুষ্ঠান করতে চাইলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এর জন্য কোন টাকা পয়সা আমাকে দিতে হয় না। আর এই প্রচার আত্ম প্রচার মনে হতে পারে, তবে এরকম কিছু নয়, এটি আমার কাজের প্রচার ও আমার এই উদ্যোগে আপনার সাহায্য যেন পাই তার চেষ্টা মাত্র।

-গোপাল মন্ডল; যোগাযোগ- gmandal100@gmail.com

# দুই-পত্র

-দিবাকর মন্ডল

এক:

এখনও গ্রাম বাংলার মানুষ থেকে শুরু করে শহরাঞ্চলে অনেক মানুষই আছেন, যারা ম্যাজিসিয়ানের জাদু দেখানোটাকে তন্ত্র, মন্ত্র ঈশ্বরের শক্তি এবং ভুতের অস্তিত্বের সঙ্গে বিশ্বাস করেন। অনেকেই মনে করেন ম্যাজিসিয়ানের হাতে থাকা কালো ছোটো লাঠি বা দন্ডটাই তার জাদুবিদ্যার উৎস। আসলে ম্যাজিক কোন তন্ত্র - মন্ত্র, ঈশ্বর বা ভূত-প্রেতের কারিগরি শিক্ষা বা কৌশল নয়; ম্যাজিক হল বিজ্ঞানের কলাকৌশল। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ম্যাজিশিয়ানদের মধ্যে একজন পিসি সরকারের (জুনিয়র) সামান্য একটু তথ্য তুলে ধরলাম বোঝানোর সুবিধার্থে। পি. সি. সরকার জাদুবিদ্যায় কল্পনা, উদ্ভাবনীর ক্ষমতা, প্রদর্শনভঙ্গি, পরিবেশনের মুর্ছনা, জাঁক-জমকপূর্ণ পোশাক, থিয়েটারের কায়দায় দৃশ্যপট, স্বদেশি কায়দায় বাজনা-সহ অভিনয়ে দক্ষ সুন্দর-সুন্দরী সহকারী-সহকারিনীর সঙ্গে

আল্ট্রাভায়োলেট আলোর ব্যবহার করতেন। তিনিই প্রথম এসবের প্রবর্তক।

পি.সি.সরকাররের সেরা ম্যাজিক, বড় আকারের বস্তুগুলি অদৃশ্য করা। তাজমহল এবং ইন্দোর-অমৃতসর এক্সপ্রেস অদৃশ্য করেন। ৪ নভেম্বর ২০০০ সাল, তিনি আগ্রার কাখপুরাতে দুই মিনিটের জন্য তাজমহল "অদৃশ্য" করেন। তিনি কলকাতার ৩০০তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালটি অদৃশ্য করেন। এবং ১৯৯২ সালে ভারতে বর্ধমান জংশনে এক বিশাল জনসাধারণের সামনে যাত্রীদের পূর্ণ ট্রেন অদৃশ্য করেছেন। তিনি লন্ডনের ট্রেফ্লাগার স্কয়ার থেকে, চোখ বেঁধে উচ্চ গতিতে সাইকেল চালান এবং একটি রেকর্ড তৈরি করেন।

পিসি সরকার যতবার ইন্টারভিউ দিতে সামনে এসেছেন ততবারই উনি বলেছেন যে জাদু কোন অলৌকিক ক্ষমতা নয়, শুধুমাত্র বিজ্ঞানকে এমন ভাবে প্রয়োগ করা যাতে তা মানুষের চোখে আশ্চর্য লাগে। এককথায় মানুষের Attention Divert করার কৌশলের অপর নামই জাদু। উনি সবসময়ই বলেন জাদুবিদ্যায় কোনও অলৌকিকত্ব নেই। সবটাই বিজ্ঞান আর কঠোর অনুশীলন। যা ঘটছে সবই দর্শকদের চোখের সামনে, কিন্তু আমরা সেটা বুঝতে

পারছি না। এছাড়া মঞ্চ, আলো, জাদুকরের মুখে অনর্গল কথা, বাজনা... সবকিছুই দর্শকের সামনে এক camouflage তৈরি করে যেটা জাদুকরকে দর্শকের মন divert করতে সাহায্য করে।

বর্তমানে "ট্রিক বিহাইন্ড ম্যাজিক", “ফাইনালি ম্যাজিক'স সিক্রেট রিভিউ” বলে দুটি অনুষ্ঠান হয় যেখানে কিভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে, কারসাজি এবং কৌশলের মাধ্যমে ম্যাজিক প্রদর্শন করে সেগুলো তুলে ধরা হয়। এছাড়াও ফেসবুক এবং ইউটিউব এ প্রচুর ভিডিও পাবেন যেখানে ম্যাজিশিয়ান কিভাবে ম্যাজিক দেখান তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়।

অবশেষে এটাই বলতে পারি যে যত ভালোভাবে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং কলাকৌশল কে কাজে লাগাতে পারে সে তত বড় ম্যাজিশিয়ান। ম্যাজিক বা জাদু কোন দৈবিক বিদ্যা, মন্ত্র, ভূতাত্মা, কোন মানুষের হাড় বা বিড়ালের হাড় (ম্যাজিশিয়ান এর হাতে থাকা ঐ কালো লাঠিটি যা অনেকে ভাবে) প্রভৃতির মাধ্যমে মোটেই হয় না। এগুলো একটা সম্প্রদায়ের নিজেদের ব্যবসা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কল্পনার মাধ্যমে মানুষের মগজের ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। আর তার সঙ্গে বিশ্বাস শব্দটা

যুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এই সমস্ত ভন্ড এবং ভন্ডামির থেকে দূরে থাকবেন।

জেনে রাখুন ম্যাজিক এবং ম্যাজিশিয়ান দুটোই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া; কোনটাই অস্বাভাবিক বা অলৌকিক নয়।

দুই:

আজ অফিস যাওয়ার পথে একটা বিচারকের গাড়ির দিকে চোখ যায়। আমি বরাবরই উৎসুক থাকি নেতা মন্ত্রী, অফিসার, বিচারক, ডাক্তার এদের মুখটা, এদের চেহারাটা দেখার। স্বাভাবিকভাবে ভালো করে লক্ষ্য করার চেষ্টা করছিলাম ভদ্রলোককে কেমন দেখতে, কেমন তার চেহারা, কেমন গঠন। বিচারক বলে কথা! কিন্তু যে জায়গায় গিয়ে আমার চোখ আটকে গেল সেটা হল- আমি দেখলাম ভদ্রলোকের ডান হাতের তর্জনী, মধ্যমা এবং অনামিকা তিনটিতেই পাথর বিশিষ্ট আংটি। দুটি পাথর বেশ বুঝতে পারছিলাম একটি মুক্তা এবং অপরটি নিলা কিন্তু তৃতীয় পাথরটির রং ভালোভাবে বুঝতে পারিনি।

যাইহোক এখানেই আমার প্রশ্ন দেশের বিচারক যদি কুসংস্কারচ্ছন্ন হয়, তিনি কীভাবে অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবেন? যদি কোন অপরাধি বলেন, "আমার মাথায়

শনি ভর করেছিল তাই আমি খুন/ ধর্ষন করে ফেলেছি।" তাহলে কি বিচারক তাকে নীলা পরার পরামর্শ দেবেন? যদি কোন অপরাধি বলে তার মাথা এমনিতেই গরম তাই উল্টোপাল্টা কাজ করেছেন। তাহলে কি তাকে মুক্ত পরার উপদেশ দেবেন?

আজ যে শুধু বিচারককে দেখেছি বলেই বিষয়টা আমার মাথায় লেগেছে তা নয়, এর আগেও আমি বহু শিক্ষককে দেখেছি, আমাদের অফিসের অফিসার কেও দেখেছি এবং অনেক উচ্চশিক্ষিত, পদমর্যাদার লোককেও দেখেছি এই ধরনের কুসংস্কার কে মান্যতা দিতে।

যে দেশের বিচারক, আইন রক্ষক থেকে শুরু করে শিক্ষক, ডাক্তার এদের মত সমাজের আদর্শবান মানুষেরাই কুসংস্কার মানেন, ভুত-প্রেত, জিন, দেব-দেবীতে (আকার এবং নিরাকার) বিশ্বাস রাখেন, তন্ত্র মন্ত্রে আস্থা রাখেন, হাতে - গলায় মাদুলি ঝোলানো থেকে শুরু করে তাবিজ বা আংটি পরা, মানত করা, রোজা, নামাজ, যাগ-যজ্ঞ করা, বলি দেওয়া প্রভৃতি কুসংস্কার মেনে থাকেন। সেই দেশের জনগণ সুবিচার পাবে কিসের আশায় বলতে পারেন? যে মানুষটা বিশেষ একটা ধর্মীয় রীতিনীতিকে মান্যতা দেয়,

সেই মানুষটার থেকে আপনি নিরপেক্ষ বিচার পাবেন, এটা কি সম্ভব?

যে দেশের উচ্চ শিক্ষিত মানুষেররা, যারা জাতির মেরুদন্ড, যারা ছাত্র-ছাত্রীদের আদর্শ, যাদেরকে আমরা ছোটবেলা থেকে জীবনের লক্ষ্য বলে মনে করি তারাই যদি এমন আচরণ করে থাকেন। সেই দেশের গ্রাম্য, খেটে খাওয়া, অর্ধ শিক্ষিত, অশিক্ষিত মানুষদের আপনি কিভাবে কুসংস্কারমুক্ত করবেন বলতে পারেন?

Dibakar Mondal

C/O- Nabin Ch. Mondal

Pramanik para, jafarpur

Falta, S 24 pgs

> "আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে করিব; লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"

-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

# ধর্ম কেন ব্যবসা?

-রাজেশ মন্ডল

আজকের ভারতবর্ষে মানুষ অসহায় যুক্তিহীন হয়ে পড়েছে বেশি বেশি করে। তার একটি প্রধান কারণ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা। তারা চায় মানুষ ধর্ম নিয়ে মেতে থাকুক। তার জন্য যা যা করার দরকার সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত সমস্ত ব্যবস্থা তারা করে রেখেছে। এই অন্ধ বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা অপরিসীম। তারা 'মানুষ'কে মানুষ হয়ে ওঠার উপাদান দিতে পারুক আর না পারুক ধর্মীয় অমানুষ করার কাজে তাঁদের ছাপ স্পষ্ট। কার্যত এখন ভারত বিভক্ত কে বড় হিন্দু, আর কে বড় মুসলমান এই প্রমাণে। এই খেলা তৈরিতে সরকারও ১০০% সফল। আর এই খেলা চালানোর জন্য পুঁজির কখন অভাব হয় না, সে দূর্গাপূজায় ৬০,০০০ করে দেওয়া থেকে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও ধর্মীয় শিক্ষালয় মাদ্রাসা সরকার দ্বারা পরিচালনা করে। পৃথিবীতে এমন একটি দেশ কোথাও খুঁজে পাবে না তুমি যেখানে খিদের তাড়নায় মানুষ মারা যায় প্রতিনিয়ত, সেখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সরকারের খরচ কয়েক হাজার কোটি। গরিব মানুষ সব থেকে বেশি কায়িক পরিশ্রম করে এবং দিনরাত ভগবান করে, এই পরিস্থিতি থেকে সে মুক্তি পেতে চায়

কিন্তু কোনও উপবাস ত্রাতার ভূমিকা নিয়ে তাঁকে মুক্তি দেয় না বরং জোতিষী মশাই শনির দৃষ্টি পড়েছে বা বৃহস্পতির দৃষ্টি নেই বলে পাথর দিয়ে টাকা কামানোর ব্যাবস্থা করেছে মানুষ দিব্যি তা গ্রহণ করে দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে জীবন কাটাচ্ছে।

এরপর এই সমস্ত করে যখন কোন কূল কিনারা পায় না তখন সেই গুরু মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। গুরু তাকে ভাল করে ভগবান দর্শনের পথ বলে দেয়। যা বলে তাই দৈববাণী অন্ধের মতো বিশ্বাস করতে থাকে। এই অবধি সব ঠিক ছিল, গুরু আবার নিজের ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য তাতে অতি চালাকের সাথে শিষ্যকে দিয়ে তাঁর খ্যাতি প্রচার করতে থাকে। এই গুরুরা ভালো করেই জানে 'যত শিষ্য তত টাকা', কিন্তু আপনি মুক্ত মনের মানুষ হয়ে শিষ্যের কাছে জিজ্ঞাসা করবে গুরু সম্পর্কে। শিষ্য যা বিবরণ দেবে তা হল এই তার গুরু খুব সরল ভালমানুষ, নিরামিষ আমিষ, মরা বাড়ি যাওয়া কোন কিছুতেই তার গুরু কোন টাকা পয়সা চায় না। কিন্তু একটু ঠিক খবর নিলে জানা যাবে। গুরু হওয়ার আগে সে হকার কিংবা 420 জাতীয় লোক ছিল। টাকাপয়সা ছিল না, গুরু হওয়ার পর সে কোটিপতি কিছু লাখপতিও আছে। তারা শিষ্য বাড়িয়ে কোটিপতি হওয়ার প্রতিযোগিতায় আছে। শিষ্যরা মোটে বুঝতে চায় না গুরুপ্রীত রাম রহিমের ও তাঁদের মতো 2 কোটি শিষ্য ছিল।

এই ভণ্ড বাবা দের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে পারে একমাত্র যুক্তিবাদী মন। যুক্তিবাদী মনের একজন করে প্রতিটা গ্রামে গ্রামে তৈরি হলে এই কুযুক্তির অন্ধকার থেকে মানুষকে মুক্তির আলো দেখাতে পারবে। যুক্তিবাদ যখন প্রতিটা ঘরে পৌঁছবে ভন্ড রাজনীতি শেষ হবে। সাথে পুঁজিবাদ ধ্বংস হয়ে যাবে। মানুষ তার অধিকার বুঝতে শিখবে।

> "কোনো ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর বলে একেবারেই কিছু নেই। ঈশ্বর বস্তুটিকে যে প্রথন আবিষ্কার করেছিলেন সে একটা অর্বাচীন। যারা বাজারে ঈশ্বরের বিজ্ঞাপন করে তারাও এক একটি স্কাউন্ড্রেল। ঈশ্বরের উপসনা একটি আদিমতা।"
>
> \- পেরিয়ার রামস্বামী।

# ত্রিবিধ

-চয়ন আচার্য্য

প্রথম:

পরিবেশ বান্ধব সবুজ আতশ বাজি কতটা পরিবেশ বান্ধব?

মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী পরিবেশ বান্ধব সবুজ আতশবাজি ব্যবহারের নিদান দিয়েছে রাজ্য সরকার। সবুজ আতশবাজি ঠিক কতটা পরিবেশ বান্ধব? একটু খতিয়ে দেখা যাক। আতশবাজি বলতে সাধারনত আমরা বুঝি যে বাজি আকাশে উঠে ফাটে এবং রংবেরং এর ফুলকি ছড়ায়। এই বাজি গুলিতে থাকে বেরিয়াম নাইট্রেট,(সবুজ আলোর জন্য) পটাশিয়াম নাইট্রেট, অ্যালুমিনিয়াম পাউডার(রুপোলী ফুলকির জন্য), পটাশিয়াম ক্লোরেট (চলতি ভাষায় কলেরা পটাশ) এবং সালফার। অধম লেখক বাল্যকালে তুবড়ী বানানোয় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নিবেদন করছে এই রাসায়নিক পদার্থ পুড়লে যে ক্ষতিকারক ধোঁয়া উৎপন্ন হয় (বিশেষ করে সালফার ডাই অক্সাইড ও কার্বণ মনোক্সাইড) পরিবেশের সমগ্র জীবকূলের জন্য প্রাণঘাতী ও ক্ষতিকারক। সবুজ রং হলেই যে তা প্রাকৃতিক এবং পরিবেশবান্ধব

এরকম মন্তব্য রীতিমতো অর্বাচীনসুলভ। ভিক্টোরিয়ান ইংলন্ডে 'শিলোজ গ্রীণ' নামের সবুজ রং বানিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা হত যা ওয়ালপেপারে ব্যবহার করা হত। প্রচুর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায় এই রং কারণ আর্সেনিক ছিল এর একটি অন্যতম উপাদান। পরিশেষে বলতে চাই, পরিবেশবান্ধব বাজি আর ঝগড়াবান্ধব স্ত্রী হল কবির কল্পনা। বাস্তবে ইহার অস্তিত্ব নাই। আর প্রকৃতিমাতার ধ্বংসসাধন করে মাতৃপূজা আমাদের মত হিপোক্রিটরা আমরণ চালিয়ে যাবে। সুতরাং এত লম্বা লেখা বৃথা পন্ডশ্রম।

দ্বিতীয়:

**রথযাত্রা: একটি বাল্য স্মৃতি ও উপলব্ধি**

যখন খুবই ছোট বয়স হয়তো নয় বা দশ তখন রথের দিন মানে একটা উৎসবের দিন। শুরু হয়েছিল একতলা একটা কাঠের রথ থেকে, একই রথ বছর দুয়েক চালানোর পর প্রমোশন পেলাম। দুতলা কাঠের রথ জুটলো। রঙিন কাইট পেপার দিয়ে রথ সাজানো, ফুলের মালা দিয়ে জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা মূর্তিগুলিকে সাজানো, সেকি উত্তেজনা! যখন একতলা রথ ছিল তখন একটাই মূর্তি ব্যবহার করতাম যেটার দুপাশে জগন্নাথ বলরাম আর মাঝে

সুভদ্রা। যখন দু তলা রথ পেলাম তখন আলাদা আলাদা মূর্তি ওপর তলায় জগন্নাথ নিচের তলায় বলরাম সুভদ্রা। অনেক পরে প্রমোশন হয়ে তিন তলা রথ জুটে ছিল, যেখানে তিনজনকে আলাদা আলাদা ফ্লোরে একোমোডেশন দেওয়া গেল। তার আগে অবধি বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক লাগতো দুতলা রথের উপরতলায় কে থাকবে? জগন্নাথ নাকি তার বড়ভাই বলরাম!এদের মধ্যে কে বড়? শ্রীজগন্নাথ! যিনি শ্রীহরি বিষ্ণুরই রূপ হিসেবে আরাধ্য নাকি তার বড় ভাই শেষনাগের অবতার বলভদ্রদেব!

যাইহোক, একবার রথের বিকেল বেলা রথ সাজিয়ে বের হয়েছি প্রসাদ হিসেবে বাটিতে রেখেছি কিছু নকুল দানা যাকেই সামনে পাচ্ছি হাতে একটা করে নকুল দানা দিচ্ছি আর বদলে এক টাকা, দু টাকা, ৫০ পয়সা এরকম করে প্রনামী পাচ্ছি। সন্ধে ছটার সময় দেখলাম ৭ টাকা মত হয়েছে। সেখান থেকে আবার দু টাকা ইনভেস্ট করে দুটো মোমবাতি আর নকুল দানা কিনে অন্য পাড়ার দিকে এগোলাম, হাতে ঘড়ি পড়তাম না ঘুরছি তো ঘুরছি, সময়জ্ঞান আর নেই, যাকে পাচ্ছি হাতে একটা করে নকুল দানা দিচ্ছি আর প্রণামী নিচ্ছি। যখন হুশ হলো তখন বেশ রাত। গুনে গেঁথে দেখি প্রায় ৫০ টাকার কাছাকাছি খুচরো

পেয়েছি। বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখতে পেলাম সামনের ল্যাম্পপোস্টের নিচে বাবা দাঁড়িয়ে আছে। ভয়ে আত্মা দেহ ছাড়া হয়ে যাবার জোগাড়! তড়িৎগতিতে গেট দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে পিঠে প্রথম চপ্পল এর বাড়িটা পড়ল। তারপর বলাবাহুল্য প্রচুর মারধর জুটলো। এখনো মনে আছে বাবার শাসন বাণী, ঘন্টা নাড়বে? পুরুতগিরি করবে বড় হয়ে?

বর্তমানে মনে প্রশ্ন জাগে বাবা এখনকার ধর্মগুরু স্পিরিচুয়াল মোটিভেটরদের আশ্রম, বাড়ি, গাড়ি, হেলিকপ্টার এবং সেমিনার দেখলে কি ভাবতেন? সেই বাল্য বয়সেই বুঝে গিয়েছিলাম প্রায় বিনা ইনভেস্টমেন্টে ধর্মব্যবসায় কিরকম ভয়ংকর প্রফিট। যত দিন যাচ্ছে আশেপাশের পরিচিত মানুষজনগুলিকে যুক্তি,বোধ, বুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে কিরকম পাগলের মত আচরণ করতে দেখছি, ধর্মের নামে গলা কেটে ফেলা রাজনীতি,পরমতঅসহিষ্ণুতা গ্রাস করে ফেলছে এই উপমহাদেশকে।

তৃতীয়:

**কাঁচা বাদাম:**

সোসাল মিডিয়ায় বীরভূমের দুবরাজপুরের ভূবন বাদ্যকরের বাদাম ফেরী করার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।

ভাইরাল হওয়ার মূল কারণ হলো ভুবনের একটি গান,যে গানটি গেয়ে সে বাদাম ফেরি করত।

গানটির কথা গুলি হল- মোবাইলের বডি ভাঙ্গা, পায়ের তোড়া, হাতের বালা থাকে যদি সিটি গোল্ডের চেন /দিয়ে যাবেন/ তাতে সমান সমান বাদাম পাবেন।/বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম।/আমার কাছে নাইকো কোনো ভাজা বাদাম।

-গানটি যে ভিডিও থেকে ভাইরাল হয়, তার অডিও ক্লিপ টা নিয়ে তার সাথে কিবোর্ড স্যাম্পলিং করে, ডিজে বিট যোগ করে একটা ধামাকাদার গান ইন্টারনেটে ছেড়েছে কিছু ক্রিয়েটিভ মিউজিশিয়ান। এই গানটির একাধিক ভার্শন এখন ইন্টারনেটে সোশ্যাল মিডিয়ার সাইটগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দরিদ্র বাদামওয়ালার মুখের গান শুনছে বিশ্ববাসী। কিন্তু প্রশ্ন এটা যে এই অদ্ভুত বিনিময় প্রথার মাধ্যমে যে বাদাম ব্যবসা তাতে ভুবন বাদ্যকরের লাভটা কোথায়? দুঃখের বিষয় আমি দর্শকবৃন্দকে এই গানটি নিয়ে টিক টকে কোমর দোলাতে দেখেছি। কিন্তু এই প্রশ্নটা কাউকেই করতে শুনিনি। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি তে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের ই বর্জ্য সংক্রান্ত একটি প্রজেক্টে অংশগ্রহণ করায় আমার কাছে এর একটি

সম্ভাব্য উত্তর আছে। ভারতে খুব জনপ্রিয় না হলেও অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের দেশ গুলিতে অর্থ উপার্জনের একটি নতুন অল্টারনেটিভ পেশা হিসেবে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে আরবান গোল্ড মাইনি। শহরে তো সোনার খনি নেই! তাহলে সোনা উত্তোলন করা হচ্ছে কোথা থেকে? এর উত্তর হলো বিভিন্ন পুরোনো ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যের মধ্যে সোনার ব্যবহার খুবই প্রচলিত। কম্পিউটারের মাদারবোর্ডের, প্রসেসরের, মোবাইলের পিসিবি'র অনেক যন্ত্রাংশই সোনার তৈরি বা গোল্ড প্লেটেড। তবে এই ই-বর্জ্য থেকে সোনা সংগ্রহ সহজ নয়। ব্যবহার করা হয় নাইট্রিক অ্যাসিড সায়ানাইড এর মত ভয়ঙ্কর রাসায়নিক। সম্ভবত ভুবন বাদ্যকর ও হয়তো নিজে অথবা অন্য কারো সহায়তায় আরবান গোল্ড মাইনিং এর কাজটি করে চলেছে। মনের ইচ্ছা কাঁচা বাদাম গানটির মত যেন এই পেশা টিও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, এবং এই পেশার হাত ধরে কিছু অংশ হলেও ই-বর্জ্যের রিসাইকেলিং যেন সম্পন্ন হয়।

চয়ন আচার্য্য

L.L.B (final year) Burdwan University.

M.A Film Studies, Jadavpur University.

# মৃত্যু যখন জীবনদায়ক

- অমলকান্তি

মৃত্যু এক চিরন্তন সত্য, যা গ্রহণ করা অত্যন্তই কঠিন। যে কোনো মৃত্যু মাত্রই তার নিকটস্থের কাছে তা শোকবিহ্বল। এই মৃত্যু যদি অকালে হানা দেয় দেহে, তবে তা আরও বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। এক গভীর শূণ্যতা সৃষ্টি করে দিয়ে যায় মৃত্যু।

এই মৃত্যু ঘটে দুইভাবে। এক, সাধারণ মৃত্যু যাকে বলা হয় কার্ডিও রেসপিটরি ফেলিয়র যা ঘটে কোন অসুখের কারণে। দুই, ব্রেন ডেথ বা মস্তিষ্ক কান্ডের মৃত্যু যা ঘটে মস্তিষ্কে রক্ত ক্ষরণের ফলে।

কিন্তু, মৃত্যু যেমন এক কঠিন সত্য; তেমনি এই মৃত্যুই পারে অন্য কোনো মৃত্যু পথগামীর জীবনে জীবনের আলো বয়ে আনতে। মৃত্যু হয়ে উঠতে পারে জীবনদায়ক। স্বাভাবিকভাবেই, আমরা দেখে থাকি মানুষেরা মারা গেলে তাদের নিজস্ব ধর্মানুসারে হয় পুড়িয়ে ফেলে, দাফন্ করে, বা আরও অন্যান্য ভাবে মৃতদেহকে নষ্ট করা হয়। তাদের

কাছে মৃতদেহ যেনো একটা সামাজিক আবর্জনা স্বরূপ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মৃতদেহ একটি সম্পদ চিকিৎসাশাস্ত্রে। মৃতের শরীর থেকে বিভিন্ন অঙ্গ(Organs)ও কলা (tissues) সংগ্রহ করে মৃত্যুপথযাত্রী কোনো মানবদেহের মধ্যে তা প্রতিস্থাপন করা যায়।

**একমাত্র মৃত ব্যক্তির সক্রিয় ও উপযুক্ত অঙ্গ সংগ্রহ ও প্রতিস্থাপন করা হয়। এক্ষেত্রে চিকিৎসক'রা বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দাতা অরগ্যান বা টিস্যু সংগ্রহ সম্ভব কিনা যাচাই করে নেবেন।**

মৃতদাতার ক্ষেত্রে যে বয়স সীমা মেনে চলা হয় তা হলো, কিডনি, লিভার: ৭০ বছর পর্যন্ত। হার্ট, ফুসফুস: ৫০বছর পর্যন্ত। প্যানক্রিরিয়া, অন্ত্র: ৬০-৬৫ বছর পর্যন্ত। কর্ণিয়া, ত্বক: ১০০ বছর পর্যন্ত। হার্ট ভালভ: ৫০ বছর পর্যন্ত। অবহাড়: ৭০ বছর পর্যন্ত। অবশ্যই কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে। এর পরবর্তী প্রশ্ন আসবে মৃত দাতার থেকে গৃহীত প্রত্যঙ্গগুলি কত তাড়াতাড়ি প্রতিস্থাপন করা উচিত?

হার্ট ও হার্ট ভালভ (৪ থেকে ৬ ঘন্টার মধ্যে)। ফুসফুস (৪ থেকে ৮ ঘন্টার মধ্যে)। ইনটেস্টাইন (৬ থেকে ১০ ঘন্টার মধ্যে)। লিভার (১২ থেকে ১৫ ঘন্টার মধ্যে)। প্যানক্রিয়াস

(১২ থেকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে)। কিডনি (২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে)। এই বিস্তারিত আলোচনার মধ্য দিয়ে একটা বিষয় পরিষ্কার যে মৃত্যুর আমাদের মরদেহ হয়ে উঠতে পারে নব জীবনদানের আধার। জীবিতকালে আমরা নিজের নির্বাচিত কোন ব্যাক্তিকে আমার নিজের কিছুটা লিভার, একটি কিডনী এবং রক্ত দিতে পারি। অন্যকিছু নয়। কিন্তু মরণোত্তর কলা বা প্রত্যঙ্গদানের ক্ষেত্রে আমাদের নির্বাচিত কোন ব্যাক্তিকে তা পারিনা।

এক্ষেত্রে আমাদের একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার রক্ত বা কলা কিংবা প্রত্যঙ্গ কোনভাবেই কেনা বা বেচা যাবে না। যা আইনবিরুদ্ধ। এই মর্মে, চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে গত ১৪ই আগস্ট, ২০২২ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ (উদয়নারায়ণপুর বিজ্ঞান কেন্দ্র), উদয়নারায়ণপুর ব্লকের ডিহিভূরসুট অঞ্চলে একটি মরণোত্তর চক্ষুদান-দেহদান শিবির আয়োজন করে। এই শিবিরে ৫২জন চক্ষুদান করেন ও ৬ জন করেন দেহদান। এই প্রগতিশীল দাতা'রা জন্মান্তরবাদের মিথ্যা ধারণাকে নস্যাৎ করে এগিয়ে এসেছেন এই কর্মকাণ্ডে। তাঁরা বুঝেছেন জন্মান্তরের কথা আসলে ভন্ড জ্যোতিষী - তান্ত্রিক দ্বারা অর্থ-লুটের কৌশল। তারা প্রশ্ন করতে শিখেছেন, যদি জন্মান্তরবাদ সত্য হয়

তাহলে যারা হিরোশিমা, নাগাসাকি' তে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে মারা গেছেন, যাদের দেহের নামমাত্র চিহ্নটুকুও মেলেনি তাহলে তারা আবার জন্ম নিলে কোন অঙ্গ নিয়ে জন্ম নেবে? একই সময়, একই জায়গায় ঐ যে লাখ লাখ মানুষ মারা গেলেন তবে কী তাদের সবাইয়েরই পূর্বজন্মের কর্মফল এক ছিলো? ঐ লাখ লাখ মানুষ কী একই দিনে, একই তিথি-নক্ষত্র অনুসারে জন্মগ্রহণ করেছিলো? তাহলে ঐ বিস্ফোরণে যারা মারা গেছিলেন তারা সবাই একই বয়সের?

জানি প্রশ্নগুলোর উত্তর যুক্তিগত ভাবে খুব সহজ তাই তার বিশ্লেষণও সহজ। এই সমস্ত কুসংস্কারের অন্ধকারকে নস্যাৎ করে দিয়ে, কোনো দৃষ্টিহীন বা কোনো মৃত্যু পথগামীর জীবনে জীবনের আলো জ্বালিয়ে দেওয়ার কারণ হয়ে উঠুন। মরণোত্তর চক্ষুদান-দেহদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হন।



## মরণোত্তর দেহদান তিন পরিবারের মোট আট সদস্যের

**মফিদুল ইসলাম, বহরমপুর**

মরণোত্তর দেহদান করলেন তিন পরিবারের মোট আটজন। তার মধ্যে এক মুসলিম পরিবারের চারজন সদস্যও রয়েছেন। মুর্শিদাবাদের বহরমপুর থানার বাসিন্দা লতিফ সরকার (৬৬) পেশায় ছাপাখানার কর্মী, তার স্ত্রী নাদিরা বেগম (৫৬) পেশায় গৃহবধূ, তাদের ছেলে সুমন সরকার (৩৩) পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক। একসঙ্গে মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করলেন। অন্যদিকে, নওদা থানার সর্বাঙ্গপুর গ্রামের এক কৃষক পরিবারের স্বামী, স্ত্রী ও তাঁদের দুই সন্তান একদিনে মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করেন। সর্বাঙ্গপুরের প্রান্তিক কৃষক সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস (৫৫), তাঁর স্ত্রী মায়ারানি বিশ্বাস (৪২) গৃহবধূ। তাদের দুই সন্তান শুকদেব বিশ্বাস (২৪) ও সুকান্ত বিশ্বাস (২১) চাষাবাদের সঙ্গেই যুক্ত। কান্দির ভূমিপুত্র বর্তমানে বহরমপুরের বাসিন্দা পেশায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি বছর পঁয়তাল্লিশের সোনা সেখও এ দিন মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করেন।

ছাপাখানার কর্মী লতিফ সরকার বলেন, প্রথম থেকেই আমাদের পরিবার বিজ্ঞানমনস্ক। তাছাড়া পঁচিশ বছর বয়স থেকে আমি 'উত্তরণ সমাজ' নামে এক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। যে সংস্থার মূল মন্ত্র মানুষের উত্তরণ, মানুষের উত্তরণ। সেই ভাবনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই আজ স্ত্রী, ছেলে সহ মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করলাম। মেয়ে কবিতা সরকার (৩৫) ও মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করবে বলে জানান তিনি। তাঁরা চাইছেন, মৃত্যুর পর তাঁদের অঙ্গ অন্যের শরীরে প্রতিস্থাপিত হোক। সুভাষবাবু বলেন, সমাজের জন্য কিছুই করতে পারিনি। তাছাড়া মৃত্যুর পর শরীর টাকে পুড়ে ছাই করে ফেলা হয়। তাই মৃত্যুর পর শরীরের কোনও অঙ্গ যদি কারও কাজে লাগে, সেটাই বড় প্রাপ্তি। মানবাধিকার কর্মী সোনা সেখও চাইছেন মৃত্যুর পর দেহ এবং অঙ্গ মানবসমাজের কাজে লাগুক। ডাক্তারদের কর্মবিরতির মাঝেই তাঁরা এ দিন মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার পত্রে সই করেন।

অভিনন্দন

# প্রণাম বনাম সম্মান

-অভিজিৎ ব্যানার্জী

ছোটো থেকেই শুনে আসছি বড়োদের সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাতে নাকি প্রণাম করতে হয়। বেশ খুব ভালো কথা। তবে ধরুন কারোর প্রণাম করতে ভালো লাগে না বা তাড়াহুড়ো এর মধ্যে করা হলো না তার মানে কী তিনি মানুষকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে না।

ধরুন বাড়িতে কোনো আত্মীয় এলো আপনি ওনাকে আসা মাত্রই প্রণাম করলেন এবং মনে মনে ভাবলেন না বলে চলে এলো, কতোদিন থাকবে কে জানে, চলে গেলে ভালো হয়। এক গ্লাস জলও দিলেন না, যতক্ষণ না পর্যন্ত না বললেন উনি।

অন্যদিকে, ধরুন বাড়িতে কোনো আত্মীয় এলো আপনি ওনাকে আসা মাত্রই প্রণাম করলেন না কিন্তু ওনাকে দেখে খুব খুশি হলেন, বসতে বললেন, গল্প করলেন, নিজের হাতে জল খাবারের ব্যবস্থা করলেন। কোনটা দরকার প্রথম নাকি দ্বিতীয়টা? নিশ্চয়ই দ্বিতীয়টা। অনেকে

বলবেন দুটোই দরকার। কিন্তু কেনো দরকার দ্বিতীয়টাতেই যখন উপযুক্ত সম্মান জানানো হয়ে যায় তখন প্রণামের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়। ধরুন কেউ কোনো বড়ো মানুষের সাথে দেখা হবার পর প্রণাম জানাতে ভুলে গেলো কাজের চাপে, তার মানে কি তিনি মানুষকে সম্মান জানাতে জানে না? সম্মান ও শ্রদ্ধা আসে মন থেকে, সম্মান ও শ্রদ্ধা বিবেচনা করুন মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার দেখে, প্রণাম তো লোক দেখানোও করা যায়, মানুষকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করার মাপকাঠি কখনো প্রণাম হতে পারে না, সম্মান ও শ্রদ্ধা বোঝা যায় মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার দেখে। মানুষকে ভালোবাসুন, যত্ন করুন ও মানবিকতা বজায় রাখুন। ধন্যবাদ।

# অন্ধকারের উপাসনা

-মহম্মদ মহসীন

দুই বন্ধুই নামকরা চিকিৎসক, অর্থাৎ সমাজের দৃষ্টিতে বেশ লেখাপড়া করা শিক্ষিত লোক।

তাঁদের একজনের সমস্যা, তিনি কিছুতেই সিগারেট ছাড়তে পারছেন না, অথচ খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন, সিগারেট না ছাড়লেই নয়। অন্যজন মদ্যাসক্ত ছিলেন, এখন ছেড়ে দিয়েছেন। না, সিগারেটের নেশা তাঁর নেই। তিনি নিজেকে দেখিয়ে বন্ধুকে বলেন, আমি মদ ছেড়ে দিতে পারলাম, আর তুই সিগারেট ছাড়তে পারছিস না। অন্য জনের যুক্তি, মদ তো খেতিস একবার শুধু সন্ধ্যে বেলায়। ও ছাড়া এমন কি আর কেরামতি। আমি সিগারেট খাই দিনরাত, সব সময়, দিনে অন্তত দশবার। সেটি ছাড়া কি মুখের কথা। তবে আমি চেষ্টা চালাচ্ছি। একেবারে ছেড়ে দেওয়া যাবে না, একটা করে কমাচ্ছি। এই যেমন সামনের মাস থেকে প্রতিদিন গুনে গুনে নয়টির বেশি খাবো না।

আমাদের ধর্মের নেশাটিও ঠিক এমনটাই। ভোর থেকে দুপুর রাত, এমনকি রাত্রির মধ্যেও, জীবনের প্রতিটি কাজেই ধর্মের অনুষঙ্গ। নেশা যাতে কেউ ছাড়তে না পারে তার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা।

দুটি লোকের দেখা হচ্ছে, “আসসালামু আলায়কুম, ওয়ালেকুম আসসালাম, ওয়া বরকাতুহু, আল্লাহ তোমার কে আশির্বাদ করুক, তোমার ধনবৃদ্ধি ঘটুক”, গুরুর জয়, রামকৃষ্ণের জয়, সারদার জয়, শ্রীরামের জয়, বাবার জয়, মাতার জয়। এর মূল লক্ষ্য আপনার নেশাকে প্রতিক্ষণে জাগিয়ে রাখার কৌশল। এগুলি হলো নেশা চাগিয়ে তোলার মন্ত্র। অন্ধকারের উপাসনা।

এই উপাসনা মানুষকে করে তোলে নির্বোধ। করে তোলে স্বার্থপর। শেখায়, তুমি একা। এসেছ একা, যাবে (কোথায়?) একা। এরা ভিক্ষা দেয় স্বর্গের লোভে, অপরের পাশে দাঁড়ায় স্বর্গের লোভে। এরা জানে এটা তার নিজের ধর্ম। এটা আছে বিপদে। অতএব মনের মাঝে পুষে থাকে এক ঘৃণা। প্রতিনিয়ত চলে এই কু-শিক্ষা।

মহালয়া। তর্পন করে। পিতৃপুরুষের আত্মাকে তিল জল খেতে দেয়। জিজ্ঞেস করি, তাহলে যে শুনেছিলাম আত্মা কিছু খায় না। আর আমায় কিছু খেতে দাও, খাওয়ার পর, দেখ প্লেট খালি।

**তোমরা যে খেতে দাও আত্মাকে, খাবার কি চোখের সামনে ভ্যানিশ হয়?**

**তাহলে আত্মা খাচ্ছে কিভাবে বুঝলে?**

আত্মা খাচ্ছে না, কারণ আত্মা নেইই।

আর যদি থাকেই, সে আত্মারও জাত সম্প্রদায় আছে। হিন্দু আত্মার পূনর্জন্ম হয়। মুসলিম, খৃষ্টান, ইহুদি আত্মার পূনর্জন্ম হয় না।

আত্মা অন্য জন্ম নেয়, এই যদি আপনার বিশ্বাস হয় তাহলে, তাহলে সে কিভাবে সে আপনার তর্পনে সাড়া দেবে? সে তো ইতোমধ্যেই জন্ম নিয়ে বড় হয়ে হয়তো সেও এক মৌলানা অথবা চারর এর ফাদার। ও হিন্দু আত্মা শুধু হিন্দুই হয়। তাহলে হয়তো সে বড় হয়ে আজ তার নতুন বাবার তর্পন করছে। তাহলে আপনি কেন তার তর্পন করছেন?

অর্থাৎ একই সাথে দুই বিপরীত কাজ করে বোঝাচ্ছেন, ধর্ম আপনার যুক্তিবাদী মানুষকে অন্ধ করে দিয়েছে।

ধর্মে কোনো যুক্তি চলে না।

একজন মুসলিম বিশ্বাস করে হজরত মোহাম্মদ গাধায় চড়ে মাহাকাশ ভ্রমণ করেছিল। আমাদের মহাপুরুষেরা ধর্মের এজেন্ট। প্রতিটি মুহূর্তে তারা মানুষকে অন্ধকারের উপাসনার শিক্ষা দিয়ে চলে। সমাজে তা প্রতিষ্ঠা পেয়ে আসছে।

এ জগদ্দল পাথর সরানো একদিনের কর্ম নয়, জেনেই যুক্তিবাদীরা আলো আনার প্রচেষ্টা করে চলেছেন। নিরন্তর। নিরলস।

# নাস্তিকতাও একটি ধর্ম (কিংবা বিশ্বাস) হলে

-মুক্তমনা অভিজিৎ রায়

ভাবছি দর্শন শাস্ত্রের প্রচলিত কিছু শব্দার্থ বিশ্লেষণ করে গুটি কয় হাল্কা ধরনের পোস্ট দেব সামনে। আমি দেখছি মুক্তমনায় লেখেন অথচ দর্শনের প্রান্তিক কিছু ব্যাপারে খুব অস্পষ্ট ধারনা রাখেন আমাদের অনেকেই। অনেকেই জানেন না আদি কারণ সম্বন্ধে, অক্কামের ক্ষুর কিংবা প্যাস্কালের ওয়েজার সম্বন্ধে, কিংবা গুলিয়ে ফেলেন নাস্তিকতাও একটি ধর্ম কিনা এ বিষয়ে। আমি এর আগে মেসবাহউদ্দিন জওহের নামে এক ভদ্রলোকের সাথে বিতর্ক করতে গিয়ে এগুলো নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লিখেছিলাম। ভাবছি ছোট আকারে দু চারটি লেখায় বিষয়গুলো আবারো তুলে আনবো। মুক্তমনা ব্লগে বিষয়গুলোর আলাদা উপস্থিতি দাবী করে বলে আমার ধারণা।

আমি দেখেছি অনেকেই বুঝে হোক, না বুঝে হোক, এই ব্যাপারটি মাঝে মধ্যে এভাবেই আউরে দেন যে, আস্তিক্যবাদের মত নাস্তিক্যবাদও একধরনের বিশ্বাস। আস্তিকরা যেমন ‘ঈশ্বর আছে’ এই মতবাদে বিশ্বাস করে, তেমন নাস্তিকরা বিশ্বাস করে ‘ঈশ্বর নেই’ – এই মতবাদে। দুটোই নাকি বিশ্বাস। যেমন, এই ব্লগে শামীম সাহেব

রায়হানকে উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন –"নাস্তিক মানেই বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে যে "ঈশ্বর নেই"। কিন্তু "ঈশ্বর নেই" এটি প্রমানিত সত্য নয়। শুধু যুক্তি দিয়েই বুঝানো সম্ভন "ঈশ্বর নেই" বিবৃতিটি আসলে ফাকিবাজি।"

নাস্তিক মানেই বিশ্বাসী, কিংবা নাস্তিকতাবাদও একটি বিশ্বাস – এগুলো ঢালাওভাবে আউরে দিয়ে নাস্তিক্যবাদকেও এক ধরনের 'ধর্ম' হিসেবে হাজির করার চেষ্টাটি আমি বহু মহলেই দেখেছি। নাস্তিকদের এভাবে সংজ্ঞায়ন সঠিক কি ভুল, তা বুঝবার আগে 'নাস্তিক' শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থটি আমাদের জানা প্রয়োজন। 'নাস্তিক' শব্দটি ভাংগলে দাঁড়ায়, নাস্তিক + কন বা নাস্তি+ক। 'নাস্তি' শব্দের অর্থ হল নাই, অবিদ্যমান। 'নাস্তি' শব্দটি মূল সংস্কৃত হতে বাংলায় এসে 'ক' বা 'কন' প্রত্যয় যোগে নাস্তিক হয়েছে যা তৎসম শব্দ হিসেবে গৃহীত। ন আস্তিক = নাস্তিক – যা ন ঞ তৎপুরুষ সমাসে সিদ্ধ এবং আস্তিকের বিপরীত শব্দ। আরো সহজ করে বাংলায় বললে বলা যায়, না + আস্তিক = নাস্তিক। খুবই পরিস্কার যে, সঙ্গত কারণেই আস্তিকের আগে 'না' প্রত্যয় যোগ করে নাস্তিক শব্দটি তৈরী করা হয়েছে। আস্তিকরা যে ঈশ্বর/আল্লাহ/খোদা ইত্যাদি পরম সত্ত্বায় বিশ্বাস করে এ তো সবারই জানা। কাজেই নাস্তিক হচ্ছে তারাই, যারা এই ধরণের বিশ্বাস হতে মুক্ত। তাই সংজ্ঞানুযায়ী নাস্তিকতা কোন বিশ্বাস নয়, বরং 'বিশ্বাস হতে মুক্তি' বা 'বিশ্বাসহীনতা'।

## ইংরেজীতে নাস্তিকতার প্রতিশব্দ হচ্ছে ‘Atheist’। সেখানেও আমরা দেখছি theist শব্দটির আগে ‘a’ প্রিফিক্সটি জুড়ে দিয়ে Atheist শব্দটি তৈরী করা হয়েছে।

নাস্তিকতা এবং মুক্তচিন্তার উপর বহুল প্রচারিত গবেষণাধর্মী একটি ওয়েব সাইটে শব্দটির সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে এভাবে –

Atheism is characterized by an absence of belief in the existence of gods. This absence of belief generally comes about either through deliberate choice, or from an inherent inability to believe religious teachings which seem literally incredible. It is not a lack of belief born out of simple ignorance of religious teachings.

সহজেই অনুমেয় যে, ‘absence of belief’ শব্দমালা চয়ন করা হয়েছে ‘বিশ্বাস হীনতা’কে তুলে ধরতেই, উলটোটি বোঝাতে নয়। Gordon Stein তাঁর বিখ্যাত ‘An Anthology of Atheism and Rationalism’ বইয়ে নাস্তিকতার (Atheism) সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে বলেন,

‘When we examine the components of the word ‘atheism,’ we can see this distinction more clearly. The word is made up of ‘a-‘ and ‘-theism.’ Theism, we will all agree, is a belief in a God or gods. The prefix ‘a-‘ can mean ‘not’ (or ‘no’) or ‘without’. If it means ‘not,’ then we have as an atheist someone who is not a theist (i.e., someone who does not have a belief in a God or gods). If it means ‘without,’ then an atheist is someone without theism, or without a belief in God’. (Atheism and Rationalism, p. 3. Prometheus, 1980)

আমরা যদি atheist শব্দটির আরো গভীরে যাই তবে দেখব যে, এটি আসলে উদ্ভুত হয়েছে গ্রীক শব্দ ‘a’ এবং ‘theos’ হতে। গ্রীক ভাষায় ‘theos’ বলতে বোঝায় ঈশ্বরকে, আর ‘a’ বলতে বোঝায় অবিশ্বাস বা বিশ্বাসহীনতাকে। সেজন্যই Michael Martin তাঁর ‘Atheism: A Philosophical Justification’ বইয়ে বলেন, ‘According to its Greek roots, then, atheism is a negative view, characterized by the absence of belief in God.’ (Atheism: A Philosophical Justification”, p. 463.,Temple University Press, 1990)।

আসলে নাস্তিকদের বিশ্বসী দলভুক্ত করার ব্যাপারটি খুবই অবিবেচনাপ্রসুত। ব্যাপারটাকে আরেকটু পরিস্কার করা যাক। ধরা যাক, এক মুক্ত-মনা যুক্তিবাদী ব্যক্তি ভুতে বিশ্বাস করেন না। তবে কি সেজন্য তিনি 'না-ভুতে' বিশ্বাসী হয়ে গেলেন? শামীম সাহেবদের যুক্তি অনুযায়ী তাই হবার কথা। এভাবে দেখলে, প্রতিটি অপ-বিশ্বাস বিরোধিতাই তাহলে উলটোভাবে 'বিশ্বাস' বলে চালিয়ে দেওয়া যায়, তা সে ভুতই হোক, পঙ্খিরাজ ঘোড়াই হোক, অথবা ঘোড়ার ডিমই হোক। যিনি পঙ্খিরাজ ঘোড়া বা চাঁদের চড়কা-বুড়ীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তিনি আসলে তাঁর সংশয় এবং অবিশ্বাস থেকেই তা করেন না, তার 'না-বিশ্বাসে' বিশ্বাসী হবার কারণে নয়। যদি ওই ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন ওগুলোতে তিনি বিশাস করেন না, তিনি হয়ত জবাবে বলবেন, ওগুলোতে বিশ্বাস করার মত যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি বলে। কিংবা হয়ত বলতে পারেন, এখন পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওগুলো সত্ত্বার বাস্তব অস্তিত্ব কেউ প্রমাণ করতে পারেন নি, তাই ওসবে বিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে না। এটি পরিস্কার যে, এই বক্তব্য থেকে তার মনের সংশয় আর অবিশ্বাসের ছবিটিই আমাদের সামনে মুর্ত হয়ে ওঠে, বিশ্বাসপ্রবণতাটি নয়। ঈশ্বরে অবিশ্বাসের ব্যাপারটিও কিন্তু তেমনি। নাস্তিকেরা তাদের সংশয় আর অবিশ্বাস থেকেই 'নাস্তিক' হন, 'না-ঈশ্বরে' বিশ্বাস থেকে নয়। সে জন্যই মুক্ত-মনা Dan Barker তাঁর বিখ্যাত

'Losing Faith in Faith: From Preacher to Atheist' গ্রন্থে পরিস্কার করেই বলেছেন – 'Basic atheism is not a belief. It is the lack of belief.' (পৃঃ ৯৯)। আসলে সত্যি বলতে কি, 'বিশ্বাস' ব্যাপারটিই দাড়িয়ে আছে একটি 'অপ-বিশ্বাসমূলক' প্রক্রিয়ার উপর। আমি একবার একজনের সাথে বিতর্কের সময় ড. হুমায়ুন আজাদের সাক্ষাৎকার থেকে একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি উদ্ধৃত করেছিলাম। উক্তিটি এখানেও খুব প্রাসঙ্গিক। ড. হুমায়ুন আজাদ তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন,

'যে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই, যার কোন অস্তিত্ব নেই যা প্রমাণ করা যায় না, তাতেমানুষকে বিশ্বাস করতে হয়। মানুষ ভুতে বিশ্বাস করে, পরীতে বিশ্বাস করে বা ভগবানে, ঈশ্বরে বা আল্লায় বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস সত্য নয়, এগুলোর কোন বাস্তব রূপ নেই। মানুষ বলে না, আমি গ্লাসে বিশ্বস করি বা পানিতে বিশ্বাস করি, মেঘে বিশ্বাস করি। যেগুলো নেই সেগুলোই মানুষ বিশ্বাস করে। বিশ্বাস একটি অপবিশ্বাসমূলক ক্রিয়া। যা সত্য, তাতে বিশ্বাস করতে হয় না; যা মিথ্যে তাতে বিশ্বাস করতে হয়। তাই মানুষের সব বিশ্বাস ভুল বা ভ্রান্ত, তা অপবিশ্বাস।'

নাস্তিকেরা সঙ্গত কারণেই এই সমস্ত প্রথাগত অপবিশ্বাসের বাইরে। "ঈশ্বর নেই" বিবৃতিটি যদি শামীম সাহেবের কথামত 'ফাঁকিবাজি' হয়, তবে অশ্বত্থামা, ট্যাশ গরু,

বকচ্ছপ, থর জিউস, জলপরী, ফ্লাইং স্পেগেটি মন্সটার – এগুলো নেই বলাও একধরণের ‘ফাঁকিবাজি’। নয়?

যা হোক শেষ করি ধর্মকারী সাইটে বর্ণিত একজন নিধর্মীর কিছু অমৃত বচন উল্লেখ করে –

নাস্তিক্যবাদকে ধর্মের সঙ্গে যারা তুলনা করে থাকে, তাদের বলতে ইচ্ছে করে:

১. নাস্তিক্যবাদ ধর্ম হলে “অফ” বাটনকে টিভি চ্যানেল বলতে হয়।

২. নাস্তিক্যবাদ ধর্ম হলে টাককে বলতে হয় চুলের রং।

৩. নাস্তিক্যবাদ ধর্ম হলে স্ট্যাম্প না জমানোকে হবি বলতে হয়।

৪. নাস্তিক্যবাদ ধর্ম হলে বাগান না করাও একটি শখ, ক্রিকেট না খেলাও একটি ক্রীড়া, কোকেইন সেবন না করাও একটি নেশা।

এই চমৎকার উপমাগুলোর পাশাপাশি আমিও অনুরূপ কয়েকটি উল্লেখ করে তালিকার শ্রীবৃদ্ধি করি –

নাস্তিকতাও একটি বিশ্বাস হলে বোবা লোককে ‘ভাষাবিদ’ হিসেবে ডাকতে হয়।

নাস্তিকতাও একটি বিশ্বাস হলে দন্তহীন ব্যক্তিকে ‘দাঁতাল’ আখ্যা দিতে হয়।

নাস্তিকতাও একটি বিশ্বাস হলে উপোস থাকাকেও এক ধরনের ‘খাদ্যগ্রহণ’ বলতে হয়।

নাস্তিকতা একটি বিশ্বাস কিংবা ধর্ম হলে চাকরী না করাটাও একটি পেশা।

নাস্তিকতা একটি ধর্ম হলে বই না পড়াকেও বলতে হয় ‘পাঠাভ্যাস’।

নাস্তিকতা বিশ্বাস হলে পোষাক খুলে ফেলাটাও এক ধরনের পোষাক পরিধান।

নাস্তিকতা ধর্ম হলে চশমা না পরাটাও এক ধরনের সানগ্লাসের ফ্যাশান।

নাস্তিকতা একটি বিশ্বাস হলে চিরকৌমার্যও বিবেচিত হওয়া উচিৎ এক ধরনের ‘বিবাহ’ হিসেবে।

নাস্তিকতা একটি বিশ্বাস হলে নির্লোভী থাকার চেষ্টাকেও এক ধরনের ‘লোভ’ বলতে হয়।

নাস্তিকতা একটি ধর্ম হলে নিরোগ স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়াটাও এক ধরনের রোগ!

পাঠকেরা কি বলেন?

অনুগল্প:

# উঁচু জাত-নিচু জাত

- জামাল আনসারী

"কতবার তোকে বলেছি না, নিচু জাতের ছেলের সাথে খেলবি না। নিচু জাতের ছেলেকে ঘরে ঢুকাবি না। কোন কথায় তোর কানে ঢোকে না। এরপর যদি কোনদিন তোকে ওর সাথে খেলতে দেখেছি তো তোকে মেরে ফেলবো।"—ছেলেকে মারতে মারতে এক নিশ্বাসে এত কথা বলে ফেলল শ্রীদেবী।

ছেলেটি কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে,আমি ভুল করেছি মা। আর কোনদিন নিচু জাতের ছেলের সাথে খেলবো না। এবারের মতো আমাকে ক্ষমা করে দাও।

ঠিক আছে। ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু কথাটা যেন তোর মনে থাকে।—শ্রীদেবী ধমকের সুরে জানিয়ে দেয়।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ছেলেটি স্কুলে চলে যায়। নিচু জাতের ছেলেটিও সেই স্কুলে পড়ে। তারই অন্তরঙ্গ সহপাঠী। প্রতিদিন তারা একই বেঞ্চে পাশাপাশি বসে।স্কুলে পরস্পর পরস্পরের সাথে দেখা হয় কিন্তু উঁচু জাতের ছেলেটি তাঁর মায়ের কাছে তুচ্ছ অজুহাতে মার খাওয়ার ভয়ে আর কথা বলে না।কিছু কিছু বাবা মা শিশুদের সহজ

সরল নিষ্কলঙ্ক মনে বিদ্বেষ, ঘৃণার বিষ মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুচারুভাবে বপন করে দেয়।

কিছুক্ষণ পরে ক্লাসে ইতিহাসে শিক্ষক পড়ায়, "জাতিভেদ প্রথা সমাজের কলঙ্ক ।কোন জাতিই নিচু নয়,আবার জাতিই উঁচু নয়।— সব সমান। আমরা সবাই মানুষ। কোন জাতিকে ছোটজাত বলে অপমান করা সামাজিক অপরাধ। আমরা কেউই আজ থেকে আর জাতিভেদ মানবো না। সবাইকে মানুষ বলে মানবো।"

ঢং ঢং করে ঘন্টার আওয়াজ জানিয়ে দেয় ইতিহাস ক্লাসের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।...

> "আমরা চাই সেই স্বাধীন ভারত যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের থাকবে সমান অধিকার, যেখানে সামাজিক নিপীড়ন থাকবে না, অস্পৃশ্যতা যেখানে পাপ বলে বিবেচিত হবে এবং জন্মগত কারণে মানুষ মানুষকে ঘৃণা করবে না।"
>
> - বাবাসাহেব ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর

ছোটগল্প:

# বেমানান

- সুমন কর্মকার

প্রতি শনিবার সন্ধ্যেয় সৌরকে দেখতে পাওয়া যায় স্টেইন্ড গ্লাস পাবের বাঁদিকের একদম কোনার টেবিলে। ও কখনোই ডান্সফ্লোরে আসে না। কার্লসবার্গের দুটো ক্যান আর চারটে ক্লাসিক ওর কোটা। কখনোই এর কম-বেশি হয়না। নিজের চেয়ারে বসে নৃত্যরত মানুষগুলোকে দেখা, ওদের দিক থেকে ভেসে আসা টুকরো টুকরো কথা, হাসির শব্দ শুনতে ওর বেশ লাগে। আস্তে আস্তে মাথার মধ্যে একটা ঝিমুনি অনুভূত হয়। তারপর কোটা পূরণ হয়ে গেলেই বিল মিটিয়ে বেরিয়ে পড়ে নিজের একলা ফ্ল্যাটের উদ্দেশ্যে। এভাবেই এক শনিবারের সন্ধ্যেয় সৌর দেখতে পেল একদল প্রাণোচ্ছল যুবক-যুবতীকে। দলে আছে তিনটে ছেলে আর দুটো মেয়ে। দেখেই বোঝা আছে দুটো কাপল গ্রুপ আর তাদেরই এক বন্ধু। হাই সাউন্ডের মাঝে একে অন্যের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চিৎকার করে কিছু কথা বলছে আর মাঝেমাঝে হেসে উঠছে। ওরা পাঁচটে চেয়ারের একটা টেবিলে বসে বিয়ার অর্ডার করল। এই অবধি দেখে সৌর টেবিল ছেড়ে উঠে ওয়াশরুম গেল। ফিরে এসে দেখল এর মধ্যেই গ্রুপটা ডান্সফ্লোরে চলে গিয়েছে

এবং গোল হয়ে ঘিরে চলছে নাচ। রোজকার চিত্র। নতুন কিছু নয়। সৌর নিজের কোটা পূরণে মনোনিবেশ করল। কোটা যখন প্রায় শেষের মুখে হঠাৎ একটা গোলমালের আওয়াজ সৌরর দৃষ্টি আকর্ষন করল। একটা জটলা তৈরি হয়েছে। ডিজে গান থামিয়ে দিয়েছে। বাউন্সাররা নিজেদের কর্তব্যপালনে নেমে পড়েছে। সৌর উঠে পড়ল। জায়গাটায় যেয়ে যা বুঝল, ওই পাঁচজনের গ্রুপের একটি মেয়েকে নাচতে নাচতে অন্য একটি যুবক নিজের দিকে টেনে নিয়েছিল, সাথে সাথেই মেয়েটি যুবকটিকে একটি সপাটে চড় মেরেছে। তাতেই তৈরি হয়েছে এই বিপত্তি। যুবকটি এই গ্রুপের কারোরই পরিচিত নয়।

**লম্বায় প্রায় ছফুট, ফর্সা গালটাতে আঙুলের দাগগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, চুলগুলো অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে, এলকোহলের প্রভাবে চোখদুটো খানিক রক্তাভ।**

পাশে আস্তিন গুটিয়ে রাগী-রাগী মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটি খুব সম্ভবত যুবতীটির বয়ফ্রেন্ড। গ্রুপের বাকিদের মুখ দেখেও বোঝা যাচ্ছে তারাও অসভ্য ছেলেটাকে একহাত বুঝে নিতে চায় কিন্তু বাউন্সারদের জন্য সেই সুযোগ পাচ্ছে না। একটু পরেই একজন বাউন্সার ছেলেটাকে বাইরে বেরিয়ে যেতে বলার সাথে সাথেই ছেলেটা মাথা নীচু করে

বেরিয়ে গেল। ওর থমথমে মুখটা দেখে সৌরর বেশ ভালোই লাগলো। ঠিক হয়েছে। নেশাগ্রস্ত মেয়ের সুযোগ নিতে যাওয়ার যোগ্য জবাব পেয়েছে। ভাবলো মেয়েটাকে একটু সাবাসি দিয়ে আসবে। কিন্তু পেছন ফিরে দেখলো ওদের দলটাও ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ছে। এইধরণের উটকো ঝামেলার পর নাচের আগ্রহ হারানোটা স্বাভাবিক। সৌরও নিজের টেবিলে ফিরে এলো। অর্ধেকটা বিয়ার এখনো পড়ে আছে। গরম হয়ে গিয়েছে। সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে সৌর বিল কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল।

এরপরের শনিবার পাবে ঢুকতে সৌরর খানিক দেরিই হয়ে গেল। অফিস থেকে বেরিয়েই বৃষ্টি। ছাতা নিয়ে বেরোয়নি। ক্যাব অবধি আসতে আসতেই অল্প ভিজে গেল। এই সামান্য বৃষ্টিতেই শহরের জায়গায় জায়গায় জল জমে গেছে। স্টেইন্ড গ্লাস ওর অফিস থেকে ক্যাবে পঞ্চাশ মিনিটের রাস্তা। আজ জ্যামের জন্য সেই রাস্তাই পেরোতে সময় লাগলো এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। পাবে ঢুকেই ও ওর কোনার টেবিলে চলে এলো। রেগুলার কাস্টমার। তাই আলাদা করে অর্ডার দেওয়ার প্রয়োজন পড়েনা। ওয়েটার ক্যানগুলো আনতে আনতে সৌর একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো। ডিজে হাল্কা সাউন্ডে একটা রোমান্টিক গান বাজাচ্ছে। কাপলরা বেশ ঘনিষ্ঠভাবে একে অপরকে জড়িয়ে নাচ করছে। সিঙ্গেলরা কেও কেও নিজেদের টেবিলে বসে লালায়িত দৃষ্টিতে দৃশ্যটা উপভোগ করছে, আবার কেও

কেও বিরক্তি প্রকাশ করছে ডিজের ওপর। হঠাৎ একটা কাপলের ওপর সৌরর চোখ আটকে গেল। আরে! এ তো সেই সাহসী মেয়েটাই। আগের দিন অসভ্যতা করার জন্য যে চড় মেরেছিল। আশেপাশে ওদের গ্রুপের আর কেও চোখে পড়ল না যদিও। সাথে নিশ্চয়ই বয়ফ্রেন্ড। ছেলেটার খালি পেছন দিকটাই দেখা যাচ্ছে। বেশ লম্বা। ব্ল্যাক গ্লসি শার্টের সাথে ডেনিম জিন্স। এই তো ওরা ঘুরছে। ধীরে ধীরে ছেলেটার মুখটা সৌরর দৃষ্টিগোচর হলো। আর সাথে সাথেই ও চমকে উঠলো। এটা তো সেই চড় খাওয়া ছেলেটাই। ছেলেটার একটা গালে মেয়েটার হাত। ধীরে ধীরে নিজের দিকে টেনে নিচ্ছে। বেশ আবেগঘন মুহূর্ত। বোধহয় ওরা কিস করতে চলেছে। একসপ্তাহ আগেও ছেলেটার গালে মেয়েটার হাত পড়েছিল। তবে আজকের সাথে তার তুলনা চলেনা। সৌর মুখ ঘুরিয়ে নিল। বিয়ারটা কি আজ একটু বেশিই তেতো লাগছে? মুখটা বিস্বাদ ঠেকছে কেন?  কয়েকদিন আগে কি একটা প্রসঙ্গে অফিসের বৃদ্ধ সিকিউরিটি গার্ড গৌরদা বলছিলেন, "বুঝলে সৌর, যুগ পাল্টাচ্ছে। সময়টা ভীষণ তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। পুরনো সবকিছু বেমানান হয়ে পড়ছে। একটা গোটা জেনারেশন নিজেদের শেষ করার জন্য কেমন উঠে পড়ে লেগেছে দেখছ তো?" সৌরর মনে পড়ে গেলো। ও উঠে পড়ল। আজ আর বিয়ার খাওয়া হবে না। পাব থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে সৌরর চোখে পড়ল বিল কাউন্টারের এক পাশে অদ্ভুত

দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ছেলেটাকে। একেই আগের দিন মেয়েটার বয়ফ্রেন্ড বলে মনে হয়েছিল। সৌর আর দাঁড়ালো না। পাবের দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসতে আসতে শুনতে পেলো ডিজে নতুন গান চালিয়েছে, 'ফলক তক চল সাথ মেরে, ফলক তক চল সাথ চল....'। নিজেকে হঠাৎই বড্ড বেমানান মনে হল সৌরর।



ইলাস্ট্রেটরঃ Oguz yigit

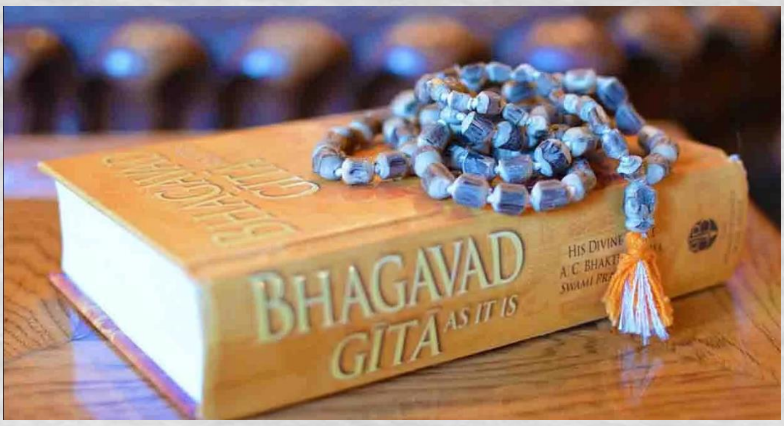
#MashaAmini

#IranProtests

# যুক্তিবাদীর চোখে গীতা শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ সমীক্ষা

-সৌরাষ্ট্র দাশ

আমি দেখছি। অনেকেই গীতাকে একটি দর্শনের বই ধর্ম গ্রন্থ কেউবা সাম্প্রদায়িক বলে থাকে। কিন্ত ভাগবত পুরাণ ছাড়া গীতার মাহাত্ম্য বোঝা যায়। আমরা অনেকেই শ্রীমদ্ভাগবদগীতা পড়েছি! কিন্ত বিশেষ করে যখন যুক্তিবাদীরা গীতা পড়ে 9/32 নিয়ে, যখন সমালোচনা করে তখন শুধুমাত্র একটি শ্লোক ধরেই করে। কিন্ত কিছু




মানুষ এখানেও গীতার শ্লোক নিয়ে অপপ্রচার করে। সেখানেই অন্যতম হলো গীতার 9/32 শ্লোক যেখানে নারীকে বেশ্যা পাপযোনি তার থেকে শূদ্র সন্তান বলা হয়। তখন সেটা আরো চরম ভাবে সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠে এখানেই কিছু মানুষের মিথ্যাচার চলে। তারা বলে গীতা বোঝা কি অত সহজ তাহলে গীতার 9/32 কি বোঝাতে চাইছে আমরা জানার চেষ্টা করবো এখন..

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ |

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ || ৩২

এখানে মূলত যে সংস্কৃত শ্লোক গুলি গুরুত্বপূর্ণ

পাপযোনয়ঃ = বলতে নীচকুল জাত [তাহলে জাতিভেদ ও চলে আসছে, তার সাথে নীচ কুলজাত এই নীচ কুল বলতে কি এর জন্য [1](গীতা 1/41) পড়তে হবে সেখানে বলা আছে যে বর্ণসংঙ্কর উৎপাদন বৃদ্ধি হলে কুল ও কুলঘাতকেরা নরকগামী হয়। ] এবার [ বর্ণসংঙ্কর কি? তার জবাব হলো [1](গীতা 1/40) সেটা হলো ! ব্রাহ্মণ কন্যা যদি ব্রাহ্মণকুল ছেড়ে অন্য বৈশ্য শূদ্র কুলে বিবাহ কে বর্ণসংঙ্কর বলে। তার সাথে সেই কুলস্ত্রীগণকে অসৎ চরিত্র ব্যভিচারী বলেছে আর যদি সেই ব্রাহ্মণ কন্যা শূদ্র পুরুষ কে বিবাহ করে তার দ্বারা যদি কোনো সন্তান কে জন্ম দেয়! সেখানেই গীতা বলছে অবাঞ্ছিত প্রজাতি, ভাবা যায়! আমরা গীতা থেকে এক নতুন বিবর্তনবাদ এর অনুসন্ধান পেলাম আর সেইসব প্রজাতির নাম জানলে অবাক হবেন? আইন শাস্ত্র যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, সেই প্রজাতির নাম বলেছে।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ১ ম অধ্যায়ের ( ৯১-৯৫ )[2] নং শ্লোকে দেয়া আছে

১ ) ব্রাহ্মণ পুত্র + ব্রাহ্মণ কন্যা ---- উৎপন্ন সন্তান ব্রাহ্মণ

২ ) ব্রাহ্মণ পুত্র + ক্ষত্রিয় কন্যা --- উৎপন্ন সন্তান মুর্দ্ধাবিষিক্ত

৩ ) ব্রাহ্মণ পুত্র + বৈশ্য কন্যা --- উৎপন্ন সন্তান অম্বষ্ঠ

৪ ) ব্রাহ্মণ পুত্র + শূদ্র কন্যা --- উৎপন্ন সন্তান নিষাদ / পারশব

১ ) ক্ষত্রিয় পুত্র + ব্রাহ্মণ কন্যা --- উৎপন্ন সন্তান সূত

২ ) ক্ষত্রিয় পুত্র + ক্ষত্রিয় কন্যা --- উৎপন্ন সন্তান ক্ষত্রিয়

৩ ) ক্ষত্রিয় পুত্র + বৈশ্য কন্যা ---- উৎপন্ন সন্তান মাহিষ্য

৪ ) ক্ষত্রিয় পুত্র + শূদ্র কন্যা ---- উৎপন্ন সন্তান উগ্র

১ ) বৈশ্য পুত্র + ব্রাহ্মণ্ কন্যা --- উৎপন্ন সন্তান বৈদেহক

২ ) বৈশ্য পুত্র + ক্ষত্রিয় কন্যা --- উৎপন্ন সন্তান মাগধ

৩ ) বৈশ্য পুত্র + বৈশ্য কন্যা -- উৎপন্ন সন্তান বৈশ্য

৪ ) বৈশ্য পুত্র + শূদ্র কন্যা --- উৎপন্ন সন্তান করণ

১ ) শূদ্র পুত্র + ব্রাহ্মণ কন্যা --- উৎপন্ন সন্তান চন্ডাল

২ ) শূদ্র পুত্র + শূদ্র কন্যা --- উৎপন্ন সন্তান শূদ্র

তাহলে আমরা পৃথিবীর সব থেকে আজব প্রজাতির নাম জানতে পারলাম। যে বর্ণসংঙ্কর ফলে উৎপাদন করা অবাঞ্ছিত প্রজাতি গুলি কি! এবং যত বেশি নিজ কুল ছেড়ে নীচু কুলে বিবাহ করবে ততবেশি পাপী হবে। এবং নরকে যাবে।[1]

এবং এই প্রশ্ন [1](গীতা 1/42) শেষ করে দেয়। সেখানে বলা [ যারা বংশের ঐতিহ্য নষ্ট করে এবং তার ফলে অবাঞ্ছিত সন্তানাদি সৃষ্টি করে, তাদের কুলর্মজনিত দোষে

ফলে সর্বপ্রকার জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প এবং বংশের কল্যাণ-ধর্ম উৎসন্নে যায় ] বুঝতে পারছেন কি বলতে চাইছে গীতা আরো পরিষ্কার এই 42 শ্লোক সংস্কৃত (জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বত) অনেক বলে না? {সনাতন) ধর্ম বলতে পুরাতন যা ছিল তাই থেকে যাবে! সেটা হলো জাতিভেদ সেখানে বলা হচ্ছে। জন্ম থেকে জাতি জন্ম থেকে বর্ণ জন্ম থেকে কর্ম আর এইসব যারা মানে না। তারা বিভিন্ন পাপযোনয়ঃ = জন্ম নিয়ে নীচকুল জাত হয়।

বৈশ্যাস্তথা = বলতে অনেকেই ( বৈশ্য ) এর কথা বলে। কিন্ত আসলেই কি তাই? আসলে না। [1](গীতা 9/32) সেখানে [ বৈশ্যা ] বলতে আসলে হলো { বেশ্যা } এর উত্তর আপনি [1](গীতা 18/41) [1](গীতা 18/44) দুটির সংস্কৃত শ্লোক চেক করতে পারেন। যে সেখানে বৈশ্য শব্দ কেমন এসেছে। চাইলে আপনি শঙ্কর ভাষ্য চেক করতে পারেন। সেখানে বৈশ্য নয়। বেশ্যা আছে তাহলে পরিষ্কার হয়ে গেলাম বৈশ্য শব্দ নয় বেশ্যা আছে সেখানে।

শূদ্রাস্তেহপি = বলতে শূদ্র। সেখানে আর আলাদা আলাদা অনুবাদ আর দেখতে হবে না। সবাই এখানে আর গোজামিল করেনি। তাহলে পুরো শ্লোক এর অনুবাদ হবে এমন

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ |

স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ || ৩২

হে পার্থ! যারা আমাকে বিশেষভাবে আশ্রয় করে, তারা স্ত্রী,বৈশ্যা,শূদ্র আদি নীচকুল জাত হলেও অবিলম্বে পরাগতি লাভ করবে।[1]

তার মানে এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলতে চাইছে! যে যদি কৃষ্ণকে না মানে তাহলে ( বেশ্যা শূদ্র আদি নীচ জাত ) থাকবে। আশ্রয় করলে মুক্তি পাবে। কিন্ত শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ কি বলছে। [1](গীতা 9/32) কে ধরে।

[3]আভীরস্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ |

যেহন্যে চ পাপ যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ

শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ || ২।৪।১৮

কিরাত, হূণ, আন্ধ্র, পুলিন্দ, পুল্কস, আভীর, কঙ্ক, যবন ও খস প্রভৃতি নীচজাতিগণ ও অন্যান্য মহাপাপাসক্ত ব্যক্তিগণ যাঁর (ভগবানের) আশ্রিত ভক্তগণের শরণ গ্রহণ করলেই পবিত্র হয়ে যায় সেই সর্বশক্তিমান ভগবানকে বাব বাব প্রমাণ।

**তাহলে এখানে যে সব নীচ জাতি সম্পর্কে জানতে পারলাম। সেখানে বলছে যে ভগবানের আশ্রিত ভক্তগণের শরণ গ্রহণ করলেই পবিত্র হয়ে যায়।**

না করলেই সে ডাইরেক্ট নীচ মহাপাপী। এবং এখানেই শেষ নয়। সেই ভগবান আবার সর্বশক্তিমান তাহলে কেন এই জাত ব্যবস্থা জন্ম থেকে? এবং কোনো শূদ্র জ্ঞানী হলেও সে তার শূদ্র ধর্ম ত্যাগ করতে মানা করেছে। [1](গীতা 3/35) [1](গীতা 18/47'48) এখন যদি শূদ্র অর্থনৈতিক ভাবে শক্তিশালী হয়ে বিদ্যাণ হয়ে! ধর্মীয় শাস্ত্রের ভুল এর সমালোচনা করে আর সেই ইশ্বর কি বলেছে তা আপনার চিন্তার বাইরে। [1](গীতা 4/40) কি বলেছে।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি |

নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ || ৪০

অজ্ঞ ও শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি কখনই ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারে না। সন্দিগ্ধ চিত্ত ব্যক্তি ইহলোকে সুখভোগ করতে পারে না এবং পরোলোকেও সুখভোগ করতে পারে না।

তার মানে কেউ শাস্ত্রের ভুল নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে পারবে না ! যদি করে তাহলে ইহলোকে এবং পরোলোকে ভয়ঙ্কর দুঃখে থাকবে কোনো সুখে থাকবে না। এর মধ্যে যদি সেই ব্যক্তি ইহলোকে ইশ্বরের নিন্দা করে তাহলে তো খবর আছে।

[3]কর্ণৌ পিধায় নিরয়াদ্যদকল্প ঈশে

ধর্মাবিতর্যসৃণিভিরস্যমানে |

ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুশতীমসতীং প্রভুশ্চে-

জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্মঃ || ৪।৪।১৭

যদি যথেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিরা ধর্মরক্ষাকারী পূজনীয় প্রভুর নিন্দাবাদ করে তবে নিজের ক্ষমতায় তাদের দণ্ড দেওয়া সম্ভব না হলে কান বন্ধ করে সেখান থেকে চলে যাবে, আর যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে বলপ্রয়োগে সেই অমঙ্গল - শব্দ - উচ্চারণকারীর জিহ্বাকে ছেদন করে ফেলবে। এই ধরনের পাপের প্রতিকারকল্পে নিজের প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করবে — এই - ই ধর্ম

হালে পরিষ্কার হলো গীতার ও ভাগবত পুরাণ এর অনুসন্ধান গীতার একটি শ্লোক [1](9/32) এর মানে কত বড়ো  এখন কি বলছেন।  সেই সর্বশক্তিমান ইশ্বরের নিন্দা করলে ভক্তগণ আপনাকে জিহ্বাকে কেটে হত্যা করবে। তাহলে কেন স্ত্রী বেশ্যা শূদ্র ইশ্বরের দাসত্ব বহন করবে। এখানেই নিজেকে প্রশ্ন করুন। যে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। আসা করি জানার কোনো শেষ থাকলো না। শুধু নিজেই রেফারেন্স চেক করে নেবেন বই থেকে....

রেফারেন্স :

1) শ্রীমদ্ভাগবদীতা যথাযথ- শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী / ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

2) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার- সুমিতা বসু ন্যায়তীর্থ / কলকাতা সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার ২০০৭

3) শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ- গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর

# অ্যালোপ্যাথি বনাম গেলোপ্যাথি (পার্ট-২)

-প্রবীর ব্যানার্জী

আলোচনা যত এগোচ্ছে তত একটা ব্যাপার উঠে আসছে যে আপনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সেবার বিরুদ্ধে যতই লিখুন আমি কিন্তু এই চিকিৎসা করিয়ে ফল পেয়েছি। কেউ বলছে আঁচিল সেরে গেছে, কেউ বলছে অর্শ নিরাময় হয়েছে এসব। আজকে তাহলে রোগ সারা না সারা এবং তাতে ঔষধ এর অবদান কখন আসছে সেটা নিয়ে আলোচনা করি।

আসলে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অনেক অগ্রগতি সত্ত্বেও সব রোগ নিরাময় করা যায় না, নিরাময় যোগ্য সব রোগও সবসময় সারে না। কিছু কড়া ঔষধের প্রতিক্রিয়ায় মানুষ ভীত আর বিরক্ত - প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারদের অনেকেরই দরদের অভাব, দায়িত্বহীনতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার পরিচয়ে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ও চিকিৎসকদের সীমাবদ্ধতার ফলেই মানুষের হোমিও প্রীতি ঘুচছে না। আর আছে ফল পাওয়ার প্রশ্ন। অনেক অসুখই এমনকি মারাত্মক হলেও প্রকৃতির নিয়মেই আপনি সেরে যায় বা কমে আসে। আবার কখনো কখনো রোগ সারার মূলে থাকে রোগীর মনের বিশ্বাস।

হোমিওপ্যাথি তখন পাশাপাশি চিকিৎসা হিসাবে চললে ঐ ঝড়ে বক মরার নিয়মে পসার বাড়ে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ এর ফল ঘটতে পারে অভিভাব- স্বাভিভাবের জন্য(Suggestion and auto suggestion). হোমিওপ্যাথিতে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও ওষুধ কে চিকিৎসা কেন্দ্রে যাচাই করার বহু প্রচেষ্টা থেকে কোনো ইতিবাচক ফল পাওয়া যায় নি। (Great Soviet Encyclopedia, 3rd edition,1970)

ভারতবর্ষে একদিকে বাড়ছে দারিদ্র্য, অপুষ্টি আর অনাহার। অপরদিকে আধুনিক চিকিৎসকদের মানসিকতা সেবার নয়; না হলে সুশিক্ষিত চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা হাজারে হাজারে ধনবান ইংল্যান্ড আমেরিকাবাসীর চিকিৎসা করাতে সাগর পার করতেন না। দুঃস্থ, রুগ্ন মানুষ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসতেই পারে না বা খরচে কুলিয়ে উঠতে পারে না। ভারতে তাই হোমিওপ্যাথের সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

ভারতবাসীকে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা যোগানোর দায় থেকে ভারতের শাসকরাও যেন কিছুটা হালকা হতে চেয়েছিলেন। তাই কি ১৯৭৩ সালে পাশ হয়েছে হোমিওপ্যাথিক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল আইন আর ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হোমিওপ্যাথিক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল? ভারতে যার বয়স সওয়া-শ বছর সেই হোমিওপ্যাথিকে দেশীয় চিকিৎসার

মর্যাদা দেওয়া হলো। বলা বাহুল্য হোমিও ঔষধ এর বিশুদ্ধতা বা গুনমানের যাচাই করার কোনো ব্যবস্থা নেই।

**ভারতবর্ষ মন্ত্র, তন্ত্র, তাবিজ কবচ, জ্যোতিষ, হাত দেখার দেশ। মানুষের শরীর ও জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এখানে অস্বাভাবিক নয়।**

কিন্তু আই.এম.এ. র মতো সংস্থাগুলো জনচিকিৎসার ডিপ্লোমা কোর্স চালু করার বিরুদ্ধে সরব হলেও চলতি ভূয়া চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর ব্যাপারে নীরব কেন?

বিজ্ঞানে সত্যানুসন্ধানে আলোচনা ও সমালোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণ বিশেষ করে বিজ্ঞানকর্মীরা- হোমিওপ্যাথি কতটা বিজ্ঞানসম্মত তার নিজেরাই বিচার করতে পারেন। অ্যালোপ্যাথি হাসপাতালের জনপ্রিয়তা, উক্ত চিকিৎসা তে ভালো ছাত্র ছাত্রীদের আকর্ষণ ও লোকের দায়ে পড়ে অবশেষে অ্যালোপ্যাথের শরণাপন্ন হওয়া তার প্রমাণ বলে মনে হয়। নানা রকম ম্যাজিকিওর গল্প ছাড়া এবিষয়ে বিজ্ঞান সম্মত সুসংবদ্ধ তথ্য কোথায়? বহুক্ষেত্রে হোমিও চিকিৎসার নামে রোগী বিনা চিকিৎসায় থাকে এবং বহু অসুস্থ শিশু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যথাযথ চিকিৎসা সময় মতো

পায় না। ফলে বহু শিশু মারাত্মক ভাবে আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে। হোমিও চিকিৎসা তে কত লোকের কত ক্ষতি হয়েছে তার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে পারলেও তা কম ভয়াবহ হবে না।

এবার আসি মূল কথায়।যারা বলছেন কি একটা ফুজা না ভুজা খেয়ে আঁচিল সেরে গেছে তাদের কথায়। আলোচনার শুরুতে ঠিক করে নিতে হবে হোমিওপ্যাথি কে কিভাবে দেখবেন:

১। যেভাবে এর ব্যবহার বা প্রয়োগ হচ্ছে সেভাবে না

২। এর তাত্ত্বিক ভিত্তি ও দর্শন নিয়ে?

কোনো কোনো চিকিৎসা পদ্ধতি কে হোমিও বলে চেনা যাবে কি ভাবে?

যেভাবে এর প্রয়োগ হচ্ছে তা দেখলে কোনো কূলকিনারা পাওয়া যাবে না। কেউ কেউ গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে রোগী আকৃষ্ট করেন, কেউ আবার নানা উপসর্গে হোমিও ওষুধ এর নামে অ্যাসপিরিন, এন্টেরোকুইনল, অ্যান্টিবয়োটিক স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ দেন। হোমিও ঔষধ এ কি আছে যাচাই করা দুষ্কর, কারণ হ্যানিম্যানের উপদেশ মতো বেশিরভাগ হোমিও চিকিৎসক নিজেদের ঔষধ নিজেরা তৈরি করেন না, এমনকি কোন উদ্ভিদ, কোন্ প্রাণী, কোন্ ধাতব যৌগ ঔষধ এর উৎস, তাদের এক খটমট ল্যাটিন নাম ছাড়া বস্তুর সাথে পরিচিত নন। তাই হোমিওপ্যাথি

অনুজ্ঞসূচক সদৃশ বিধান যেখানে প্রয়োগ হচ্ছে তাকেই হোমিওপ্যাথি বলতে হবে। হোমিওপ্যাথির বাইবেল অর্গানন অফ মেডিসিন এর ভিত্তিতেই আলোচনা করতে হবে। এই হিসেবে কিন্তু ঐ থুজা হোমিও ঔষধ ক্যাটাগরিতে পড়ল না।

**Double blind trial test কি?**

এতে নির্দিষ্ট রোগে আক্রান্ত বেশ কিছু রোগী কে সমান দুটি দলে ভাগ করা হয়।একদল কে প্রস্তাবিত ঔষধ দেওয়া হয়, অন্যদল পায় একই রকম স্বাদ গন্ধ যুক্ত ঔষধ গুন হীন পদার্থ বা নকল ওষুধ(placebo)। কে কোন টি পেল তার রোগী ও পরীক্ষকের কাছে অজ্ঞাত থাকে, এই কারণে একে ডাবল ব্লাইন্ড টেষ্ট বা জোড়া অন্ধের পরীক্ষা বলা হয়। কেবলমাত্র কিছু নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক, যারা পরীক্ষা শেষে তথ্যবিশ্লেষনের কাজে যুক্ত হবেন, তাঁরা এটি জানবেন। নির্দিষ্ট সময় পর পর রোগীদের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও নথিভুক্ত করা হয়। পরীক্ষা শেষে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দ্বিতীয় দলটির তুলনায় প্রথম দলটির রোগীদের শারীরিক অবস্থার তুল্যমূল্য বিচার করা হয়। যা থেকে রাসায়নিক ঔষধটির কার্যকারিতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় দলটি কন্ট্রোল গ্রুপ। ঔষধ বিজ্ঞানে একটি কথা আছে - disease can be cured with medicine, with out medicine,inspite of

medicine.তাই চিকিৎসা ও রোগ সারার ভেতরকার সম্পর্ক সত্যিই জটিল। রোগ আক্রমণ প্রতিহত করা ও অসুস্থতা থেকে মুক্তি পাওয়ার পেছনে যেমন immunity বা অনাক্রম্যতা কাজ করে তেমনি অনেক রোগ আবার স্ব-নিয়ন্ত্রিত (self limiting diseases) নির্দিষ্ট সময় পর এমনিতেই সেরে যায়। অধিকাংশ ভাইরাস ঘটিত রোগের ক্ষেত্রে যা সত্য।

তাই আধুনিক চিকিৎসায় ঔষধ হিসেবে প্রস্তাবিত প্রতিটি রাসায়নিকে প্ল্যাসিবো নিয়ন্ত্রিত জোড়া অন্ধের (placebo controlled double blind trial) পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হতে হয়।

বিকল্প চিকিৎসা যেমন এই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় সেসব দায় নেই, কোনো রকম পরীক্ষা ছাড়াই দিব্যি চলছে। এখানে যে কথাটি স্পষ্ট করে বল দরকার সেটা হলো কতজন ব্যবহার করেছে না বা বিশ্বের কটি দেশে ছড়িয়ে পড়েছে সেটা দিয়ে কোনো ঔষধ বা চিকিৎসার কার্যকারিতা যাচাই করা যায় না। এটি কেবল করা যায় কতকগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। জোড়া অন্ধের পরীক্ষা তেমন একটা পদ্ধতি।

বিশ শতকের শেষ দিকে হোমিওপ্যাথি যাচাই করে দেখার মতো বেশ কিছু ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা জমা হয়ে ছিল। যেগুলো তে হোমিও কার্যকারিতা আছে বলে মনে হয়েছে তার

বেশিরভাগই পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম কানুন মানা দরকার তাই মানা হয়নি এবং প্রবন্ধ প্রকাশনার ক্ষেত্রেও নিরপেক্ষতা ছিল না।খালি সাফল্য গুলো নথিভুক্ত করা হয়, একে বলে publication bias.

**এরপর বহুবার পরীক্ষা করা হয় বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন ভাবে। তাতে যেটা উঠে এসেছে তাহলো, গবেষকরা হোমিওপ্যাথি তে রোগসারানোর পেছনে প্ল্যাসিবো ছাড়া অন্য কিছুর ভূমিকা দেখতে পাননি।**

আজ যার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না,কাল তার ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে, অথবা ব্যাখ্যা না পেলেই কোনো কিছু বর্জনীয় হয়ে যায় না এই সঠিক বক্তব্য থেকে,আজ যার ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না সেরকম সব কিছু কে স্বীকৃতি দেওয়াটাও আবার বিপরীত ধরনের ভ্রান্ত মানসিকতা।

পর্ব- ৬

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে অনেক আলোচনা হলো।এবার আসি আরেকটি চিকিৎসা পদ্ধতিতে যেটা হোমিওপ্যাথির মতো য়ুরোপে শুরু হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তার নাম নেচারোপ্যাথি।

তবে হোমিওপ্যাথির মতো এর একক জন্মদাতা নেই। এবিদ্যা নিজের খেয়ালে বেড়েছে। এই বিদ্যার মূল মন্ত্রটি হলো প্রকৃতি অসুখ সারিয়ে দেয়।

এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে ভেষজ ও শল্য ব্যবহৃত হয় না।কেবল শতাধিক বিচিত্র অভিনব নিরাময় পদ্ধতি বলা হয়েছে। এই বিচিত্র বিস্তারের জন্য নির্দিষ্ট কোনো তত্ত্বগত কাঠামো খুঁজে পাওয়া যায় না প্রাকৃতিক চিকিৎসা বিদ্যা বা নেচারোপ্যাথিতে।

প্রথম যুগের প্রকৃতি চিকিৎসকরা ছিলেন অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় ডাক্তাররা। ভিনসেন্ট প্রিনসিজ্ আর ফাদার সেবাস্টিয়ান নেইপ ছিলেন জল চিকিৎসার প্রবর্তক(Hydrotherapy)। অ্যাডলফ্ জাস্ট এর 'রিটার্ন টু নেচার' বইতে বলা আছে - খালি জমির উপর শুয়ে,খালি পায়ে ভেজা ঘাস বা বালির উপর হেঁটে এবং কাদার প্রলেপ গায়ে মেখে কিভাবে বিভিন্ন অসুখ সারানো যায়। এই ধরনের আরেকটি বইতে লুই খুনের লেখা, সব ধরনের ওষুধের বিরোধিতা করা হয়েছে। তার পরিবর্তে অনুমোদন করা হয়েছে বাষ্প - স্নান, অবাধ সূর্যালোক, নিরামিষ খাবার এবং শুধুমাত্র গমের রুটি। চিকিৎসক অ্যানটোইন বেশ্যাম্প এর দৃঢ় অভিমত ছিল, রোগ হলেই কেবল রোগ জীবাণু জন্মায়,অন্য কোন ভাবে জীবানু আসতে পারে না। শেষে বলতে হয় বেনেডিক্ট লাস্ট এর কথা,ফাদার নেইপের

শিষ্য,যাকে আমেরিকান নেচারোপ্যাথি জগতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রবর্তী ব্যাক্তিত্ব বলে চিহ্নিত করা হয়। তিনি নিউইয়র্কে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা ও এবং নিউ জার্সি ও ফ্লোরিডায় নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। অনেক বইও লিখেছেন ও পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন তার মধ্যে নেচারস প্যাথ, উল্লেখযোগ্য। এবং প্রায় ষোল বার গ্রেপ্তার বরণ করেছেন ওষুধ বিশ্বাসীদের সাথে সংগ্রাম চালাতে গিয়ে।

এছাড়া ম্যাকফোডেনের পাঁচ ভল্যুমের সুবিশাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব ফিজিক্যাল কালচার (১৯১২) অপচিকিৎসার পরিধিতে বৃহত্তম কর্মযজ্ঞ। চার নম্বর ভল্যুমের ৫৭২ পৃষ্ঠা জুড়ে রয়েছে যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ অসুখের কথা তেমন পোলিও, ক্যানসার ইত্যাদির চিকিৎসা সহ ম্যাকফাডেনের নিজস্ব গৃহ চিকিৎসা পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে বিশেষ খাবার,ব্যায়াম এবং জলচিকিৎসা। তেমন, ক্যানসারের নিরাময়ের জন্য প্রথমে উপবাস, তারপর কয়েকটি ব্যায়াম, শেষে সঞ্জীবনী কারক কিছু পথ্য ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে। রোগী কে কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলা হয় নি। বরং বইতে ঐ অধ্যায়ে স্পষ্ট করে লেখা রয়েছে যে রোগ নিরাময়ে কোনো ঔষধ নেওয়া চলবে না। তিনি বিশ্বাস করতেন ক্যানসার কেবলমাত্র আঙ্গুরের পথ্য দিয়ে সারানো যাবে। এমনকি তিনি ঘোষণা করেন যে,যদি কেউ প্রমাণ

করতে পারে যে আঙ্গুর খাইয়ে ক্যানসার ভালো করা সম্ভব নয় তাহলে তিনি দশহাজার ডলার দিতে প্রস্তুত আছেন। প্রসঙ্গত য়ুরোপের আঙ্গুর উৎপাদন কারী অঞ্চলে আঙুরের সর্বরোগহর গুনের কথা সবার জানা, ঠিক তেমন ছাগলের দুধের গুনাবলী, সেরকমই।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এখানে ওখানে ব্যাঙের ছাতার মত নেচারোপ্যাথি স্কুল গজিয়ে ওঠে। বেশিরভাগ স্কুলেই গুটিকয়েক অগোছালো ঘর, রাতে ক্লাস এবং অল্প কয়েকটি লেকচারের পর জবরদস্ত ডিপ্লোমা। ফ্রেমে বাঁধাই হয়ে এই সার্টিফিকেট গুলো একজন গ্র্যাজুয়েটের ঘরের দেয়াল চমৎকার অলংকৃত করত। এইসব স্কুলগুলোর নিজেদের মধ্যে কোনো ঐক্য বা সমঝোতা ছিল না। প্রায়শই কিছু অপচিকিৎসক তাদের উন্মাদ ভাবনাকে প্রয়োগ করতে এক একটি আজব পদ্ধতি চালু করত। তেমন, একটা উদাহরণ হলো, চোখের আইরিস (Iris) সারাতে বিচিত্র পদ্ধতি (Iridiagnosis) যা অবৈজ্ঞানিক শুধু নয় বিপজ্জনকও বটে।

অনুরূপ চরিত্রের আরেকটি প্রকৃতি চিকিৎসা পদ্ধতির সন্তান হলো Zone therapy. হাতে কিংবা পায়ের আঙ্গুলে চাপ প্রয়োগ করে অথবা দেহের অন্য কোনো আক্রান্ত অংশে বা জোনে চাপ দিয়ে শারীরিক বেদনার উপশম পদ্ধতি। আবিষ্কারক ছিলেন ডাক্তার উইলিয়াম এইচ ফিটজেরাল্ড,

যিনি বেশ কয়েক বছর সেন্ট ফ্র্যান্সিস হাসপাতালের নাক ও গলার উচ্চ পর্যায়ের সার্জেন ছিলেন। অনেক রোগ উপশমে তাদের অদ্ভুত অদ্ভুত সব দাওয়াই ছিল। তেমন, চুল পড়ে যাওয়ার দাওয়াইয়ে রয়েছে বিচিত্র নিরাময় ব্যবস্থা - দুহাতের নখ আড়াআড়ি ভাবে দ্রুত ঘষতে হবে একটানা তিন চার মিনিট। কিছুক্ষণ পর এই ঘর্ষণ চালাতে হবে সারাদিন ধরে। এতে শরীরের সবকটি জোনের পুষ্টি বৃদ্ধি হবে এবং গোটা শরীরের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পাবে, মাথার খুলিতেও সেই উত্তম রক্ত সঞ্চালনের প্রতিফলন দেখা যাবে।

এ-ধরণের আজব চিকিৎসা কাউকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম কিনা এই প্রশ্ন থেকে যায়। অথচ শতশত প্রকৃতি চিকিৎসক একে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে। ভাবতে পারেন মেয়েদের মাসিকের গোলমাল সারবে জিভের কয়েকটি অংশে চাপ দিলে, মাথা ব্যাথা সারাতে চাপ দিতে হবে মুখের ভিতর টাকরায়। অথচ এই থেরাপির চিকিৎসকরা জানিয়েছেন তারা বহু দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি দিয়েছেন মানুষ কে।

নেচারোপ্যাথির মূল বিষয় প্রাচীন মত কে ধরে রাখা হয়েছে। যেমন - ব্যাধি কখনো বাইরে থেকে আসা রোগ জীবাণু দ্বারা হয় না, হয় দেহের ভেতর প্রাকৃতিক নিয়ম অবমাননার কারণে। এই চিকিৎসা জগতে সকলেই মনে করেন ঔষধ মাত্রই ক্ষতিকারক, ঔষধ সেবন করা উচিত নয়।

একজন নেচারোপ্যাথ কখনো ঔষধ ব্যবহার করেন না পরিবর্তে নির্ভর করে ভিটামিন, খনিজ, শাকসবজি,ফলের রস, গরুর কাঁচা দুধ আর সুষম খাবার এর উপর। অ্যালোপ্যাথ ডাক্তাররা অসুখ চেপে দেয়, নিরাময় করে না। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতে নেচারোপ্যাথি শিক্ষার জন্য ১০টি কলেজ আর ২৪টি হাসপাতাল রয়েছে। (Ministry of AYUSH, 2010)

অন্তিম পর্ব

আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, নেচারোপ্যাথি নিয়ে আলোচনা হলো। আরও কিছু জনপ্রিয় বিকল্প চিকিৎসা আছে। যার মধ্যে অন্যতম আকুপাংচার। আলোচনা তো চলতেই থাকবে। আর যার যে প্যাথিতে আস্থা সে তার পক্ষে বলতে থাকবে। এ বলার মধ্যে মূল বিষয়বস্তু আমি ওমুক কে সারতে দেখেছি তাই ওটা বিজ্ঞান। আমার এক বন্ধু একদিন বলছে আমি আমার বৃদ্ধ মায়ের জন্য অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি কিন্তু কাজ দিয়েছে রামদেবের তেল। শুধু তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। বাজারে যে সমস্ত স্বাস্থ্যের ম্যাগাজিন আছে তারাও এসব অবৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেশন করে। ধরুন পেটের গোলমাল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল প্রথম দিকে যে কথা বলছেন সেগুলো যুক্তিপূর্ণ যেমন পায়খানার বা কোষ্ঠকাঠিন্যের রোগীরা একটু শাক জাতীয় খাবার যার মধ্যে

ফাইবার আছে সেগুলো খান, যাদের অম্বলের রোগ তারা একটু সময়মতো খাওয়া দাওয়া করুন, রাত করবেন না,জল বেশি খান, এগুলো বলার পর আলোচনা শেষ করছেন এই ভাবে - এতেও কাজ না হলে নিকটবর্তী কোনো হোমিওপ্যাথ বা যোগ কেন্দ্র তে গিয়ে যোগাযোগ করুন। শুধু তাই নয় অনেক স্বাস্থ্যের ম্যাগাজিন জ্যোতিষ বইয়ের রেফারেন্স দেন।

মূল কথা হলো আপনি কিছু খেলেন আর কিছু নিরাময় হলো এই দুটি ঘটনার মধ্যে যুক্তিগ্রাহ্য কোনো কারণ নেই আপনি তর্ক শাস্ত্রের যেকোনো বইতেই এটা পেয়ে যাবেন।কাজেই এত তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তে আসবেন না। ডক্টর কভ্যুরের মত চলুন, উনি যখন হসপিটালে তখন ঔষুধ খাওয়ার পর খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের একজন যাজক এসে তাকে বললেন যীশুর আশির্বাদ মিশ্রিত জল বা চরণামৃত খেতে। ডাক্তার কভ্যুর তাকে নিরস্ত্র করলেন এই বলে যে দাঁড়ান এখুনি ঔষধ খেলাম এখন যদি চরণামৃত সেবন করি তাহলে কার কারনে ভালো হলাম সেটাই বুঝতে পারব না।

দেখুন তাদের বেশি সময় নেই পড়ার জন্য তাদের জন্য খুবই সংক্ষিপ্ত একটা লাইনে এবার বিকল্প চিকিৎসাটি কেন অবৈজ্ঞানিক লিখে দেওয়া যাক।

**আয়ুর্বেদ - ত্রিদোষ তত্ত্ব:**

- শারীরস্থানগত ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

**হোমিওপ্যাথি - লঘুকরণের নিয়ম:**

- রসায়নের মূলগত ধারণা অ্যাভোগাড্রো প্রকল্পের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়।

**আকুপাংচার - ছুঁচ ফুটিয়ে রোগের উপশম:**

- শারীরবিদ্যার মূল ধারণার সাথে বিরোধ।

**য়ুনানি – রসতত্ত্ব:**

- শারীরস্থানগত ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

**মূত্র চিকিৎসা - মূত্র সেবনে রোগ মুক্তি:**

- শরীরের বিভিন্ন বিপাকীয় ক্রিয়ায় উৎপন্ন অপ্রয়োজনীয় ও বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলি মূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

**অক্সিজেন থেরাপি** - শরীরের ভেতর প্রয়োজনের অতিরিক্ত অক্সিজেন ও ওজোন গ্যাস ঢোকানো।

- শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, ওজোন গ্যাসের মারাত্মক বিষক্রিয়া।

মোদ্দা কথা হলো যে খোদার উপর খোদকারি না করে অর্থাৎ প্রকৃতির উপর অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ না করে প্রকৃতির সাহায্য নিয়ে রোগ সারিয়ে তোলা। অথবা যা কিছু অবিকৃত, তার প্রকৃত যা কিছু মানুষের হাতে পরিবর্তিত তা ক্ষতিকর।

- এইরকম একটা অবৈজ্ঞানিক ধারণা বিকল্প চিকিৎসা ও চিকিৎসকের পূঁজি। তারা শুধু মানুষের নয় একই সঙ্গে তাঁর আত্মার ও চিকিৎসা করেন।

**আধুনিক চিকিৎসা কি ত্রুটি মুক্ত?**

সেই মাধ্যমিকের রচনা লেখা। বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ? স্পটত: ক্ষমতাধরের হাতে আধুনিক চিকিৎসা। রাষ্ট্র চেষ্টা করে, সার্বজনীন চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করতে। কিন্তু সেখানে পরিকল্পনা ও আন্তরিকতার যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। অপরদিকে বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা তো গলাকাটা চিকিৎসা। সেখানে ভুড়িভুড়ি অভিযোগ। অযৌক্তিক বিল,স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও অহেতুক আই.সি.ইউ.তে থাকার বিল, কোভিড এর মতো রোগের জন্য আঠারো লাখ টাকা বিল, মৃত পেশেন্টের ভেন্টিলেশনে রাখার বিল, টাকা না পেলে বডি না ছাড়া, একই টেষ্ট বারবার করিয়ে  ক্লিনিক্যাল ল্যাবের পকেট শক্তিশালী করা ও কমিশন ভোগ, এই হয়রানি মানুষের নিত্য সঙ্গী।

অপরদিকে সরকারি হাসপাতালে বা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অপ্রতুল চিকিৎসক, রোগীর জন্য কম সময় ও দরদ কম দিয়ে রোগী দেখা, ফলে ঠিক ঠাক রোগ নির্ণয় না হওয়া, হাসপাতালে ভর্তি করতে সমস্যা, অপ্রতুল বেড, নার্সিং স্টাফেদের দূর্ব্যবহার, দালালচক্র, ঔষধ না পাওয়া ইত্যাদি কারণে অনেকেই আধুনিক চিকিৎসা বিরূপ হয়ে পড়েছেন।

তাই গ্রামেগঞ্জে য়ুনানি, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথি, জলপোড়া, তেলপোড়া, রামদেব, আকুপাংচার বা পাথর (জ্যোতিষ) জনিত চিকিৎসার রমরমা। এই পরিস্থিতিতে সরকার ও যেহেতু আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করতে অপারগ তাই বিকল্প চিকিৎসা সেবাকেই সরকারি অনুমোদন দিতে ব্যস্ত। এতে সাপ মরেনা লাঠিও ভাঙে না। অথচ চিকিৎসা সবার অধিকার এবং সেটা আধুনিক চিকিৎসা সেবা। এক কোভিড এসে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার কঙ্কাল দেখিয়ে দিল।

**তবু কিছু কথা বলতে হচ্ছে:**

আধুনিক চিকিৎসার বিরুদ্ধে একটা নেগেটিভ ক্যাম্পেন সবসময় চলছে। যেটা আবার অবৈজ্ঞানিক।

১। অধিকাংশ বিকল্প চিকিৎসা নানাভাবে অস্ত্রচিকিৎসার (অপারেশন বা সার্জারির) বিরুদ্ধাচরণ করে। আবার আধুনিক ওষুধের নানা ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, অস্ত্রচিকিৎসা বিষয়ক সত্যিকারের ঝুঁকি ও অমূলক ভয় অনেক মানুষকে আধুনিক চিকিৎসা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়।এ নিয়ে অসম্পূর্ণ ও ভুল তথ্য এবং চিন্তাচেতনায় বাসা বেঁধে থাকা অজ্ঞতার কারণেই অনেকের কাছে আধুনিক চিকিৎসা ভীতিপ্রদ হয়ে উঠেছে। অপরপক্ষে বিকল্প চিকিৎসা সেবা তে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই বলে দাবি করা হয়। হোমিওপ্যাথির মতো মিথস্ক্রিয়াহীন চিকিৎসার ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার

সম্ভাবনা খুবই কম। বিভিন্ন দেশের বিকল্প চিকিৎসার সরবরাহকারীরা টিকা দেবার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার ভয়ংকর চেষ্টা চালাচ্ছে। ডাক্তার সার্জারির পরামর্শ দিয়েছেন অথচ তা না করে অনেকেই বিকল্প চিকিৎসার দ্বারস্থ হচ্ছেন।

২। আধুনিক চিকিৎসক কখনো কখনো রোগের কারণ খুঁজতে ব্যর্থ হন এবং রোগীর রোগ যন্ত্রনার অবসান ঘটাতে পারেন না। এই অবস্থায় সরাসরি রোগী কে তারা মতামত জানিয়ে দেন। অথচ বিকল্প চিকিৎসার কারবারিরা কখনো হাল ছাড়েন না কারণ এই রোগী তার মূলধন।

৩। এই মুহূর্তে এইডস্,ক্যান্সার রোগীর জীবনকাল হয়তো দীর্ঘায়িত করতে পারে আবার আর্থ্রাইটিস বা অন্যান্য বয়সজনিত সমস্যা সাময়িক ভাবে ভালো করে তুলতে পারে কিন্তু তাকে নিশ্চয়তা দিতে পারে না। আধুনিক চিকিৎসক এক্ষেত্রে সত্যিই অসহায়। আধুনিক চিকিৎসার অসম্পূর্ণতা আছে ঠিকই, সময়ের সাথে সাথেই তার ত্রুটি মুক্ত হয়ে উঠবে। অপরদিকে বিকল্প চিকিৎসা যে কোনো রোগের সম্পূর্ণ নিরাময় দাবি করে। এখানে ভরসাহীনতার কোনো জায়গা নেই।সারা পৃথিবীতে এমন অনেক ক্যান্সার পেশেন্ট পাওয়া যাবে যারা রেডিয়েশন ও কেমোথেরাপি বাতিল করে নানা ধরনের অপ্রমাণিত ও অপরীক্ষিত চিকিৎসার দিকে ঝুঁকে গেছেন।

৪। পিছিয়ে পড়া দেশে বিশেষত আফ্রিকা ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে দেশজ চিকিৎসা খুব কম খরচে পাওয়া যায়। আমদের দেশে স্ব-প্রশিক্ষিত কবরেজ বা হোমিওপ্যাথ নামমাত্র দক্ষিণায় রোগী দেখেন। কিন্তু তুলনায় আধুনিক চিকিৎসকদের ভিজিট অনেক বেশি। আবার য়ুরোপ ও আমেরিকায় লাইফস্টাইল ট্রিটমেন্ট (বিকল্প চিকিৎসা) নিতে হলে রীতিমত ভালো রকমের গাঁটের কড়ি খরচ করতে হবে।

৫। তবে বিকল্প চিকিৎসকদের অধিকাংশ পেশার কারণে নব্বই শতাংশ আধুনিক চিকিৎসার ঔষধ ব্যবহার করেন।

পরিশেষে যে কথা বলে বিদায় নেব। মোটের উপর বিকল্প পদ্ধতিগুলোর কার্যকারিতার কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই। বিকল্প চিকিৎসার কোনো পদ্ধতিকরণ যদি কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয় তাহলে সেটি বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা হয়ে উঠবে আর 'বিকল্প' থাকবে না।

চিকিৎসার বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও যেভাবে রোগী কে পরিষেবা দেওয়ার দাবি করা হচ্ছে তার প্রতারণার নামান্তর। বিকল্প চিকিৎসা যে ভাবে রোগীর চিকিৎসা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা আছে বলে গলা ফাটায় তাতে স্বাধীনতা শব্দটির অপব্যবহারই হয়। অর্থহীন অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বেছে নেওয়ার তাৎপর্য কি?

বিকল্প চিকিৎসার কিছু পদ্ধতি রোগীর শরীরে সাংঘাতিক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। কিরোপ্রাকটিক থেরাপিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীর উপর এক্স-রে প্রয়োগ করা হয়। অবাঞ্ছিত এই বিকিরণ বিশেষত: শিশুদের জন্য মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। কখনো কখনো বিকল্প চিকিৎসা দাবি করে জৈব রাসায়নিক বাস্তবায়ন না থাকলেও শুধুমাত্র প্ল্যাসিবো চিকিৎসা হিসাবে এদের কৃতিত্ব কে স্বীকার করা উচিত। উত্তর হলো সঠিক বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা সেবা থাকা সত্ত্বেও তা পাওয়ার অধিকার থেকে রোগীকে বঞ্চিত করে উপরন্তু গাঁটের পয়সা খরচ করে কার্যকারিতা হীন বিকল্প চিকিৎসা নেবার কোনো মানে আছে? জার্নাল অব আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য দিয়ে শেষ করছি। There is no alternative medicine. There is only scientifically proven, evidence- based medicine supported by solid data or unproven medicine, for which scientific evidence is lacking.

সূত্র:

বিজ্ঞানের ইতিহাস, সমরেন্দ্র নাথ সেন, ১ম খন্ড।

Medical Encyclopedia, Collins,1978

Encyclopedia Britannica, 15th Ed

বিজ্ঞান কে মুখোশ করে, মার্টিন গার্ডনার.

বিকল্প চিকিৎসা চিকিৎসার বিকল্প, মুক্তচিন্তা পাবলিকেশন, সুব্রত রায়।

Organon of medicine, 5th, Ed, S Hahnemann

# অথ ধর্মকথা - এক সাঁওতালের উপলব্ধি

- বিশ্বনাথ মুরমু

জ্ঞান হবার পর থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে মানুষে মানুষে অনেক তফাৎ আছে। প্রথম তফাৎটা আমরা বুঝতে পারি ভাষায়। যেমন কারও ভাষা সাঁওতালি, কারও ভাষা মুন্ডারি, কারও ভাষা বাংলা, কারও ভাষা হিন্দি, কারও ভাষা পাঞ্জাবি, কারও ভাষা অসমীয়া, কারও ভাষা গুজরাটি, ইত্যাদি (ভারতে অষ্টম তপশীলভুক্ত সর্বমোট ভাষার সংখ্যাই ২২টি। এর বাইরে আরও অজস্র ভাষা আছে)। দ্বিতীয় তফাৎটা হল জাতির। যেমন মুসলমান, পাঞ্জাবি, ওঁরাও, সাঁওতাল, বাঙালি, তামিল, ওড়িয়া, নেপালি, ইত্যাদি (এও আছে অজস্র)। তৃতীয় তফাৎ খাদ্যদ্রব্য ও খাদ্যাভ্যাসে। চতুর্থ তফাৎ পরনের কাপড়ে ও পদ্ধতিতে। পঞ্চম তফাৎ ধর্মাচরণে। দৈনন্দিন জীবনে যে যার গৃহকোনে কেমন ধর্মাচরণ করি, কোন ঠাকুরকে নাম করি, প্রণাম করি, তা হয়ত অন্যের কাছে অনেকটাই অজানা থাকে। কিন্তু সামাজিক জীবনে ধর্মীয় আচরণে যা চোখে পড়ে (জাহের থান, মন্দির, চার্চ, মসজিদ, ইত্যাদি), তা সত্যি করেই আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে যেন দেখিয়ে দেয়, যে এই বিষয়ে তফাৎটা ঠিক কোথায়, কতখানি। ধর্মাচরণ নিয়েই

বিশদ কথাবার্তা বলতে বসেছি। ধর্মাচরণ মানেই উপরের দিকে আঙুল তুলে কোনও এক মহা শক্তিধরের ধারণা পোষণ (ভিন্ন ভিন্ন নামে) এবং তার টুকরো টুকরো কিছু অবতারের তোষণ। এই আচরণের ক্ষেত্রে, কেউ কেউ কোথাও যায় না (আদিবাসীরা), ঠাকুর আছে কিন্তু কোন মূর্তি নেই, তাই ঘরে বাইরে মূর্তি রাখবার কোন দেবালয়ও নেই, তবে দেবস্থান আছে। তাদের মনে মনে জপ করে নিলেই হল। দেবস্থান আছে কোন গাছের গোড়ায়, খোলামেলা জায়গায়, আর সেখানে তারা যায় বিশেষ বিশেষ তিথিতে বিশেষ  বিশেষ পূজার আয়োজনে। একদল মানুষ বাড়িতে এক বা একাধিক ফটো, মূর্তি রেখে সকালে সন্ধ্যায় ধূপ, দীপে, অবোধ্য/দুর্বোধ্য মন্ত্র (মাতৃভাষায় নয়) আউড়ে পূজার্চনা করে। কারও আবার আলাদা একটা ঠাকুর ঘর বলেই থাকে। একদল মানুষ ঠাকুর প্রণাম করতে যায় মন্দিরে। কেউ রোজ যায়, কেউ আবার বিশেষ কোন তিথিতে, বিশেষ কোন পূজার দিনে। এখানেও আবার কথা আছে। সব মন্দিরে কিন্তু একই মূর্তি বা ঠাকুর থাকে না। বিশেষ বিশেষ মন্দিরে বিশেষ কোন ঠাকুর থাকলেও, কোন কোন ঠাকুরের আবার সচরাচর মন্দির দেখা যায় না। কোথাও আবার একই মন্দিরে সব ঠাকুরকে অর্থাৎ ঠাকুরের ফটো বা মূর্তিকে রাখা হয়। কোন কোন জায়গার ঠাকুরকে জাগ্রত বলা হয়(তাহলে ধরে নিতে হবে যে বাকি সব জায়গার ঠাকুর নিদ্রিত)। একই রকম উদ্দেশ্য নিয়ে আর

একদল মানুষ যায় মসজিদে। আবার, হিন্দি, বাংলা, সাঁওতালি, মারাঠি, ইংরেজি বা আরও অন্য ভাষায় কথা বললেও, এবং জাতিতে আলাদা আলাদা হলেও, আর একদল মানুষ যায় চার্চে, যীশুখ্রীষ্টের কাছে প্রার্থনা করতে, যারা ধর্মে খ্রীষ্টান। আমাদের সাধারণ ধারনায় আমরা জানি যে, জাতি, ভাষা ও ধর্ম যেন একটা পারস্পরিক সম্পৃক্ত ব্যাপার। কিন্তু, এতে বোঝা গেল যে জাতি, ভাষা আর ধর্ম বিষয়টা সম্পৃক্ত নয়।

**জাতি, ভাষা একই থাকলেও, ধর্মটা যেন আলাদা আলাদা নামাবলীর মত গায়ে চাপানোর ব্যাপার। এবং এই আলাদা নামাবলীর অন্ধত্বে মানুষ একে অন্যের প্রাণ পর্যন্ত নিতে পারে।**

ইদানিং, জাতি আর ভাষার অন্ধ বিরোধের সাথে যোগ হয়েছে ধর্মের। কারণটা এটাই যে, দৈনন্দিন জীবনে মানুষ যে আচরণ করে, তা বেশির ভাগটাই তার ধর্মীয় শিক্ষা থেকেই করে। ফলে, এক ধর্মীয় আচরণের মানুষের সাথে অন্য ধর্মীয় মানুষের আচরণের পার্থক্যের জন্য কখনও কখনও বেধে যায় সংঘাত। এর মধ্যে অসহিষ্ণুতা আছে, অজ্ঞতা আছে, নিজেকে শ্রেষ্ঠ অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা আছে, সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু হবার কারণ আছে, এবং

এখন নতুন সংযোজন হয়েছে রাজনৈতিক রং। আর এমনিতেই আমরা জানি, নিত্যদিন দেখে চলেছি রাজনৈতিক বিভেদ কতটা হীন, কদর্য হতে পারে। এতে আপনার, আমার, আমাদের যে অসুবিধা বা বিপদ, ধর্ম ও রাজনীতি এই দুই ধ্বজাধারীদের সেটাই সুবিধা। রাজনৈতিক বিভেদের কারণে, একই ধর্মীয়গোষ্ঠীর মধ্যে গোলমাল হলে, রাজনৈতিক ফায়দার কারনে, অনায়াসে তাতে ধর্মীয় রং চড়ানো হয়। আবার, ভিন্ন ধর্মীয়গোষ্ঠীর মধ্যের গোলমালকে (কখনও এক ধর্মীয়, কিন্তু দুই ভিন্ন মতাবলম্বী গোষ্ঠীর মধ্যের গোলমালকেও), ধর্মীয় লাভের কারণে রাজনৈতিক বিভেদকেই দায়ী করা হয়(অন্তত সেরকম বোঝানোর একটা প্রচেষ্টা চলে)। এতে করে, এই দুই ব্যবসায়ী অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যবসায়ী এবং ধর্মীয় ব্যবসায়ীরা প্রভূত লাভবান হয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, ধর্ম এবং রাজনীতি, এই দুটোই ব্যবসার জিনিস, তা যদি না হয়, তবে এই দুটোকেই অন্তত ব্যবসা হিসাবে ব্যবহার করা যায়। আদিতে, ধর্ম হয়ত মানুষের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল, যাতে মানুষ অন্যায় না করে সুখী হতে পারে। তেমনই রাজার রাজ্য শাসনের নীতি নির্ধারন হয়েছিল কল্যাণমূলক যাতে দেশের ও দশের কল্যাণ হয়। এখন রাজার জায়গা নিয়েছে মন্ত্রী পরিষদ। অতীতে এই দুটোর প্রবর্তক ও প্রবক্তাদের যে উদ্দেশ্য ছিল, তার বর্তমান অবস্থা দেখলে তাঁরা হয়তো বা বুক কি কপাল

চাপড়েই আত্মহত্যা করতেন, পরিণতি দেখবার কথা চিন্তাই করতে পারতেন না। কি ভীষণ "উল্টা বুঝলি রাম" অবস্থা।

পর্ব ২

বাংলায় বলা হয় যে ধর্ম নাকি এমন কিছু যা মানুষকে ধারণ করে থাকে। শব্দ বা উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যই যদি কোন অর্থ প্রকাশ করে, তাহলে ধর্মের ইংরেজি যা হবে বা আরও অন্য ভাষায় যা হবে, তা কি সেই ভাষার মানুষকে ধারণ করবে না? নাকি সেই সব মানুষকে ধারণ করতে অসমর্থ হবে? কারণ ইংরেজীতে তো ধর্মকে বলা হচ্ছে Religion. অবশ্য, এখন এমন অনেক তার্কিক পন্ডিত আছেন যারা আপনাকে আমাকে শব্দের মায়াজালে ঠিক বুঝিয়ে দেবে, যে তাতে ঠিক কি বোঝায়। তারা ঠিক ডিকশনারি ঘেঁটে ঘেঁটে r, e, l, i, g, i, o, n, সব কটা ওয়ার্ড এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলবে যে এইজন্যই কথাটাকে বলা হয়েছে রিলিজিয়ন। সে যাক। সাধারণ ভাবে আমরা ধর্ম বলতে যা বুঝি(আকাশের বুকে সর্বশক্তিমান কিছু থাকুক কি না থাকুক) তা হলো, সৎভাবে জীবন যাপন করা, অন্যায় না করা, মিথ্যা আচরণ না করা, লোভ না করা, বিবেকের নির্দেশ মেনেচলা, এইসব। এর বিপরীত ক্রিয়াকলাপই হলো অধর্ম বা পাপ। আর পাপের বেতন যে মৃত্যু সেও আমরা সবাই জানি। তবে কেন এত রকমের ধর্ম দেখা দিয়েছে? আর ধর্মে ধর্মে বিভেদই বা কেন? ধর্মে ধর্মে বিভেদও না হয় বুঝলাম। কোন কোন

ধর্মের তো আবার নিজের মধ্যেই বিভাজন আছে। তারাও যে একে অন্যকে পছন্দ করে না বা এড়িয়ে চলে। যেমন, খ্রীষ্টানের রোমান ক্যাথলিক আর প্রটেস্ট্যান্ট। ইসলামের সিয়া আর সুন্নি। বৌদ্ধধর্মের হীনযান আর মহাযান। জৈনের শ্বেতাম্বর আর দিগম্বর, ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে কোথাও একটা উদাহরণ পেয়েছিলাম এইরকম:-

- আপনি কি হিন্দু?

- হ, হিন্দু।

- আমিও হিন্দু। আপনি বৈষ্ণব, নাকি শাক্ত?

- বৈষ্ণব।

- হরে কৃষ্ণ আমিও বৈষ্ণব। আপনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব, নাকি চৈতন্য বৈষ্ণব?

- চৈতন্য বৈষ্ণব।

- হরে কৃষ্ণ। আমিও চৈতন্য বৈষ্ণব।

- তো আপনি কি ইস্কনে নাকি শ্রী গুরু?

- ইস্কনে।

- হরে কৃষ্ণ, আমাদের দেশি ইস্কন নাকি বিদেশি ইস্কন?

- দেশি।

- হরে কৃষ্ণ, আমিও দেশি।

এই উদাহরনে শেষ পর্যন্তই দুজনের মধ্যে মিল দেখা যাচ্ছে। কিন্তু, যদি দেখা যেত যে, তফাৎ হয়েই চলেছে হয়েই চলেছে, তাহলে কি আর তারা পরস্পরকে সহ্য করতে পারত? পারত না। মারামারি কাটাকাটি না লাগলেও, তারা পরস্পরের থেকে দুরে সরে যেত। কেননা, তারা জন্মসূত্রেই এই পারস্পরিক দূরত্বটা পেয়েছে, যে দূরত্বের উদ্ভাবক তাদের পূর্বসুরীরা।

কোনও কোনও ধর্মের আবার গ্রন্থ বা বই আছে। যেমন, ইসলামের আছে কোরান, বৌদ্ধের আছে ত্রিপিটক, খ্রীষ্টানের আছে বাইবেল, এইসব। অনেক ধর্মমতের তো কোন বইই নেই, তবুও তাদের জীবন ধারনে কোথাও কোন অসুবিধা আছে বলে তো মনে হয় না। বেশ কেটে যাচ্ছে যুগের পর যুগ। আদিবাসীরা লেখাপড়ার ধারই ধারতো না, লিপিও ছিল না। তাই তাদের লিখিত সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদিই নেই, ধর্মগ্রন্থতো দুরের কথা।

**তবে বর্তমানে দৃষ্টিবিভ্রমে সাঁওতালদের অবস্থাও অন্যদের মত হতে চলেছে। সাঁওতাল এখন প্রতিভার অধিকারী হয়ে আর কিছু হতে না পারুক, বেশ কিছু 'গুরু' বেরিয়ে পড়েছে, তাদের চেলাও তৈরি হয়ে গেছে।**

জৈনধর্মের কোন গ্রন্থ নেই। জাপানী শিন্টোধর্মেরও কোন গ্রন্থ নেই। ধর্মের উৎপত্তি কেন হলো, কেমন করে হলো? এর ধারণাই বা মানুষ করলো কেমন করে? একটু তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটা মনে হয় কিছু ধরা বোঝা অসম্ভব নয়। অতীতের কথা যতটা যা জানা গেছে যে তাতে মানুষ নাকি একদা দলবদ্ধ, শিকারজীবি, যাযাবর জীবনযাপন করতো। কৃষির যুগ তখনও আসতে দেরী আছে। সৃষ্টির শুরু থেকেই মানুষ যখন যেরকম প্রকৃতির রুপ দেখেছে, তখন তাকে সেইভাবেই কল্পনা করে নিয়েছে। কখনও ভক্তিতে, কখনও ভয়ে রুপকল্পনা করে (নারী, পুরুষ, শান্ত, বদরাগী, কল্যাণকারী, অনিষ্টকারী, ইত্যাদি) তাকে নানারকম উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করে এসেছে। তার আগের পর্যায় পন্ডিতরা যা বলেছেন, একেবারে গোড়ায় পুরাতন প্রস্তর যুগ, তারপরে নুতন প্রস্তর যুগ, তারপর লৌহযুগ, এইসব। একেবারে গোড়ার দিকের দলবদ্ধ শিকারজীবি মানুষ, শিকার করা পশুমাংস প্রত্যেকে সমানভাবে ভাগ করে কাঁচা চিবিয়ে খেত। আগুনের ব্যবহার শিখবার পর তারা তাতে ঝলসিয়ে বা পুড়িয়ে খেতে শিখল। এতে করে তারা দেখল যে পোড়া মাংস খেতে সুস্বাদু এবং সহজপাচ্য। তারপর ক্রমবিকাশের হাত ধরে মানুষ পরিবার বাঁধল এবং একসময় কৃষিজীবি হল। এবারেই সাম্যবাদী খোলস ছেড়ে মানুষ অসাম্যের জীবনে এসে পড়ল। শুরু হল তোমার, তোমাদের, আমার, আমাদের জীবন। আর তখন কোন

কোন মানুষের ইচ্ছে জাগল যে, জাগতিক যা কিছু কাজের জিনিস, তা যেন 'তোমার' চেয়ে 'আমার' বেশি বেশি থাকে। অর্থাৎ লোভের সূত্রপাত। এবং এর ফলে একে অন্যকে ফাঁকি দিয়ে একটু বেশি সরিয়ে নেওয়া, অথবা ওকে কায়দা করে বেশি খাটিয়ে নিজে একটু আরাম করা (স্বার্থপরতা), এইসব এলো। জেনে বুঝে নিজের বিবেক লঙ্ঘন করে মানুষ শুরু করল পাপের প্রক্রিয়া (যার অবধারিত ফল হল দুঃখ)। যে একজন পাপ করলো, অন্য একজন হয়ত তা জেনেবুঝেও চেপে গেল, প্রতিবাদ করল না, বা প্রতিকার করার উদ্দেশ্য নিয়ে অন্য কারুকে জানালো না। তখন সেও কিন্তু হয়ে পড়ল পাপের ভাগিদার। এখন, সবকালেই কিছু কিছু মানুষ চিন্তায় ও কাজে অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকে যে বা যাদের মনটা ভালো এবং চায় যে সবার ভালো হোক বলে। সেরকম মানুষ কিন্তু উপলব্ধি করবে যে লোভের বশবর্তী হয়ে যারা অন্যায়, অর্থাৎ পাপ করছে, তার ফলেই কিন্তু সৃষ্টি হচ্ছে জাগতিক দুঃখ ও কষ্ট। তাই, তিনি হয়ত তাদের ভালোর জন্যই, মিষ্টি কথায় চিড়ে ভেজাবার প্রয়াস করলেন। তিনি মানুষের ভয় আর ভক্তিতে সৃষ্ট কাল্পনিক দেব অথবা দেবীকে দিয়ে কাজ হাসিল করবার চেষ্টা করলেন। তাঁর প্রয়াসে কিছুটা চিড়ে হয়ত ভিজল, কিন্তু সবটা নয়। অর্থাৎ লোভের বশবর্তী হয়ে যারা অন্যায়ের পথে পা বাড়িয়েছিল, কিছু হয়ত সংযত হল কিন্তু সবাই নয়। এবারে সেই যার মনটা ভালো, মানুষের ভালো চান,

পরবর্তীতে তিনি কি করবেন? আগের মিষ্টি কথার বদলে, একটু একটু করে যষ্টি প্রয়োগ করবেন। কিছু নরম, কিছু গরম বাণীর সাথে সাথে বাধ্যতামূলক আচার অনুষ্ঠানের বিধান দিলেন। এবার দেখা গেল, ফল হল আগের চেয়ে ভালো। দেখা গেল যে অন্যায় কাজ অনেক কমে গেল, ফলে মানুষও অনেক ভালোভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম হলো। কিন্তু কথায় আছে না, চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। পাপের পথে যে একবার পা বাড়ায়, পাপ তাকে নিত্য হাতছানি দেয় (পাপের পথ মসৃন)। কিছুদিন যেতে না যেতেই সেই যথা পূর্বম তথা পরং। অর্থাৎ, আবার অন্যায়ের মাথাচাড়া দেওয়া এবং জাগতিক দুঃখকষ্টের বৃদ্ধি হওয়া। ফলে, আবারও আরো কোন একজন মানবহিতৈষী(ততদিনে আগেরজন হয়ত মারা গেছেন) মানব উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালালেন। তবে আগের জনের চেয়ে হয়ত আরও পৃথক বাণীতে, পৃথক পদ্ধতিতে। এখন সর্বকালেই আমরা বেশকিছু হুজুগে মানুষের দেখা পাই, যারা নতুন কিছু পেলেই হা রে রে রে করে মেতে ওঠে। নতুন মানবদরদীকে পেয়ে তাদের গুরু, গুরু রব ছাড়তে দেরি হল না। তারা জোর কদমে প্রচারের কাজ চালাতে লাগল। তারা একটা নামও দিয়ে দিল, ফলে উদ্ভব হলো নতুন এক ধর্মের। নামকরন হল, হয় গুরুর নামে নয়তো অন্য কোনো কিছু। তারা চাইলো অন্য সবাইকে এই গুরুর ছত্রছায়ায় আনতে, নিজেদের দলভারি করতে। কেউ আসতে রাজী হল, কেউবা

হল না। যারা এল তারা অতি উৎসাহীর হাত থেকে বেঁচে গেল, যারা এলনা, তারা দুয়ো পেতে লাগল। এতে করে, একে অন্যকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা এল। ক্রমে ক্রমে এই এড়িয়ে চলা গিয়ে দাঁড়ালো বিরোধে এবং এই বিরোধ একদিন গিয়ে দাঁড়ালো প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে। এইভাবে যত গুরুর সংখ্যা বেড়েছে, মানুষে মানুষে বিভাজনও বেড়েছে। দাঁড়ালো গিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণের বাণীতে যা 'যত মত তত পথ' এর মতো। অর্থাৎ সেই 'উল্টা বুঝলি রাম।'

পর্ব ৩

মানুষের ভালো করতে গিয়ে হলো মন্দ। এবং এতে ইন্ধন যোগানোর কারিগর সব হলেন গুরুর চ্যালাচামুন্ডাগণ। তাঁরা চিরকালই সেই বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়। এই প্রক্রিয়া যে কোনও একটা জাতি বা ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যেই চলেছিল সেরকম নয়, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যেও চলেছিল। ফলে দিকু বা হিন্দুর ধর্মচেতনা একভাবে বয়ে চলেছিল, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন, আরও অন্যান্যদের অন্য অন্যভাবে বয়ে চলেছিল। ফলাফল, বিভিন্ন নদীর তাদের শাখানদী, উপনদী নিয়ে একই সমুদ্র অভিমুখে, কিন্তু আলাদা আলাদা পথে বয়ে চলার মত। অন্তিমে নাকি সবারই স্বর্গপ্রাপ্তি। ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী কোনও ধর্মমতের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় গুরু বা তারও পরের গুরুদের আবির্ভাব হয়ে গেছে। ফল, আবারও বিচ্ছিন্নতা।

এই বিচ্ছিন্নতার আরও একটা কারণ হলো, জাতি ও ভাষাসত্তা। এক জাতির যখন কোন গুরুর উৎপত্তি হলো, স্বাভাবিক জাতিসত্তার প্রবণতায় অন্য কোন জাতি হয়ত তাতে উদ্বুদ্ধ হলো না। এবং একসময় দেখা গেল, কোন এক সুন্দর সকালে তাদেরও নিজস্ব গুরুর আবির্ভাব হয়ে গেছে। অতএব, ষোলকলা পূর্ণ।

ধর্মীয় বিষয়ে উৎসাহ দিয়ে বা বিশেষ কোন দেবালয়ের বা পূজারীদের পৃষ্ঠপোষক হয়ে, বিশেষ কোন রাজনৈতিক দল(ব্যাক্তিবিশেষও হতে পারে) ভোটব্যাঙ্কের ফায়দা তোলে, তুলতে পারে। কিন্তু, যেদেশে সরকার অথবা সরকারে থেকে কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এইরকম কাজ হাতে নেয় এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করে, বুঝতে হবে সেদেশের হাল কতটা দয়নীয় (অ-শিক্ষা, কু-শিক্ষা)। তাই দেখা যায়, দেশ গড়ার স্বার্থে এদেশে যেখানে অলি গলিতে লাইব্রেরি হওয়া দরকার, স্কুল হওয়া দরকার, শরীর গঠনের ক্লাব হওয়া দরকার, তার বদলে সরকারের তরফে না হলেও সরকারে থাকা কোন রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্বের তরফে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য মন্দির, মসজিদ বা চার্চ বানাবার অথবা সংস্কার করবার কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে।

**তাই মনে হয়, কার্ল মার্কস বাধ্য হয়েছিলেন বলতে যে ধর্ম হল জনগণের কাছে আফিমের মত, যার নেশায় তারা আচ্ছন্ন থাকে বা শাসক**

## দ্বারা শাসন ও শোষনের স্বার্থে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়।

বলা হয় যে বর্তমান জীবনে যে যা হয়েছে, তা হয়েছে তার বা তাদের পূর্বপুরুষদের পূর্বজন্মের পাপ বা পূণ্যের কল্যাণে। প্রচার করা হয় যে মাথার উপরে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর/আল্লা/গড আছেন, যিনি সবার ভাগ্য নির্ধারন করেন। ফলে, মানুষের কোনও কারিকুরি সেখানে চলে না। মাথা পেতে ঈশ্বরের/আল্লার/গডের(প্রকারান্তরে রাজার। মর্ত্যভূমে তিনিই নাকি ঈশ্বরের অবতার) নির্দেশকে বিনা প্রশ্নে, সীমাহীন আনুগত্যে, বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়ে জীবনধারণ করতে হয়। কিছু স্বঘোষিত, ঈশ্বরের ঠিকাদারের দেখা পাওয়া যায় যারা ধনিক শ্রেণীর দালালি করে, গরিব শ্রেণীর মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে বেশ আয়েসে জীবন কাটায়। যুগে যুগে, দেশে দেশে, এই তন্ত্র বা সিস্টেম, এমন করেই প্রভুত্ব করে এসেছে যাকে রাজতন্ত্র বলে থাকি।

এটা যদি সত্য না হয়ে থাকে, তবে যুগে যুগে, দেশে দেশে গণ আন্দোলন বা বিপ্লব বারেবারেই কেন দেখা দিয়েছে? ব্যাপারটা হলো প্রশ্ন করার, প্রশ্ন তোলার হিম্মতের, জবাব পাবার অধিকারের। এইখানেই শাসক শ্রেণী আর তার তাঁবেদারদের কৃতিত্ব যে তারা, কি কি পদ্ধতিতে কেমনভাবে এই মুক্তচিন্তার প্রশ্নের গলা টিপে ধরতে পারে বা পেরেছে। আজকে ভাষাবিদ্যার প্রয়োগে মিষ্টি মোড়কে যাই নাম দেওয়া

হোক না কেন, সারা পৃথিবীতেই একই মানসিকতার, একই জিনিসই চলছে। হ্যাঁ, যুগের সাথে ভাবনার একটু রদ বদল তো অবশ্যম্ভাবী। বর্তমানে, শাসকের শীর্ষনেতাকে রাজার বদলে কোথাও প্রধানমন্ত্রী বলা হয়, কোথাও বা প্রেসিডেন্ট বলা হয়। আর, এখন একা খাওয়ার বদলে পাঁচ পাঁচ বছর করে একদল লোককে যথেচ্ছ জীবন যাপনের সুযোগ করে দেওয়া হয়, ধনাঢ্য করে তোলা হয়(পোষাকী নাম মন্ত্রীসভা)। তারা নাকি শর্তসাপেক্ষে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত(নির্বাচনের আগে ভুরি ভুরি প্রতিশ্রুতি দেয়)। কিন্তু জনগণ যখন শর্তের কথা তোলে, তখন তাদের উপর বর্ষিত হয় লাথি, ঝাঁটা, কিল, চড় নয়ত গিলি গিলি ফুঃ, হাপ্পিশ। এই সিস্টেমের পোষাকী নাম নিশ্চয় বলতে লাগবে না যে এ হল গণতন্ত্র। সে যাক। কথা হচ্ছে ধর্মের। পাঠক, চিন্তা করুন ধর্মের উদ্দেশ্য নাকি মানুষের আত্মিক উন্নতির। সেখানে গেরুয়া পরে, কি সাদা কাপড় পরে, কি লাল কাপড় পরে, কি হলুদ কাপড় পরে, কি কাপড় না পরেই(উলঙ্গ থেকে), কি পাগড়ি পরে, কি দাড়ি না কেটে, কি পূর্বদিকে প্রণাম করে, কি পশ্চিমদিকে প্রণাম করে, কি আত্মিক উন্নতি হয়, বোঝা দুস্কর। এ তো ব্যবধানই সৃষ্টি করা হলো। হিংসা না করা, লোভ না করা, অন্যায় না করা, অন্যায় সমর্থন না করা(তেমনই অন্যায়ের প্রতিবাদ করাও), মিথ্যা না বলা, কু চিন্তা না করা, ইত্যাদি সৎ কর্মের জন্য কোন উপচারের প্রয়োজন আছে কি? আসলে, বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়

চেলারা, তাদের কেউ কেউ আবার ততদিনে প্রমোশন হয়ে নিজেরাই গুরু বনে গেছে, তারা দেখেছে যে যত উপচার, তত টু পাইস প্রফিট(দুগ্ধে, ঘৃতে, চর্বচোষ্যে এলাহাবাদ কান্ড)। করতে করতে আজ শিশু চারাগাছ মহীরুহ, এমনকি মহীরুহ ছড়িয়ে পড়েছে শুধু দেশে নয়, বিদেশের মাটিতেও। তেমনই, বিদেশের বিভিন্ন ধর্মমত সেখানকার মাটিতে আটকে না থেকে (ধর্মের তেজ বলে কথা) এদেশেও মহীরুহ হয়ে দেখা দিয়েছে। তাদের কি রমরমা, চিন্তা করা যায় না, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যে যে ধর্মগুরুরা বিভিন্ন কেস খেয়ে ফেঁসে আছেন (নজরবন্দী বা জেলে আছেন), তাদের কর্মকান্ড নিয়ে একটু খবর নিয়ে দেখুন, বুঝতে পারবেন (যারা ফাঁসেন নি তাদেরও বুঝতে পারবেন)। তারা আপনাকে, আমাকে বলে ত্যাগের কথা, তারা আমাদের শেখায় মায়াবাদ।

পর্ব ৪

কথা হলো, এর থেকে বেরিয়ে আসার কি কোন উপায় নেই? (বেরোতে দিলে তো বেরোবে? বেড়াজাল বিছানো আছে চতুর্দিকে)। বেরোবার উপায় থাকবে না কেন, অবশ্যই আছে। কিন্তু সেই যে বলে, লাও তো বটে, কিন্তু আনে কে? অধিকাংশ মানুষই চায়, যেমন আছে চলতে দাও, কোন পরিবর্তনের দরকার নেই। হ্যাঁ, এটা বা এরকম চলতে পারে ততক্ষণ, যতক্ষণ না বিশেষ কোন ক্ষমতাবান মানুষ বা

সম্প্রদায়কে আঘাত করছে বা তাদের ক্ষতি করছে। যদি ক্ষমতাবান শাসকদের বা তাদের আপনজনদের ক্ষেত্রে এরকম দেখা যায়, তবে অচিরেই দেখা যাবে পরিবর্তন এসে গেছে। অ্যাট এনি কস্ট, সামহাও তারা পরিবর্তন আনবেই। কিন্তু অর্থনৈতিক, শিক্ষানৈতিকভাবে দুর্বল, ভীরু, শতধা বিভাজিত, শাসিত আর শোষিতের বেলায়? দেখা যায়, প্রসঙ্গটা কে তুলবে, সেই লোকেরই দেখা পাওয়া না। জনমত, আন্দোলন, বিপ্লব তো বহুত দুর কি বাত। তাই মানুষের ধর্মবিশ্বাসে লাভবান শ্রেণী, কোনদিন কখনও চায়নি এবং এখনও চায় না যে এই গোলকধাঁধা থেকে মানুষ বেরোক। ধর্মকে শিরদাঁড়া বানিয়ে চলছে বিশ্বব্যাপী বিশাল বাণিজ্য লহরী। একটা উদাহরন দিই। ধরেনিন কোনও একটা মন্দির/প্যাগোডা/মসজিদ/চার্চ/গুরুদ্বারা, ইত্যাদি। কেউ ভক্তিতে প্রণাম করতে গেলে প্রণামি দিতে লাগে (যুগ যুগ ধরে মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এসব জায়গায় প্রণাম করলে পূণ্য অর্জন করা যায়। পূণ্য করবো কেন? না, আমাদের জন্মই হয়েছে পাপের মধ্যে দিয়ে। আমরা জন্মপাপী। তাই আমাদের পূণ্য অর্জন করতে হবে, দান ধ্যান, পূজো ব্রত, ইত্যাদি কাজের মধ্যে দিয়ে)।এতে বিশেষ প্রতিষ্ঠানের যে সেবক/সেবকেরা নিয়োজিত/লিপ্ত আছে তার/তাদের সরাসরি লাভ বা উপার্জন। শুধু প্রণামি দিয়ে প্রণাম সারলে আবার চলবে না। একটা মোমবাতি অথবা কটা ধূপকাঠি জ্বালাতে লাগবে। সে সব সাজিয়ে

কাছেপিঠেই বসে আছে সেবকের ভাই বিরাদারেরা। তাদেরও টু পাইস লাভ। হতে পারে, তাদের বিক্রির একটা অংশ কমিশন হিসেবে সেবককে/সেবকদের দিতে লাগে। তেমনই, কোথাও আছে ফুলের, মালার, চন্দনের দোকান, কোথাও বাতাসা নকুলদানার দোকান, আরও আছে চাদরের দোকান, মোমবাতির দোকান, কলা, আপেল, আঙুর, নারকেল, ধূপ-ধুনো, ইত্যাদি যথাবিহিত উপচার। অর্থাৎ, পুরোপুরি একটা সাজানো গোছানো বাজার। এখন কেউ যদি চক্রবৎ চলতে থাকা এই বাজারটা ভাঙতে যায়, সে কি রেহাই পাবে এর পৃষ্ঠপোষকদের হাত থেকে? এভাবেই শুরু হয়েছিল এবং চলে আসছে ভাগ্যবাদীদের নিয়ে প্রবাল, গোমেদ, চুনী, পান্নার রঙীন পাথরের ব্যাবসা। এভাবেই চলছে কবচ বা তাবিজের ব্যাবসা। ইদানিং এসেছে লাকি বাম্বু (কার জন্য লাকি? জনসাধারণের পেছনে আনলাকি বাম্বু), লাফিং বুদ্ধ (জনগন বুদ্ধু), জাম্পিং ফ্রগ, ইত্যাদি। কিন্তু কে শোনে কার কথা? অর্থনৈতিক পরাধীন, চিন্তাচেতনায় পরাধীন মানুষ, গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসানোতেই বিশ্বাস করে। বর্তমান জগত, বিশ্বাসের জগত, যে বিশ্বাস কমছে না বরং বেড়েই চলেছে, যুক্তি যেখানে কাজ করে না, কাজ করতে দেওয়া হয় না।  এই বিষয়টা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় খুব সুন্দর করে বলে গেছেন তাঁর একটা কবিতায়। শোনা যাক:-সর্বহারা অবিশ্বাসী

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর স্ত্রী, বেশ সেজেগুজে এসেছে/

কিন্তু আমাদের সঙ্গে খেতে বসবে না/

আজ তার নীলষষ্ঠী/

যৌবন বয়সে এই নিয়ে কত না চটুল রঙ্গ/ করতাম/

এখন শুধু একটা পাতলা হাসি,/ অন্যের বিশ্বাসে নাকি আঘাত দিতে নেই/ আর এক বন্ধু, যে প্রথম আমায় ছাত্র/ রাজনীতিতে টেনেছিল/ তার আঙুলে দেখি একটা নতুন পাথর-বসানো/ আংটি/ আমার কুঞ্চিত ভুরু দেখে সে দুর্বল গলায় বলল/ শরীরটা ভালো যাচ্ছে না,/ তাই শাশুড়ি এটা পরতে বললেন, মুনস্টোন/ না বলা যায় না/ আমার মনে হল, এ যেন আমারই নিজস্ব পরাজয়!/ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের বাড়ি, মাঝে মাঝে যাই তাঁর/ আলাপচারী শুনতে/ এখনও কত কিছু শেখার আছে/ আজই প্রথম দেখলাম, তাঁর দরজায় পেছন/ দিকে,/ গণেশের মূর্তি আটকানো/ প্রশ্ন করিনি, তিনি নিজেই জানালেন,/ দক্ষিণ ভারত থেকে ছেলে এনেছে, কী দারুণ/ কাজ না?/ সুন্দর মূর্তির স্থান শো-কেশের বদলে দরজার/ ওপরে কেন/ বলিনি সেকথা, সেই ফক্কুড়ির বয়েস আর নেই/ বয়েস হয়েছে তাই হেরে যাচ্ছি, অনবরত হেরে/ যাচ্ছি/ অন্যের বিশ্বাসে আঘাত দিতে নেই, অন্যের/ বিশ্বাসে আঘাত দিতে নেই/ চতুর্দিকে এত বিশ্বাস, দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে কত/ রকম বিশ্বাস/ যে গেরুয়াবাদী ঠিক করেছে, পরধর্মের শিশুর/ রক্ত/ গড়াবে মাটিতে, চাটবে কুকুরে/ সেটাও তার দৃঢ় বিশ্বাস/ ধর্মের যে

ধ্বজাধারী মনে করে, মেয়েরা গান/ গাইলে গলার নলি/ কেটে দেওয়া হবে/ টেনিস খেলতে চাইলেও পরতে হবে বোরখা/ সেটাও তার দৃঢ় বিশ্বাস/ যে পেটে বোমা বেঁধে যাচ্ছে ধ্বংসের দিকে/ যে পেশি ফুলিয়ে, দেঁতো হাসি হেসে/ পদানত করতে চাইছে গোটা বিশ্বকে/ এরা সবাই তো বিশ্বাসীর দল/ সবাই বিশ্বাসী, বিশ্বাসী, বিশ্বাসী.../ এক একবার ভাঙা গলায় বলতে ইচ্ছে করে/ অবিশ্বাসীর দল জাগো/ দুনিয়ার সর্বহারা অবিশ্বাসীরা এক হও!

তবুও, পৃথিবীর ইতিহাসে পরিবর্তনও হয়েছে (তবে উপযুক্ত মূল্য দিতে হয়েছে)। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস, নিজেদের ইতিহাস পড়বে কে? যাদের পড়া দরকার, যাদের পরিবর্তন দরকার, তাদের কতজন লিখতে পড়তে পারে, কতজন নিরক্ষর তারা নিজেরা কি সে খোঁজ রাখে? ইতিহাস বলে যা পাই, পড়ি, তা কি প্রকৃত ইতিহাস? যাইহোক, ভারতে ইংরাজের প্রভুত্বকালে ইংরাজ মিশনারীগন জ্যাকপট লাভ করে সাঁওতাল বা সাঁওতালদের মত নিরীহ, গোবেচারা আদিবাসীদের পেয়ে (অন্যান্য ভারতীয় জাতিও ছিল)। ফলে, সাঁওতালদের নন্ খ্রীষ্টান আর খ্রীষ্টানের মধ্যে এল বৈরিতা, সন্দেহ, এইসব এবং তা এখনও প্রবহমান (এমনিতেও সাঁওতালদের মধ্যে সারিধরম আর সারনাধরম বলে, দুই

ধর্মমতের প্রবাহ অনেককাল আগে থেকেই চলে আসছে)। ইংরাজ মিশনারি বলে কথা, তাদের ব্যাবস্থা একেবারে নিখুঁত(গীর্জা প্রথা)। কেউ বেরোতে চাইলেও পারবে না, বরং আড়কাঠি হয়ে তারা চেষ্টা করে নতুন নতুন সাঁওতালদের (অন্য আদিবাসীরা অন্য স্ব-জাতীয়দের) নিজেদের দলে ঢোকাতে। ইদানিং আবার শোনা যাচ্ছে যে সাঁওতালি যে পরব, গান বাজনা তারা একদা ত্যাগ করেছিল, বাদ্যযন্ত্র সহকারে সাড়ম্বরে তাই তারা অনুষ্ঠিত করছে (এরমধ্যে নতুন কি চাল আছে কি নেই, কে বলতে পারে? আমি তো বলতে পারব না। সাঁওতাল খ্রীষ্টান কি কম পড়িয়াছে? বিশ্বের খ্রীষ্ট সমাজ সুদুর ভ্যাটিকান থেকে পরিচালিত হয়, আপনি আমি কোন মহাজন যে তা বুঝতে পারব?) তবে,

পৃথিবীতে এখন মানুষেরই বড় অভাব। পৃথিবী ভরে গেছে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, পারসী, জৈন, সারিধরম, সারনাধরম, ইত্যাদি ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীতে। আর এই তথাকথিত ধার্মিকরা, একদা মহান ও সুন্দর পৃথিবীতে হানাহানি, রক্তপাত, খুন, ধর্ষণ, লুঠতরাজ, অগ্নি সংযোগ, ভেদাভেদ আর হিংসারই আমদানি করেছে। পৃথিবী তাই আর সুস্থভাবে বাসযোগ্য নেই। সেটা করতে হলে, যুক্তি মনস্ক, বিজ্ঞান মনস্ক, উদার দৃষ্টিভঙ্গি, বিবেকবান, মানবিক মূল্যবোধের লোক চাই, স্বাভাবিক জীবন যাপনে যারা মানুষ হয়ে উঠবে এবং অন্যদের করে তুলবে।

## পর্ব ৫

যুক্তিবাদী হওয়া সত্বেও, ব্যাক্তিজীবনে অনেকেই কিন্তু প্রকৃতই দ্বিচারি জীব(আমিও তাই)। মুখে বলে ঠাকুর দেবতা মানি না, ধর্ম মানি না, ভাগ্য মানি না, জ্যোতিষ মানি না, লাল সূতো, কবচ তাবিজ, পাথর - শিকড় মুর্দাবাদ, কিন্তু সেই তারাই হয়ত রাত জেগে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘোরে, ঈদে বা দশমীতে কোলাকুলি করে, প্রণাম করে। সাঁওতালের 'আবগে বঙ্গা'য় গ্রামের লোকের সাথে বাৎসরিক পিকনিক করে, মারাংবুরুর নামে জাহের থানে মুরগি মানত করে, আরও কিছু করে (আমিও)। আসলে, তারা এ সবের বিকল্প এখনও খুঁজে পায়নি, যা সফলভাবে এক জাতির সব মানুষকে, অথবা যে কোন জাতিরই প্রতিটি মানুষকে মেলাতে পারে ধর্ম নিরপেক্ষ ভাবে। ততদিন যুক্তিবাদী হয়েও ঐসব সহ্য করে চলেছে, মেনে চলেছে নেহাৎ নিরুপায় হয়েই। কারণ, এখনও পর্যন্ত তারা এমন কিছু ভেল্কি আবিস্কার করতে পারেনি, যা আবালবৃদ্ধবনিতা, আপামর জনসাধারনকে ভুলিয়ে, আনন্দ দিয়ে একত্র রাখতে পারে। তাছাড়া, এখন পর্যন্ত তারা খুবই সংখ্যালঘুও বটে। অন্যদিকে, যে কোন মনুষ্য সমাজেই, শিশুর জন্মের সময় থেকেই তাকে দেবদেবী, কবচ তাবিজ, শিকড় পাথর, অলৌকিক, অতিলৌকিক, ভৌতিক, দৈবী ইত্যাদির

বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেফেলা হয়। যুক্তিবাদী হতে কোন একটা মানুষের কমপক্ষে অন্তত ২৪/২৫ বছর বয়স পর্যন্ত সময় লেগে যায়, যেতে পারে। কানে শুনে বিশ্বাস করার পরিবর্তে, গুরুদেব বলেছেন বলে বিশ্বাস করার পরিবর্তে, যুক্তির উত্তর চাইলেই নাস্তিক, পাখন্ডী, ইত্যাদি কথা শুনতে হয়। স্বাভাবিক কৌতূহলেও কেউ যুক্তির কথা জানতে চাইলেও রে রে করে চতর্দিক থেকে আক্রমণ ধেয়ে আসে (মা, বাবা, ভাই, বোন, ঠাকুমা, দাদু, পিসি, মাসী, মামি, কাকিমা, জেঠিমা, পাড়ার দাদু, কাকু, জেঠা, ইত্যাদি ইত্যাদি)। তবুও বলবো, মানুষের যুক্তিবোধ সংখ্যায় কম হলেও বেড়ে চলেছে, বাড়তেই থাকবে যদি না তারা বাধ্য হয় এবং ধান্দাবাজদের খপ্পরে বা ফাঁদে পড়ে। বহু যুক্তিবাদীদের ক্ষেত্রে তো লাইফ থ্রেটনিং পর্যন্ত হয়ে গেছে। কেউ বা শহীদও হয়ে গেছেন। তবুও, সুখের অন্তত একটা বিষয় হয়েছে যে কয়েক বছর যাবৎ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান তাদের ধর্মের কলামে বিভিন্ন ধর্ম উল্লেখের সাথে সাথে 'মানবতা' কেও উল্লেখ করে চলেছে, অনেকের মতেই একমাত্র যেটা হওয়া উচিৎ। ধর্ম যদি আড়ম্বর সর্বস্বই কিছু হয়, তবে বলবো, রজনীশই একমাত্র সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন, আর তা হলো ভোগের মধ্যে দিয়ে ত্যাগের রাজ্যে উত্তরণ। তাঁর মতে, যার নুন আনতে পান্তা ফুরোয়, সে আবার কি ধর্ম করবে? ধর্ম করতে হলে বা ধর্ম পালন করতে হলে ধন থাকা চাই। তবেই না কেউ ভোগ করতে

করতে একসময় ত্যাগের রাজ্যে পৌঁছবে! যার মনে সবসময় কামনা রয়েছে, বাসনা রয়েছে, জাগতিক সামগ্রীর জন্য লালসা রয়েছে, তার পক্ষে ত্যাগী হয়ে মোক্ষলাভ একান্তই অলীক ব্যাপার। ভালোভাবে ধর্ম পালন করতে হলে তো আড়ম্বরও তদনুরুপ হতে হবে। জপতপের ভালো জায়গা চাই (উত্তম ইট, বালি, সিমেন্ট, মার্বেল, টাইলস্ এর ইমারত), একটা মূর্তি চাই বা মূর্তি না হলে লোকের চোখে ধাঁধা লাগানোর মত অনুরুপ একটা উপাদান চাই, ঢাক চাই, কাঁসি চাই(কখনও খাসিও চাই), উত্তম বস্ত্র চাই, আসন চাই, ধুপধূনো, কোশাকুশি চাই, ফুল চাই, মালা চাই, আতপ চাল ধান দূর্বা চাই, আপেল কলা (সব কলা আবার ঠাকুরের পেটে সহ্য হয় না), নকুল দানা, বাতাসা, ঢাক ঢোলের আওয়াজ, মাইক বক্সে তাকে দশগুন বাড়িয়ে পরীক্ষার্থী, হার্ট পেশেন্টদের অসুবিধা করে আড়ম্বর করা চাই। অর্থাৎ কিনা ধমাকেদার দেখনদারি চাই (ব্যবসা চলবে না কেন বলুন?)। সত্যিই তো, গরীবের দম কোথায় এমনভাবে কোনও ঠাকুরের (বা ভগবানের) সেবা করার, ধর্ম পালন করায়? রজনীশ তো তাহলে ঠিকই বলেছেন। তা সত্বেও বলছি, মন্দির, মসজিদ, চার্চ, প্যাগোডা, অবতার, ঠাকুর, এসব যদি সত্যি হত, প্রসাদ কি চরণামৃত খেয়ে কখনও ভক্তদের ভেদবমি হত না, হাসপাতালের চিকিৎসায় তাদের ভালো হতে হত না। কখনও চোর বাবাজীরা মন্দিরের সামগ্রী, মূর্তির গায়ের সোনারুপোর অলঙ্কার চুরি করে, কখনও

হয়ত বহুমূল্য মূর্তিটাকেই চুরি করে নিয়ে যায়, অথচ কোন ঠাকুরের ক্ষমতা হয় না তাদের আটকাতে। ঠাকুরের অভিশাপে না হয় তাদের প্যারালিসিস কি ওলাওঠা, না হয় তাদের ভেদবমি (এই কারনেই যুক্তিবাদীরা অন্তর থেকেই অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী নয়, শুধুমাত্র উৎসবে বিশ্বাসী যা মানুষে মানুষে মিলন আনে, বিভেদ ঘটায় না)।

**এতসব বুঝেও, তা সত্বেও সাড়ম্বরে ঠাকুর পূজো করতে হবে, ধর্মস্থান বানাতে হবে, লক্ষ লক্ষ থেকে কোটি টাকার বাজেট রাখতে হবে, নতুন নতুন দেবস্থান গড়তে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার চাঁদা তুলতে হবে, চাঁদা না দিলে পেটে লাথি মারবো, হাত ভেঙে কোলে তুলে দেব, ইত্যাদি।**

A জাতি ধর্মের সামাজিক, দৈবিক কাজে যদি B দল আপত্তি করে, বাধা দেয়, হুকুম মত চাঁদা দিতে না চায়, ওদের মহল্লায় রাতে পেটো ঝাড়বো, কেরোসিন ছিটিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেবো, ইত্যাদি। আমাদের চেনো না তো বাছাধন, বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বো। আমরা পরম ধার্মিক বলে কথা(অহিংসা পরমো ধর্ম)। কাজেই আর বেশী বক্তব্য রেখে লাভ কি? অর্থনীতিবিদরা দোহাই দেবেন, কি দরকার, চলতে দিন না মশাই যেমন চলছে। দেখছেন না কি, অন্ধবিশ্বাস কি বিশাল একটা শিল্প ও বাণিজ্য। এইসব পুরোহিত, বাবাজী, গুরুজী, ধর্ম, ঠাকুর, মূর্তি, ভাগ্য, পাথর

আছে বলেই না সারা রাজ্যে কি সারাদেশে ধনী থেকে গরীব কেমন করেকম্মে খাচ্ছে। দেখুন কেমন খড় শিল্প বেঁচে আছে, বাঁশ শিল্প বেঁচে আছে, মাটি শিল্প বেঁচে আছে, রং শিল্প বেঁচে আছে, শোলা শিল্প বেঁচে আছে, ফুল শিল্প ফল শিল্প বেঁচে আছে, দূর্বা ঘাস- বেলপাতা শিল্প আছে, বাতাসা নকুলদানা শিল্প বেঁচে আছে, সন্দেশ মিষ্টি শিল্প বেঁচে আছে, ছাগল-গোরু-উট শিল্প (বলি দেবার জন্য) বেঁচে আছে, লাল শালু শিল্প গামছা শিল্প ধুতি শাড়ী শিল্প বেঁচে আছে, ঢাক শিল্প (শিল্পীও) বেঁচে আছে, শ্যামা সঙ্গীত শিল্প বা ঠাকুর বন্দনা শিল্প বেঁচে আছে(সঙ্গে হারমোনিয়াম, তবলা শিল্প আছে, গীতিকার সুরকার আছে), নৃত্য শিল্প আছে, ঠাকুরের ছবি আঁকা শিল্প আছে, ঠাকুরের মালা- লকেট শিল্প আছে, নাটক-সিনেমা আছে, কাব্য সাহিত্য আছে, ঠাকুরের গানের কলার টিউন আছে, ইত্যাদি। এখনকার থিম পূজোর জন্য কোন শিল্পটা যে বাদ আছে, এমন হয়ত খুঁজেই পাওয়া যাবে না। রঙীন বেলুন হতে পারে, কাঁচের বোতল হতে পারে, কোল্ড ড্রিংসের বোতল হতে পারে, তালা চাবি, কলম, লণ্ঠন, করাত কাটারি, চুলের কাঁটা বা ফিতেও হতে পারে। কখন যে কোনটা থিম হবে আপনি আমি পাত্তাই পাবো না।

অন্যদিকে কট্টর যুক্তিবাদীরাও কে যে কখন সুবিধাবাদী হয়ে প্ল্যাটফর্ম বদল করতে পারে, তাই বা কে বলতে পারে? চোখের সামনে যখন রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নরের সই করা রাশি রাশি সার্টিফিকেটের হাতছানি আসবে, তখন যে

কেউই এই যুক্তিই দেখাতে পারে যে, যুক্তিবাদ মে ক্যা রক্খা হ্যায় য়ার! মওকা মিলা হ্যায় আও, কামালো কামালো। আর কারও সামনে যদি বারো ইঞ্চি মাপের স্টিলের চকচকে ফলা তুলে ধরা হয়? যারজন্য প্রতিবাদী চরিত্ররা চিরকাল সলমন রুশদী হয়ে খোলামঞ্চে ছুরি খেয়ে যাবে, এতে আর অবাক হবার কি আছে? তা সত্বেও জোর গলায় বলা চলে, ধর্ম ব্যাবসায়ী, ভাগ্যবাদী অথবা জাতপাতের বিভেদকামীদের বিরূদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, মানবতা ধর্মের ডক্টর দাভোলকরদের হত্যা করা গেলেও, তাদের আদর্শকে কোনভাবেই হত্যা করা যায় না, যাবে না।

# আশ্চর্য ভাতের গন্ধ

-বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আশ্চর্য ভাতের গন্ধ

রাত্রির আকাশে

কারা যেন আজো ভাত রাঁধে

ভাত বাড়ে, ভাত খায়।

আর আমরা

সারা রাত জেগে থাকি

আশ্চর্য ভাতের গন্ধে

প্রার্থনায়, সারা রাত

# শাশ্বত

-অনার্য

ঊষার আলোর আহ্বানে নতুনের জাগরণ,
তৃণের শীশে শোভিত জীবন ক্ষণিকে স্খলন।
মায়ার পৃথিবী ভুলে যায় মায়া। একাকিনী জননী
খুঁজে ফেরে তার নয়ন মনি দিবস- যামিনী।
ভগবান, সকলই করিয়া থাকো মঙ্গল সাধনে!
পরম যতনে কাছে টেনে লও অমৃত বন্ধনে।
দয়ার সাগর প্রেমের আধার পুরুষোত্তম সত্য,
সকলই তোমার অধিন যবে তুমিই নিয়ন্তা নিত্য,
তবে কোন দোষে, কোন আক্রোশে সাঁজা দাও নির্দোষে?
আসলে তুমি, তুমি বলে কিছু নাই, চরম সর্বনেশে।
তবু ভিখ্ মাগে শতবার যত নির্বোধ দুর্বল,
সর্বজনীন কুসংস্কারে ভরসা অবিচল।।

এখানে সৃজন জীবন-প্রেম, মানুষ ও মনন,

এখানেই সব আনন্দ- হাসি রিক্তের বেদন।

সব দিয়ে সব কেড়ে লয় এই জগৎ-ঈশ্বর,

এই শাশ্বত-সত্য জানি তুমি-আমি- আর আর!

# হৃদকুণ্ড

-মিঞোরেগা

ভীষণ ভারী পাদুকায় হাটছি

আপন মনে—পৃথিবীর বুকে,

শক্ত হাতে আঁকা তুফানের বর-পরঙ গল্পের পেইন্টিংয়ের মত

দুঃখগুলোকে অবশেষে রেখে।

ব্যস্ত রাস্তায় অবরোধ করে আছে

ট্রাফিক পুলিশের মত—আমার হৃদকুণ্ড

সাজের বৃষ্টিজলে, দূরে ঠিকানা ঘোলাতে

এই সবুজ যথাকালে, ঠিকানা সিদ্ধান্ত করে

সে বসে থাকত নীরবে, ভাবুক অথচ কী যেন খুঁজছে—।

এই দশকে বেশি আর হয়তো এগোনো যাবে না

আলো বিষণ্নতায় মিশে গেছে

নাগরদোলার গানগুলো আঁধারে ভাসে

গাইতে গিয়ে ক্লান্তি চলে আসে

চেষ্টা করেও হয় না, হৃদকুণ্ড কম্প তৈরি করে

এ যাত্রা এভাবে থেমে যাবে।

রেঙ্গুন, মিয়ানমার

# ওঠরে ওঠ দলিত সমাজ

-সজল কান্তি টিকাদার

ছোট্টো শিশুর প্রাণ যে গেলো

বর্ণবাদের বিষ নজরে

নয়নে এবার বহ্নি জ্বালা

থাকিসনা আর চুপটি করে।

ওঠরে ওঠ দলিত সমাজ

পুড়িয়ে দে সব মনুর বিধান

নইলে কিন্তু এই আগুনেই

যাবে আরো শিশুর প্রাণ।

যতই বলুক বামুনরা সব

আমরা সবাই সমান মানুষ

আসলে ওসব লোক দেখানো

ওসব কথা মিথ্যে ফানুস।

মানবিকতা নাইকো ওদের

জাতকে রাখে সবার আগে

কত যে দলিত প্রাণ হারালো

সেসব খবর কে আর রাখে?

ভুলিসনেরে ওদের কথায়

দেব দেবী সব ফেলনা ছুড়ে

দেওয়ালে পিঠ  ঠেকেই গেছে

লড়াই কর এবার ঘুরে।

জল ছুঁলে যে প্রাণ নিয়ে নেয়

এমন ধর্ম চাইনা আর

বর্ণবাদের মধুর কথায়

ভুলিসনে আর খবরদার।

বাঁচার মতই বাঁচরে তোরা

পায়ের তলায় থাকিসনে

এই ভারতেই জন্ম তোদের

ভয়টা মনে রাখিসনে।

# নিয়মের রাজত্ব

- রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বিশ্বজগৎ নিয়মের রাজ্য, এইরূপ একটা বাক্য আজকাল সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানসম্পৃক্ত যে-কোন গ্রন্থ হাতে করিলেই দেখা যাইবে যে, লেখা রহিয়াছে, প্রকৃতির রাজ্যে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই; সর্ব্বত্রই নিয়ম, সর্ব্বত্রই শৃঙ্খলা। ভূতপূর্ব্ব আর্গাইলের ডিউক নিয়মের রাজত্ব সম্পর্কে একখানা বৃহৎ কেতাবই লিখিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যের রাজ্যে আইন আছে বটে, এবং সেই আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তিরও ব্যকথা আছে; কিন্তু অনেকেই আইনকে ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভ করে। কিন্তু বিশ্বজগতে অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যে যে সকল আইনের বিধান বর্ত্তমান, তাহার একটাকেও ফাঁকি দিবার যো নাই। কোথাও ব্যভিচার নাই, কোথাও ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভের উপায় নাই। কোথাও ব্যভিচার নাই, কোথাও ফাঁকি দিয়া অব্যাহতি লাভের উপায় নাই। কাজেই প্রাকৃতিক নিয়মের জয়গান করিতে গিয়া অনেকে পুলকিত হন ভাবাবেশে গদগদ কণ্ঠ হইয়া থাকেন; তাঁহাদের দেহে বিবিধ সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়।

যাঁহারা মিরাকল বা অতিপ্রাকৃত মানেন, তাঁহারা সকল সময় নিয়মের অব্যভিচারিতা স্বীকার করেন না, অথবা প্রকৃতিতে

নিয়মের রাজত্ব স্বীকার করিলেও অতিপ্রাকৃত শক্তি সময়ে সময়ে সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ স্বীকার করেন। যাহারা মিরাকল মানিতে চাহেন না, তাঁহারা প্রতিপক্ষকে মিথ্যাবাদী নির্ব্বোধ পাগল ইত্যাদি মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করেন। কখনও বা উভয় পক্ষে বাগ্যুদ্ধের পরিবর্তে বাহুযুদ্ধের অবতারণা হয়। বর্ত্তমান অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে নূতন করিয়া গম্ভীরভাবে একটা সন্দর্ভ লিখিবার সময় গিয়াছে, এরূপ না মনে করিলেও চলিতে পারে।

**প্রাকৃতিক নিয়ম কাহাকে বলে? দুই একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করা যাইতে পারে। গাছ হইতে ফল চিরকালই ভূমিপৃষ্ঠে পতিত হয়। এ পর্যন্ত যত গাছ দেখা গিয়াছে ও যত ফল দেখা গিয়াছে, সর্ব্বত্রই এই নিয়ম।**

যে দিন লোষ্ট্রপাতিত আম্র ভূ-পৃষ্ঠ অন্বেষণ না করিয়া আকাশমার্গে ধাবিত হইবে, সেই ভয়াবহ দিন মনুষ্যের ইতিহাসে বিলম্বিত হউক।

ফলে আম বল, জাম বল, নারিকেল বল, সকলেই অধোমুখে ভূমিতে পড়ে, কেহই ঊর্ধ্বমুখে আকাশপথে চলে না। কেবল আম জাম নারিকেল কেন, যে কোন দ্রব্য উর্দ্ধে উৎক্ষেপ কর না, তাহাই কিছুক্ষণ পরে ভূমিতে নামিয়া আসে। এই

সাধারণ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম এ পর্যন্ত দেখা যায় নাই। অতএব ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। পার্থিব দ্রব্য মাত্রই ভূকেন্দ্রাভিমুখে গমন করিতে চাহে। এই নিয়মের নাম

ভৌম আকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ। প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মভঙ্গ হয় না; কাজেই যদি কেহ আসিয়া বলে, দেখিয়া আসিলাম, অমুকের গাছের নারিকেল আজ বৃত্তচ্যুত হইবা মাত্র ক্রমেই বেলুনের মত উপরে উঠিতে লাগিল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য ব্যক্তির উপর বিবিধ নিন্দাবাদ বর্ষিত হইতে থাকিবে। কেহ বলিবে — লোকটা মিথ্যাবাদী; কেহ বলিবে — লোকটা পাগল; কেহ বলিবে—লোকটা গুলি খায়; এবং যিনি সম্প্রতি রসায়ন নামক শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি হয়ত বলিবেন, হইতেও বা পারে, বুঝি ঐ নারিকেলটার ভিতরে জলের পরিবর্তে হাইড্রোজেন গ্যাস ছিল। কেহ না, তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস যে, নারিকেল, – খাঁটি নারিকেল, যাহার ভিতরে জল আছে, হাইড্রোজেন নাই, এ-হেন নারিকেল কখনই প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গে অপরাধী হইতে পারে না। খাঁটি নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ করে না বটে, তবে হাইড্রোজেনপূর্ণ বোম্বাই নারিকেল নিয়ম ভঙ্গ করিতে পারে; আম ভূমিতে পড়ে, কিন্তু মেঘ বায়ুতে ভাসে; প্যারাশূট-বিলম্বিত আরোহী নীচে নামে বটে, কিন্তু বেলুনটা উপরে উঠে। তবে এইখানে বুঝি নিয়ম ভঙ্গ হইল। পূর্ব্বে এক নিঃশ্বাসে নিয়ম বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, পার্থিব দ্রব্য মাত্রেই নিম্নগামী হয়; কিন্তু এখানে দেখিতেছি, নিয়মের

ব্যভিচার আছে; যথা মেঘ, বেলুন ও হাইড্রোজেন-পোরা বোম্বাই নারিকেল। লোহা জলে ডুবে, কিন্তু শোলা জলে ভাসে। কাজেই প্রকৃতির নিয়মে এইখানে ব্যভিচার।

অপর পক্ষ হঠিবার নহেন; তাঁহারা বলিবেন, তা কেন, নিয়ম ঠিক আছে, পার্থিব দ্রব্য মাত্রেই নীচে নামে, এরূপ নিয়ম নহে। দ্রব্যমধ্যে জাতিভেদ আছে।

**গুরু দ্রব্য নীচে নামে, লঘু দ্রব্য উপরে উঠে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। লোহা গুরু দ্রব্য, তাই জলে ডুবে; শোলা লঘু দ্রব্য, তাই জলে ভাসে; ডুবাইয়া দিলেও উপরে উঠে।**

নারিকেল গুরু দ্রব্য; উহা নামে। কিন্তু বেলুন লঘু দ্রব্য; উহা উঠে।

এই নিয়মের ব্যতিক্রম খুঁজিয়া বাহির করা বস্তুতই কঠিন। কার সাধ্য ঠকায়। ঐ জিনিষটা উপরে উঠিতেছে কেন? উত্তর, এটা যে লঘু। ঐ জিনিষটা নামিতেছে কেন? উত্তর, ওটা যে গুরু। যাহা লঘু, তাহা ত উঠিবেই; যাহা গুরু, তাহা ত নামিবেই; ইহাই ত প্রকৃতির নিয়ম।

সোজা পথে আর উত্তর দিতে পারা যায় না; বাঁকা পথে যাইতে হয়। লোহা গুরু দ্রব্য; কিন্তু খানিকটা পারার মধ্যে ফেলিলে লোহা ডুবে না। ভাসিতে থাকে। শোলা লঘু দ্রব্য; কিনতু জল উইতে তুলিয়া ঊর্ধ্বমুখে নিক্ষেপ করিলে ঘুরিয়া

ভূতলগামী হয়। তবেই ত প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হইল। উত্তর—আরে মূর্খ, গুরু লঘু শব্দের অর্থ বুঝিলে না। গুরু মানে এখানে পাঠশালার গুরুমহাশয় নহে বা মন্ত্রদাতা গুরুও নহে; গুরু অর্থে অমুক পদার্থ অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ ভারী। লোহা গুরু, তার অর্থ এই যে, লোহা বায়ু অপেক্ষা গুরু, জল অপেক্ষা গুরু; কাজেই বায়ুমধ্যে, কি জলমধ্যে রাখিলে লোহা না ভাসিয়া ডুবিয়া যায়। আর লোহা পারার অপেক্ষা লঘু; সমান আয়তনের লোহা ও পারা নিক্তিতে ওজন করিলেই দেখিবে, কে লঘু, কে গুরু। পারা অপেক্ষা লোহা লঘু, সে জন্য লোহা পারায় ভাসে। প্রাকৃতিক নিয়মটার অর্থই বুঝিলে না, কেবল তর্ক করিতে আসিতেছ। এ পক্ষ বলিতে পারেন, আপনার বাক্যের অর্থ যদি বুঝিতে না পারি, সে ত আমার বুদ্ধির দোষ নহে, আপনার ভাষার দোষ। গুরু দ্রব্য নামে, লঘু দ্রব্য উঠে, বলিবার পূর্ব্বে গুরু লঘু কাহাকে বলে, আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত ছিল। আপনার আইনের ভাষা যোজনায় দোষ ঘটিয়াছে; উহার সংশোধন আবশ্যক।

ভাষা সংশোধনের পর প্রাকৃতিক আইনের সংশোধিত ধারাটা দাঁড়াইবে এই রকম:

ধারা।— কোন দ্রব্য অপর তরল বা বায়বীয় দ্রব্যমধ্যে রাখিলে প্রথম দ্রব্য যদি দ্বিতীয় দ্রব্য অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা

হইলে নিম্নগামী হইবে, আর যদি লঘু হয়, তাহা হইলে ঊর্দ্ধগামী হইবে।

ব্যাখ্যা।- এক দ্রব্য অন্য দ্রব্য অপেক্ষা গুরু কি লঘু, তাহা উভয়ের সমান আয়তন লইয়া নিক্তিতে ওজন করিয়া দেখিতে হইবে।

উদাহরণ।—রাম প্রথম দ্রব্য, শ্যাম দ্বিতীয় দ্রব্য। রামকে শ্যামের আয়তন মত ছাঁটিয়া লইয়া তুলাদন্ডে ওজন করিয়া দেখ, রাম যদি শ্যাম অপেক্ষা গুরু হয়, তাহা হইলে শ্যামের মধ্যে রামকে রাখিলে রাম নিম্নগামী হইবে। শ্যামকে তরল পদার্থ মনে করিতে আপত্তি করিও না। সংশোধনের পর আইনের ভাষা অত্যন্ত সুবোধ্য হইয়া দাঁড়াইল, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

এখন দেখা যাউক, কত দূর দাঁড়াইল। পার্থিব দ্রব্য মাত্রই ভূমি স্পর্শ করিতে চাহে, নিম্নগামী হয়; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম নহে।

**সুতরাং উহার ব্যভিতার দেখিলে বিস্মিত হইবার হেতু নাই; পার্থিব দ্রব্য অবস্থাবিশেষে, অর্থাৎ অন্য পার্থিব বস্তুর সন্নিধানে, কখনও বা উপরে উঠে, কখনও বা নীচে নামে। যখন অন্য কোন বস্তুর সন্নিধানে থাকে না, তখন সকল পার্থিব দ্রব্য নীচে নামে।**

যেমন শূন্য প্রদেশে, পাম্পযোগে কোন প্রদেশকে জলশূন্য ও বায়ুশূন্য করিয়া সেখানে যে-কোন দ্রব্য রাখিবে, তাহাই নিম্নগামী হইবে। আর বায়ুমধ্যে, জলমধ্যে, তেলের মধ্যে, পারদ মধ্যে কোন জিনিষ রাখিলে তখন লঘু-গুরু বিচার করিতে হইবে। ফলে ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম; ইহার ব্যাভিচার নাই। এই অর্থে প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য। তবে যত দোষ এই জলের আর তেলের আর পারার আর বাতাসের। উহাদের সন্নিধিই এই বিষম সংশয়।

উৎপাদনের হেতু হইয়াছিল। ভাগ্যে মনুষ্য বুদ্ধিজীবী, তাই প্রকৃত দোষীর সন্ধান করিতে পারিয়াছে; নতুবা প্রকৃতিতে নিয়মের প্রভুত্বটা গিয়াছিল আর কি! বাস্তবিকই দোষ এই তরল পদার্থের ও বায়বীয় পদার্থের। বেলুন উপরে উঠে, বায়ু আছে বলিয়া; শোলা জলে বাসে, জল আছে বলিয়া; লোহা পারায় ভাসে, পারা আছে বলিয়া ; নতুবা সকলেই ডুবিত, কেহই ভাসিত না; সকলেই নামিত, কেহই উঠিত না।

অর্থাৎ কি না, পৃথিবী যেমন সকল দ্রব্যকেই কেন্দ্রমুখে আনিতে চায়, তরল ও বায়বীয় পদার্থ মাত্রেই তেমনই মগ্ন দ্রব্য মাত্রকেই উপরে তুলিতে চায়। প্রথম ব্যাপারের নাম দিয়াছি মাধ্যাকর্ষণ; দ্বিতীয় ব্যাপারের নাম দাও চাপ। মাধ্যাকর্ষণে নামায়, চাপে ঠেলিয়া উঠায়। যেখানে উভয় বর্তমান, সেখানে উভয়ই কার্যা করে। যার যত জোর।

যেখানে আকর্ষণ চাপ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর নামিতে হয়; যেখানে চাপ আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল, সেখানে মোটের উপর উঠিতে হয়। যেখানে উভয়ই সমান, সেখানে "ন যযৌ ন তখো"।

এখন এ পক্ষ স্পর্ধা করিয়া বলিবেন, — দেখিলে, প্রাকৃতিক নিয়মের আর ব্যতিক্রম আছে কি? আমাদের প্রকৃতির রাজ্যে কি কেবল একটা নিয়ম; কেবলই কি একটা আইন? অনেক নিয়ম ও অনেক আইন, অথবা একই আইনের অনেক ধারা। যথা—

১ নং ধারা—পার্থিব আকর্ষণে বস্তু মাত্রই নিম্নগামী হয়।

২ নং ধারা—তরল ও বায়বীয় পদার্থের চাপে বস্তু মাত্রই ঊর্ধ্বগামী হয়।

৩ নং ধারা—আকর্ষণ ও চাপ উভয়ই যুগপৎ কাজ করে। আকর্ষণ প্রবল হইলে নামায়, চাপ প্রবল হইলে উঠায়। কাহার সাধ্য, এখন বলে যে, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার আছে? উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম; নিয়ম কাটাইবার যো নাই। প্রকৃতির রাজ্য বস্তুতই নিয়মের রাজ্য। নারিকেল-ফল যে নিয়ম লঙ্ঘন করে না, তাহা যে দিন হইতে নারিকেল-ফল মনুষ্যের ভক্ষ্য হইয়াছে, তদবধি সকলেই জানে। বেলুন যে ঊর্ধ্বগামী। হইয়াও নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারিল না, তাহাও দেখা গেল। কেন না,

পৃথিবীর আকর্ষণ উভয় স্থলেই বিদ্যমান। পার্থিব দ্রব্য ব্যতীত অপার্থিব দ্রব্যও যে পৃথিবীর দিকে আসিতে চায়, তাহা কিন্তু সকলে জানিত না। দুই শত

বৎসরের অধিক হইল, এক জন লোক পৃথিবীতে জানান, অয়ি মাতঃ, তোমার আকর্ষণ কেবল নারিকেল-ফলেই ও আতা ফলেই আবদ্ধ নহে; তোমার আকর্ষণ বহুদূরব্যাপী। তোমার অধম সন্তানেরা তাহা জানিয়াও জানে না। এই ব্যক্তির নাম সার আইজাক নিউটন।

তিনি জানাইলেন দূরস্থ চন্দ্রদের পর্যন্ত পৃথিবী মুখে নামিতেছেন, ক্রমাগত ভূমিস্পর্শের চেষ্টা করিতেছেন, কেবল স্পর্শলাভটি ঘটিতেছে না। কেবল তাহাই কি? স্বয়ং দিবাকর, তাঁহার পার্ষদবর্গ সমভিব্যাহারে পৃথিবী মুখে আসিবার চেষ্টায় আছেন। কেবল তাহাই কি? পৃথিবীও তাহাদের প্রত্যেকের নিকট যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। অর্থাৎ সকলের দিকে যাইতে চাহিতেছেন; স্বস্থানে স্থির থাকিতে কাহারও চেষ্টা নাই; সকলেই সকলের দিকে ধাবমান।

ধাবমান বটে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট বিধানে; পৃথিবী সূর্য্য হইতে এত দূরে আছেন; আচ্ছা, পৃথিবী এইটুকু জোরে সূর্য্যের অভিমুখে

চলিতে থাকুন। চন্দ্র পৃথিবী হইতে এতটা দূরে আছেন; বেশ, চন্দ্র প্রতি মিনিটে এত ফুট করিয়া পৃথিবী মুখে অগ্রসর হউন। পৃথিবী নিজেও চন্দ্র হইতে এত দূরে আছেন, তিনিও মিনিটে চন্দ্রের দিকে এত ফুট চলুন। তবে তাঁহার কলেবর কিছু গুরুভার, তাঁহাকে এত ফুট হিসাবে চলিলেই হইবে; চন্দ্র পৃথিবীর তুলনায় লঘুশরীর; তাঁহাকে এত ফুট হিসাবে না চলিলে হইবে না। তুমি বৃহস্পতি, বিশাল কায় লইয়া বলহু দূরে থাকিয়া পার পাইবে মনে করিও না। তোমার অপেক্ষা বহুগুণে বিশালকায় সূর্য্যদেব বর্ত্তমান; তুমি তাহার অভিমুখে এই নির্দ্দিষ্ট বিধানে চলিতে বাধ্য; আর বুধ-কুজাদি ক্ষুদ্র গ্রহগণকেও একেবারে অবজ্ঞা করিলে তোমার চলিবে না, তাহাদের দিক্ দিয়াও একটু ঘুরিয়া চগিলতে হইবে। আর শনৈশ্চর, কোটি কোটি লোষ্ট্রখণ্ডের মালা পরিয়া গর্ব্ব করিও না; এই ক্ষুদ্র লোষ্ট্রখণ্ডকে উপহাস করিবার তোমার ক্ষমতা নাই। নেপচুন, তুমি বহু দূরে থাকিয়া এত কাল লুকাইয়াছিলে; বন্ধু উরেনসকে টান দিতে গিয়া স্বয়ং ধরা পড়িলে।

আবিষ্কৃত হইল বিশ্বজগতে একটা মহানিয়ম, একটা কঠোর আইন; এই আইন ভঙ্গ করিয়া এড়াইবার উপায় কাহারও নাই। সূর্য্য হইতে বালুকণা পর্যন্ত সকলেই পরস্পরের মুখ চাহিয়া চলিতেছে, নির্দ্দিষ্ট বিধানে নির্দিষ্ট পথে চলিতেছে।

খড়ি পাতিয়া বলিয়া দিতে পারি, ১৯৫৭ সালের ৩রা এপ্রিল মধ্যাহ্নকালে কোন্ গ্রহ কোথায় থাকিবেন। এই যে কঠোর আইন প্রকৃতির সাম্রাজ্যে প্রচলিত আছে, ইহার এলাকা কত দূর বিস্তৃত? সমস্ত বিশ্ব-সাম্রাজ্যে কি এই নিয়ম চলিতেছে? বলা কঠিন। সৌরজগতের মধ্যে ত আইন প্রচলিত দেখিতেই পাইতেছি। সৌরজগতের বাহিরে খবর কি? বাহিরের খবর পাওয়া দুষ্কর। খগোলমধ্যে স্থানে স্থানে এক এক যোড়া তারা দেখা যায়; তারকাযুগলের মধ্যে একে অন্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। যেমন চন্দ্র ও পৃথিবী এক যোড়া বা পৃথিবী সূর্যা আর এক ঘোড়া, কতকটা তেমনই। পরস্পর বেষ্টন করিয়া ঘুরিবার চেষ্টা দেখিয়াই বুঝা যায়, সৌরজগতের বাহিরেও এই আইন। বলবৎ। কিন্তু সর্ব্বত্র বলবৎ কি না, বলা যায় না। কেন না, সংবাদের অভাব। দূরের তারাগুলি পরস্পর হইতে এত দূরে আছে যে, পরস্পর আকর্ষণ থাকিলেও তাহার ফল এত সামান্য যে, তাহা আমাদের গণনাতেও আসে না, আমাদের প্রত্যক্ষগোচরও হয় না।

সম্ভবতঃ এই আইনের এলাকা বহুদূর বিস্তৃত। সমস্ত খগোলমধ্যে সকলেই সম্ভবতঃ এই আইনের অধীন। কিন্তু যদি কোন দিন আবিষ্কৃত হয় যে, কোন একটা তারা বা কোন একটা প্রদেশের তারকাগণ এই আইন মানিতেছেনা, তাহা হইবে কি হইবে? যদি বিশ্ব-সাম্রাজ্যের কোন প্রদেশের

মধ্যে এই আইন না চলে, তবে কি ব্রমান্ডকে নিয়মতন্ত্র রাজ্য বলিয়া গণ্য করিব না?

মনে কর, নিউটন সৌরজগতের মধ্যে যে নিয়মের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, দেখা গেল, বিশ্ব-জগতের অন্য কোন প্রদেশে সেই নিয়ম চলে না, সেখানে গতিবিধি অন্য নিয়মে ঘটে; তখন কি বলিব? তখন নিউটনের নিয়মকে সংশোধন করিয়া লইয়া বলিব, বিশ্ব-জগতের এই প্রদেশে এই নিয়ম; অমুক প্রদেশে কিন্তু অন্য নিয়ম। এই প্রদেশে এই নিয়মের ব্যভিচার নাই, ঐ প্রদেশে ঐ নিয়েমর ব্যভিচার নাই। কিন্তু সর্ব্বত্রই নিয়মের বন্ধন – জগৎ নিয়মের রাজ্য। নিউটনের আবিষ্কৃত নিয়ম সর্ব্বত্র চলে না বটে, কিন্তু কোন-না-কোন নিয়ম চলে।

ইহার উপর আর নিয়মের রাজত্বে সংশয় স্থাপনের কোন উপায় থাকিতেছে না। কোন একটা নিয়ম আবিষ্কার করিলাম: যত দিন তাহার ব্যভিচারের দৃষ্টান্ত দেখিলাম না, বলিলাম—এই নিয়ম অনিবার্য্য, ইহার ব্যভিচার নাই। যে দিন দেখিলাম, অমুক স্থানে আর সে নিয়ম চলিতেছে না, অমনি সংশোধনের ব্যথা। তখনই ভাষা বদলাইয়া নিয়ম সংশোধিত ভাবে প্রকাশ করিলাম। বলিলাম—অহো, এত দিন আমার ভুল হইয়াছিল; ঐ স্থানে ঐ নিয়ম, আর এই স্থানে এই নিয়ম। আগে যাহা নিয়ম বলিতেছিলাম, তাহা

নিয়ম নহে; এখন যাহা দেখিতেছি, তাহাই নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মগুলি যেন ব্যাকরণের নিয়ম - যেন ব্যাকরণের সূত্র। ইকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের রূপ সর্ব্বত্র মুনি শব্দের মত, পতি শব্দ ও সখি শব্দ, এই দুইটি বাদ দিয়া। এখানে সাবেক নিয়মের যে ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম দেখিতেছ, উহা প্রকৃত ব্যভিচার বা ব্যতিক্রম নহে, উহা একটা নবাবিষ্কৃত অজ্ঞাতপূর্ব্ব নিয়ম, এরূপ স্থানে এইরূপ ব্যভিচারই নিয়ম। ইহার উপর আর কথা নাই।

অর্থাৎ কি না, নিয়মের যতই ব্যভিচার দেখ না কেন, নিয়ম ভাঙ্গিয়াছে বলিবার উপায় নাই। জলে শোলা ভাসিতেছে, ইহাতে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনও না; এখানে মাধ্যাকর্ষণ বর্তমান আছে, তবে জলের চাপে শোলাকে ডুবিতে দিতেছে না, এ স্থানে ইহাই নিয়ম। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে আমাদের দেশে বর্ষা হয়। এ বৎসর বর্ষা ভাল হইল না; তাহাতে নিয়ম ভাঙ্গিল কি? কখনই না। এ বৎসর হিমালয়ে যথেষ্ট হিমপাত ঘটিয়াছে; অথবা আফ্রিকার উপকূলে এবার অতিবৃষ্টি ঘটিয়াছে; এবার ত এ দেশে বর্ষা না হইবারই কথা; ঠিক ত নিয়মমত কাজই হইয়াছে।

# নিয়ম দেখা গেল, চুম্বকের কাঁটা উত্তরমুখে থাকে। পরেই দেখা গেল, ঠিক উত্তর মুখে থাকে না; একটু হেলিয়া থাকে। আচ্ছা, উহাই ত নিয়ম।

আবার কলিকাতায় যতটা হেলিয়া আছে, লন্ডন শহরে ততটা হেলিয়া নাই, না থাকিবারই কথা; ইহাই ত নিয়ম। আবার কলিকাতায় এ বৎসর যতটা হেলিয়া আছে, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ততটা হেলিয়া ছিল না। কি পাপ, উহাই ত নিয়ম? চুম্বকের কাঁটা চিরকালই এক মুখে থাকিবে, এমন কি কথা আছে? উহা একটু একটু করিয়া প্রতি বৎসর সরিয়া যায়; দুই শত বৎসর বরাবরই দেখিতেছি, ঐরূপ সরিয়া যাইতেছে; উহাই ত নিয়ম। কাঁটা আবার থাকিয়া থাকিয়া নাচে, কাঁপে, স্পন্দিত হয়। ঠিকই ত। সময়ে সময়ে নাচাই ত নিয়ম। প্রতি এগার বৎসর একবার উহার এইরূপ নর্ত্তনপ্রবৃত্তি বাড়িয়া উঠে। আবার সূর্য্যবিম্বে যখন কলঙ্কসংখ্যার বৃদ্ধি হয়, যখন মেরুপ্রদেশে উদীচী ঊষার দীপ্তি প্রকাশ পায়, তখনও এই নর্ত্তনপ্রবৃত্তি বাড়ে। বাড়িবেই ত, ইহাই ত নিয়ম।

একটা নিয়ম আছে, আলোকের রশ্মি সরল রেখাক্রমে ঋজু পথে যায়। যতক্ষণ একই পদার্থের মধ্য দিয়া চলে, ততক্ষণ বরাবর একই মুখে চলে। জানালা দিয়া রৌদ্র আসিলে

সম্মুখের দেওয়ালে আলো পড়ে। ছিদ্রের ভিতর দিয়া চাহিয়া সম্মুখের জিনিষ দেখা যায়, আশ-পাশের জিনিষ দেখা যায় না। কাজেই বলিতে হইবে —আলোক ঋজু পথে চলে। নতুবা ছায়া পড়িত না; চন্দ্রগ্রহণ সূর্যগ্রহণ ঘটিত না। অতএব আলোকের সোজা পথে যাওয়াই নিয়ম। কিন্তু সর্ব্বত্রই কি এই নিয়ম? অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়া আলো গেলে দেখা যায়, আলোক ঠিক সোজা পথে না গিয়া আশে-পাশে কিছু দূর পর্যন্ত যায়। শব্দ যেমন জানালার পথে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চলে ও আশে-পাশে চলে, সেইরূপ আলোকরশ্মিত সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে চলে ও আশে-পাশে যাওয়াই নিয়ম। বস্তুতঃ এ স্থলেও প্রাকৃতিক নিয়মের কোন লঙ্ঘন হয় নাই।

শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় এই। যাহা দেখিব, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহা এ পর্যন্ত দেখি নাই, তাহা নিয়ম নহে বলিয়া নিশ্চিত্ত থাকিতে পারি; কিন্তু যে-কোন সময়ে একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়া আমার নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে। কাজেই এটা প্রাকৃতিক নিয়ম, ওটা নিয়ম নহে, ইহা পূরা সাহসে বলাই দায়।

অথবা যাহা দেখিব, তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়মলঙ্ঘনের সম্ভাবনা কোথায়? চিরকাল সূর্য পূর্ব্বে উঠে,

দেখিয়া আসিতেছি; উহাই প্রাকৃতিক নিয়ম মনে করিয়া বসিয়া আছি; কেহ পশ্চিমে সূর্যোদয় বর্ণনা করিলে তাহাকে পাগল বলি। কিন্তু কাল প্রাতে যদি দুনিয়ার লোকে দেখিতে পায়, সূর্য্যদেব পশ্চিমেই উঠিলেন আর পূর্ব্বমুখে চলিতে লাগিলেন, তখন সে দিন হইতে উহাকেই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অবশ্য এরূপ ঘটনার সম্ভাবনা অত্যন্ত অল্প। কিন্তু যদি ঘটে, পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিক একযোট হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন কি?

প্রকৃতির রাজ্যে নিয়মটা কিরূপ, তাহা কতক বোঝা গেল। তুমি সোজা চলিতেছ, ভাল, উহাই নিয়ম; বাঁকা চলিতেছ, বেশ কথা, উহাই নিয়ম। তুমি হাসিতেছ, ঠিক নিয়মানুযায়ী; কাঁদিতেছ, তাহাতেও নিয়মের বাতিক্রম নাই। যাহা ঘটে, তাহাই যখন নিয়ম, তখন নিয়মের ব্যভিচারের আর অবকাশ থাকিল কোথায়? কোন নিয়ম সোজা; কোন নিয়ম বা খুব জটিল। কোনটাতে বা ব্যভিচার দেখি না; কোনটাতে বা ব্যভিচার দেখি; কিন্তু বলি, ঐখানে ঐ ব্যাভিচার থাকাই নিয়ম। কাজেই নিয়মের রাজ্য ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই।

ফলে জাগতিক ঘটনাপরস্পরার মধ্যে কতকগুলা সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। ঘটনাগুলা একেবারে অসম্বন্ধ বা শৃঙ্খলাশূন্য নহে। মানুষ যত দেখে, যত সূক্ষ্ম ভাবে দেখে, যত বিচার করিয়া দেখে, ততই বিবিধ সম্বন্ধের আবিষ্কার

করিয়া থাকে। বহুকাল হইতে মানুষে দেখিয়া আসিতেছে, সূর্য পূর্ব্বে উঠে, নারিকেল ভূমিতে পড়ে কাষ্ঠরূপী ইন্দ্রনযোগে প্রাকৃত অগ্নি উদ্দীপিত হয়, আর অন্নরূপী ইন্দ্রনযোগে জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। এই সকল ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ মনুষ্য বহুকাল হইতে জানে। আলোক ও তাড়িত প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির সম্পর্কে নানা তথ্য, বিবিধ ঘটনার পরস্পর সম্বন্ধ, মনুষ্য অল্প দিন মাত্র জানিয়াছে। যত দেখে, ততই শেখে, ততই জানে: যতক্ষণ তাহা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। ইন্দ্রিয়গোচর হইলেই তৎসম্পর্কে একটা নূতন তথ্যের আবিষ্কার হয়। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে কে বলিতে পারে, কালি কোন নূতন নিয়মের আবিষ্কার হইবে? বিংশ শতাব্দীর শেষে মনুষ্যের জ্ঞানের সীমানা কোথায় পৌঁছিবে, আজ তাহা কে বলিতে পারে?

যাহা দেখিতেছি, যে সকল ঘটনা দেখিতেছি, তাহাদিগকে মিলাইয়া তাহাদের সাহচর্য্যাগত ও পরম্পরাগত সম্পর্ক যাহা নিরূপণ করিতেছি, তাহাই যখন প্রাকৃতিক নিয়ম, তখন প্রকৃতিতে অনিয়মের সম্ভাবনা কোথায়? যাহা কিছু ঘটে, তাহা যতই অজ্ঞাতপূর্ব্ব হউক না কেন, তাহা যতই অভিনব হউক না, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। কোন স্থলে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিলে সেই ব্যতিক্রমকেই সেখানে নিয়ম বলিতে হয়। কাজেই ব্রহ্মান্ড নিয়মের রাজ্য। ইহাতে আবার বিস্ময়ের কথা কি? ইহাতে আনন্দে গদগদ হইবারই বা হেতু কি? আর নিয়মের শাসনে জগদযন্ত্র চলিতেছে মনে

করিয়া একজন সৃষ্টিছাড়া নিয়ন্তার কল্পনা করিবারই বা অধিকার কোথায়? জগতে কিছু না কিছু ঘটিতেছে, এটার পর ওটা ঘটিতেছে, যাহা যেরূপে ঘটিতেছে, তাহাই নিয়ম, প্রাকৃতিক নিয়মের আর কোন তাৎপর্য নাই। এই নিয়ম দেখিয়া বিস্ময়ের কোন হেতু নাই। এই ঘটনাটাই বরং আশ্চর্য্য—একটা কিছু যে ঘটিতেছে, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। জগৎ-ঘটনাটার প্রয়োজন কি ছিল, ইহা ঘটেই বা কেন, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। ইহার উত্তরে অজ্ঞানবাদী বলেন, জানি। না; ভক্ত বলেন, ইহা কোন অঘটন-ঘটনা-পটুর লীলা; বৈদান্তিক বলেন, আমিই সেই অঘটন-ঘটনায় পটু—আমার ইহাতে আনন্দ; বৌদ্ধ একেবারে ঢুকাইয়া দেন ও বলেন, কিছুই ঘটে নাই।

—

# চেতনার অন্বেষণে

## মাসে একটি লেখা

মুক্তচিন্তার ওপর লেখালেখি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে দেখে পত্রিকাটি শুরু করেছিলাম।

আপনারা যারা মুক্তচিন্তা, যুক্তিবাদ, নাস্তিকতার চর্চা করেন যেমন পারবেন, যতটুকু পারবেন লিখুন। ফেসবুক, ব্লগ ইত্যাদি মিডিয়ায় লেখা প্রকাশ করার পাশাপাশি লেখাটি পাঠান।

পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য যুক্তিবাদীদের লেখালেখিতে উৎসাহিত করা, এবং মুক্তচিন্তকদের চিন্তাধারা সমাজে তুলে ধরা।

প্রচলিত অর্থে ম্যাগাজিনের জন্য লেখা বলতে গুরুগম্ভীর, বড়, সাধারণ লেখার থেকে একটু আলাদা, কিংবা সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ এরকম বুঝি, কিন্তু আমরা যে ধরনের লেখা চাই তা এরকম হতেই হবে এমন মোটেও নয়। কোন সাম্প্রতিক ঘটনা বা কোন বিষয়ে আপনার চিন্তা-ভাবনা কী সে সম্পর্কে ৫-১০ লাইন লিখলেও পাঠানো যায়। আমরা চাই আপনার লেখনী চলতে থাকুক। লেখায় নিজের পরিচয় গোপণ রাখতে চাইলেও অসুবিধা নেই, আপনার লেখা প্রকাশ করব। যা দুই বাংলার অগনিত মানুষের কাছে আমাদের ভাবনা ছড়িয়ে পড়বে এবং মুক্তচিন্তকদের আরও সংঘবদ্ধ করতে উৎসাহিত করবে।

এমন নয় যে আপনার লেখাটি কোথাও প্রকাশ করেছেন বলে দেওয়া যাবে না, তা একেবারেই নয়। ক্রমশ অসহনীয় রাজনৈতিক দিনগুলিতে যুক্তিবাদীরা কোণঠাসা হচ্ছে। তাদের নিজেদের জন্য হলেও কলম তুলে নিতে হবে এটি নির্মম সত্য। কোন প্রকার প্রশ্ন এবং লেখা পাঠানোর ঠিকানা নীচে দেওয়া রয়েছে। ধন্যবাদ।

সেপ্টেম্বর সংখ্যা সংগ্রহ করুন

পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হোন (বিনিময়মূল্য ছাড়াই)

পত্রিকার গ্রাহক হতে ফর্ম পূরণ করুন- Cilck Here | Scan QR

যো গা যো গ

Email: yuktibadira@gmail.com

